বিবিধ প্রবন্ধ

প্রকাশক : শ্রীঅশোককুমার ঘোষ
কল্যাণী প্রকাশন
৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

মুদ্রক : শ্রীরাখাল চট্টোপাধ্যায়
নিউ প্রিণ্ট হাউস
২১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী : শ্রীসুধীর সেন

পরিবেশক : ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশনস্
৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

১ম প্রকাশ : দীপাবলী। ১৩৭২

বিবিধ প্রবন্ধ

সাধারণ সম্পাদক

শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত

শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষাকে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একটা নির্দিষ্ট মানে সমুন্নত করেছেন কিন্তু এখনও এ ভাষাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নেই। এক সময় ভদ্র সমাজে তিন প্রকার বাংলা ভাষা প্রচলিত ছিল : (১) মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সঙ্গে যে সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করতে হোত তাঁদের বাংলায় উর্দু-আরবী-ফারসী মিশ্রিত থাকত ; (২) যাঁরা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করতেন তাঁদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হোত ; (৩) এই দু' সম্প্রদায় ব্যতীত বহু সংখ্যক বিষয়ী ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা উর্দু ও সংস্কৃত মিশ্রিত বাংলা ব্যবহার করতেন। কবি ও পাঁচালীকারগণ এই ভাষায়ই গীত রচনা করতেন।

ইংরেজরা এ দেশ দখল করে ভাষার কিছুমাত্র পরিবর্তন করতে পারে নি। কিন্তু তাদের প্রবর্তিত আদালতের উন্মোষপর্বে উর্দু ভাষা প্রচলিত থাকায় বাংলা ভাষায় বহু সংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দ অনুপ্রবেশ করে। পরে বাংলায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে কিছু আপত্তি দেখা দেয়। এ নিয়ে যথেষ্ট আলোচনাও চলে। আরবী-ফারসীর সমর্থকেরা বললেন, বাংলায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করা আর ইংরেজীতে ল্যাটিন ও গ্রীক শব্দ ব্যবহারে বাধা দেওয়া একই ধরণের অযৌক্তিক ব্যাপার। ইংরেজী ভাষার ক্রমোন্নতির প্রতিস্তরেও বহু পণ্ডিত এবং খিটখিটে মেজাজের ব্যক্তি ইংরেজীর সঙ্গে অন্যান্য শব্দের মিশ্রণে আপত্তি জানান। যদিচ ইংরেজী একটি উপভাষা, Plate Deutsch এর সঙ্গে Hoch Deutsch মিশ্রণে গঠিত। সে সময়কার বিজয়ী Saxon গোষ্ঠী beef, veal, pork এবং mutton শব্দ ব্যবহারে আপত্তি জানায়। কারণ এই শব্দগুলো তৎকালীন শুদ্ধ ইংরেজী ox, calf, pig এবং sheepকে কৌশলে স্থানচ্যুত করেছিল। জর্মন ভাষা অতি অল্পই বিদেশী শব্দ গ্রহণ করেছে। জর্মন ভাষা সভ্যতা ও প্রগতির প্রয়োজন মেটাতে অন্যের নিকট ধার না করে দেশজ ভাষাকে কাজে লাগিয়েছে, ফলে উন্নতকালে বর্ণনাশক্তি ও বাক্য গঠনের ক্ষমতা থাকা সত্বেও দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা ইংরেজী অথবা অন্য কোন ইয়োরোপীয় ভাষার

চেয়ে নিয়ে অবস্থিত। যেমন, জর্মন শব্দ Gessangenschasst শব্দের পরিবর্তে 'custody,' Vergnulgsam শব্দের পরিবর্তে 'contented', Veruntheilung-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ 'sentence,' Vervollkomman-এর পরিবর্তে ইংরেজী 'to complete' অনেক বেশী সহজ।

বাঙালীকে বাংলা শিখাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন ইংরেজরা। সঙ্গী পেয়েছিলেন সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদের। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদের সঙ্গে বড় একটা মেলামেশা করতেন না। এবং সংস্কৃত কালেজের ছাত্রবৃন্দ যে সব গ্রন্থাদি পাঠ করতেন, যে সব লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন তাদের সঙ্গে দেশের মানুষ এবং দেশজ ভাষার খুব একটা যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না। তাই তাঁরা দেশে কোন ভাষা 'চলিত' এবং কোন ভাষা 'অচলিত' সে বিষয়েও ওয়াকিবহাল ছিলেন না। অথচ এঁদের হস্তে অর্পিত হোল বাংলা পুস্তক প্রণয়নের ভার। রাশি রাশি তর্জমা প্রকাশিত হল। তারাশঙ্কর তর্করত্ন সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ করলেন: "একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জনীদ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।"[১] বলা বাহুল্য, অভিধানের সাহায্য ব্যতীত এ বাংলার মর্মোদ্ধার বড়ই কষ্টকর। আরেকটি অনুবাদ: "পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরান বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ ঘড়ীর শঙ্কু, বাক্স মধ্য হইতে অনবরত-বিনির্গত জলবিন্দুপাত দ্বারা নিমগ্নকাষ্ঠখণ্ড প্রতিঘাতে, পরিচালিত হইত; বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।"[২] মূল ইংরেজী বোধ হয় এর চেয়ে সহজবোধ্য। এই সব পণ্ডিতগণের হস্তে

১। 'কাদম্বরীর' তর্জমা

২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'জীবন চরিত' পুস্তকের "সর আইজাক নিউটন" শীর্ষক রচনা থেকে উদ্ধৃত।

বাংলা ভাষার উন্নতির ভার অর্পিত হোল, ফলে লিখিত ভাষা ক্রমেই সর্বসাধারণের দুর্বোধ্য ও দুষ্পাঠ্য হয়ে উঠল। তাই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন—"যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাঁহারা ভাল বাঙ্গালা শেখেন নাই। লিখিত বাঙ্গালা ও কথিত বাঙ্গালা এত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে যে এই দুইটিকে এক ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকই লিখিত ভাষা বুঝিতে পারে না। এই জন্য সাধারণ লোকের মধ্যে আজও পাঠকের সংখ্যা এত অল্প।"[৩]

উপরে যে বাংলার উদাহরণ উপস্থাপিত হয়েছে তা উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলা গদ্য। এই সময়ের গদ্য প্রধানত দু' শ্রেণীর—পাঠ্যপুস্তক আর সমাজ সমালোচনামূলক নক্সা। পাঠ্যপুস্তকগুলো ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের[৪] বাংলা বিভাগ ও পরে স্কুল সোসাইটীর প্রয়োজনানুসারে রচিত হয়েছিল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে শ্রীরামপুর মিশনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। যদিও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যেই (১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী) এ সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা হয় নি, কিন্তু কালক্রমে এ প্রতিষ্ঠানটি উইলিয়াম কেরী, জশুয়া মার্শম্যান এবং উইলিয়ম ওয়ার্ডের প্রচেষ্টায় বাংলায় শিক্ষা বিস্তারের অগ্রদূতের ভূমিকা গ্রহণ করে। উইলিয়াম কেরীকে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। কেরী কীভাবে বঙ্গভাষার সেবকরূপে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তা আমরা সজনীকান্ত দাসের কাছে জানতে পারি:—"কোম্পানীর রাইটারদিগকে যখন আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা দিবার কাজে কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন পর্য্যন্ত বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে (ফোর্ট উইলিয়া কলেজ) বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার কোন বন্দোবস্ত করা সম্ভব হয় নাই। বাংলা বিভাগের ভার লইতে পারেন, এমন কোনও ইংরেজের কথা কর্তৃপক্ষ

৩। বাঙ্গালা ভাষা, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১২৮৮

৪। "'দাক্ষিণাত্য বিজয়ের' স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস বলে ঘোষণা করেন, কর্তৃপক্ষ সমীপে 'মিনিট' উপস্থিত করেন ১৮ই আগস্ট এবং আসল কাজ শুরু হয় ২৪শে নভেম্বর" (সজনীকান্ত দাস, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস)

অবগত ছিলেন না। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে শ্রীরামপুর মিশন হইতে নিউ টেস্টামেণ্টের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলীর দৃষ্টি কেরীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহারই নির্দেশ মত কলেজের প্রোভেষ্ট ডেভিড ব্রাউন কেরীকে বাংলা বিভাগের দায়িত্ব লইতে অনুরোধ করিয়া পত্র দিন। অনেক চিন্তার পর কেরী ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃত হন"[৫] ঐ পদ গ্রহণের পরে কত ভাবে যে তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সমুন্নতির প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে তা নতুন করে বলার দাবী রাখে না।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর প্রয়াসে বাংলা গদ্য প্রচলন হবার অল্পকালের মধ্যেই সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হয় (১৮১৮)। পাঠ্যপুস্তক জাতীয় রচনাবলী বাংলাগদ্যের আদি। জোনান, ডানকান, এন. বি. এডমনস্টেন, হেনরী, ফরস্টার, এ. আপজন, মিলার, জন টমাস, উইলিয়ম কেরী, জাশুয়া মার্শম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড, জন এলার্টন, গ্রেভচ চামনি হটন, কাপ্টেন স্টুয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী, জন ক্লার্ক মার্শম্যান, মে, হালি, পীয়াস´, পীয়ার্স´ন, মর্টন, ইয়েটস, ওয়েঙ্গার মেণ্ডিস, ম্যাক, লসন, রবিনসন, লং, কীথ, আরও অনেকে বাংলা গদ্য-ভাষার জন্মকালে ও শৈশবে নিজ নিজ সাধনা ও প্রচেষ্টা দ্বারা নানাভাবে বাংলাকে পরিপুষ্ট করেছেন। কর্তৃপক্ষের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ১৮০১-১৮১৫ সনের মধ্যে বহু গ্রন্থ রচিত ও মুদ্রিত হয।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ অনেকের মতে পূর্ব বঙ্গে। পশ্চিম বঙ্গে বা রাঢ়ে প্রথমে শূর রাজবংশ ও পরে সেন রাজবংশ ছিল, যাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা দেশী ভাষাকে অবজ্ঞা করতেন এবং সংস্কৃতের উৎসাহদাতা ছিলেন। এই কারণে প্রাচীনকালে পশ্চিম বঙ্গে বঙ্গ সাহিত্যের উদ্ভব সম্ভব হয় নি। প্রাচীন বাংলা ভাষার আদি লেখক মৎস্যেন্দ্রনাথ চন্দ্রদ্বীপের (বরিশাল) অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৬৫৭ খৃষ্টাব্দে (মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতানুসারে) নেপালের রাজা নরেন্দ্র দেবের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সেন রাজাদের আমলে নবদ্বীপ সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সজনীকান্ত দাস।

সময় থেকে নদীয়ার ভাষা বাংলার সাহিত্যিক ভাষা হয়ে ওঠে এবং পূর্ববঙ্গের উপভাষা সাহিত্যিকদের নিকট নিন্দনীয় হয়ে পড়ে। চৈতন্য-ভাগবতে তার প্রমাণ আছে :

সবার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে।
কহিলেন যেন মত আছিলেন বঙ্গে॥
বঙ্গদেশি বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।
বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া॥

পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রতি অবজ্ঞা সংস্কৃত শ্লোকেও আছে :

আশীর্বাদং ন গৃহ্নীয়াৎ পূর্ববঙ্গ নিবাসিনঃ।
শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুর্বদতি যতঃ॥

(পূর্ব বঙ্গবাসীর আশীবাদ গ্রহণ করিবে না। কারণ, পূর্ববঙ্গবাসী শতায়ুঃ বলিতে গিয়া হতায়ু বলিয়া ফেলে।)

গৌড় ও নবদ্বীপের প্রভাবে বিশেষত, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, বিপ্রদাস, বৃন্দাবন দাস প্রমুখ সাহিত্যাচার্যগণের অনুসরণে পাঠান রাজত্বের শেষে একটি সাহিত্যিক বাংলা গড়ে ওঠে।

উনিশ শতকের বাংলায় নবযুগের একটি বৈশিষ্ট্য হল ইতিহাস চেতনার উদ্ভব ও ইতিহাস গবেষণার সম্প্রসারণ।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা আবার নতুন দিকে বাঁক নিচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গের সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকবৃন্দ সাহিত্যের রীতি, আঙ্গিক, টেকনিক ও স্টাইল নিয়ে বিব্রত। সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার একটা প্লাবন এসেছে এবং পূর্ব-পাকিস্তানে উন্মাদনা এসেছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রমাণ-প্রচেষ্টায়। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তান এখনও বঙ্গ-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি কোন উল্লেখযোগ্য আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি ; যদিচ, মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রমাণের নিমিত্তে তাঁরা যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে গবেষণা কর্ম ও প্রবন্ধাদি রচনা করে যাচ্ছেন। এই সব গবেষণা অনেক ক্ষেত্রেই 'সেন্টিমেণ্টাল' ও আবেগ প্রধান হওয়ায় বিচার না করে একে

গ্রহণ করলে অসুবিধায় পড়তে হতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরেই সঞ্চরণশীল। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে যে আসনে উন্নীত করেছেন আমাদের বর্তমান সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও গবেষকবৃন্দ তাকে আরও সমুন্নত ও ঋজু করতে বদ্ধপরিকর। যদিচ প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর কালের সাহিত্যে নানাবিধ জটিলতা ও চিন্তার আত্মপ্রকাশ ঘটছে। তদুপরি, বঙ্গ বিভাগ হেতু বাঙালী সংস্কৃতির কেন্দ্র একদিকে কলকাতা ও অপরদিকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। গত দুশো বছরে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণনগর, নদীয়া ও শান্তিপুর অঞ্চলের উপভাষাই সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বজনবোধগম্য বাহন হিসাবে গড়ে ওঠে। এবং এর উচ্চারণ শিক্ষিত ও সাধারণ শিক্ষিত সকলের কাছেই গৃহীত হয়। বঙ্গ বিভক্ত হবার পর পূর্ব-পাকিস্থানী কর্তাদের কলকাতাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ঢাকামুখো হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গের বাংলা যখন তার দুশো বছরের ট্রাডিশন বজায় রেখে ক্রমোন্নতির পথে এগোচ্ছে তখন পূর্ব-পাকিস্তানের স্কুল, কলেজ, কোর্ট, কাছারী, বিভিন্ন বক্তৃতামঞ্চ ও খবরের কাগজগুলোর কার্যালয়ে পূর্ব-বঙ্গীয় উচ্চারণের এক জগাখিচুড়ি অবস্থা। পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাবিদদের চোখে এ ব্যাপারটি ধরা পড়েছে। তাই তাঁরা মোটামুটি পূর্ব বঙ্গের ঐতিহ্যানুযায়ী একটা standard উচ্চারণ ও বাংলা বানান সংস্কারের কথা চিন্তা করছেন। চিন্তা যখন এসেছে তখন তা কার্যেও পর্যবসিত হবে, তবে তাতে সময় লাগতে পারে। কিন্তু এর ফলে একই বাংলার দু' বঙ্গে দু' ধারা পরিলক্ষিত হবে। হচ্ছেও। সাম্প্রতিক পরিবর্তন ধীরে ধীরে ও আমাদের চোখের উপর অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমরা এর খুব একটা গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছি না। আসলে, ইতিমধ্যেই দু' বঙ্গের বাংলার মধ্যে অনেকটা তফাৎ আবিষ্কার করা সম্ভব। পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণের তারতম্য লক্ষণীয়। তাই সেখানে একটি received pronunciation বা সর্ববাদী স্বীকৃত উচ্চারণের প্রচেষ্টা চলছে। এবং এখানেই প্রশ্ন এসেছে যে, সে সর্বজন স্বীকৃত উচ্চারণটি কী হবে? যাঁরা বাংলার চলিত উচ্চারণকে শান্তিপুর, নদীয়া, শান্তিনিকেতন বা কলকাতাভিত্তিক বলে বর্জন করতে চান তাঁদের কাছে এ কথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না

যে, প্রাক্ স্বাধীনতাযুগের বহু জিনিষের ন্যায় পূর্ব-পাকিস্তানবাসী বাঙালী বর্তমান চলিত বাংলারও উত্তরাধিকারী। কাজেই সঙ্কীর্ণ মন পরিহার-পূর্বক তাঁরা যদি চলিত বাংলাকেই স্বীকৃতি দেন তবে বঙ্গভাষার আরও শ্রীবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। নতুবা, একই হরফে লিখিত হলেও দু' বাংলার দু' রকম ভাষা ও উচ্চারণ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে দুর্বল করতে পারে।

বর্তমান সংকলনটি অপূর্ণ। বঙ্গ সাহিত্যের সমস্ত দিকের আলোচনা এ সংকলনে নেই। যা আছে তার মূল্যও বোধহয় কম নয়। বঙ্গ সাহিত্যের সমস্ত বিভাগের সম্পূর্ণ আলোচনা সংযুক্ত করা সম্ভব হলে সত্যিকারের আনন্দিত হওয়া যেত। কিন্তু নানা কার্যকারণবশত তা সম্ভব হয় নি বলে আমরা দুঃখিত।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এ সংকলনের লেখকদের মতামতের দায়িত্ব লেখকদের নিজস্ব। বহু স্থানেই সম্পাদকীয় মতের সঙ্গে লেখকদের মতের অমিল আছে। কিন্তু আমরা শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমাদের মতানুযায়ী সমস্ত রচনা আমাদের সম্পাদিত সংকলনে থাকবে এ ধরণের চিন্তার সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। শিল্পীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করাকে আমরা অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করি।

বর্তমান সংকলনের লেখক-লেখিকাবৃন্দ সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পেয়েছেন। সুতরাং তাঁদের সম্পর্কে কোন ভনিতা বর্তমান সংকলনে প্রয়োজন আছে বলে মরে করি না। তথাপি এই সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত 'লেখক পরিচিতি' জুড়ে দেওয়া হল। পূজা সংখ্যার পুণর্মুদ্রণ হেতু—(পূজা সংখ্যা যাঁরা বের করেন তাঁরাই জানেন যে কিরূপ কর্মব্যস্ততার মধ্যে পূজাসংখ্যাগুলো বের করতে হয়) ও নানাবিধ অসুবিধার জন্য স্থানে স্থানে ভুল ভ্রান্তির শিকার হতে হয়েছে।

বাংলা মাসিকপত্র 'কল্যাণীর' সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরাই জানেন যে, 'কল্যাণী'র শারদীয় সংখ্যা এক এক বৎসর এক একটি বিশেষ বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিতদের আলোচনায় পুষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়। গত ১৩৭১ এবং ১৩৭২ সনের 'কল্যাণী'র শারদীয় সংখ্যা সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ সমষ্টি। তরুণ ও প্রবীণদের রচনা। শারদীয় সংখ্যার আয়ু অত্যন্ত সীমিত। তাছাড়া শারদীয় পাঠক নাকি

প্রবন্ধাপেক্ষা অন্যান্য রচনার বেশী ভক্ত। এবং এই পাঠকদের অনেকেই আবার অন্য সময়ে এ ধরণের প্রবন্ধের দ্বারা সমধিক লাভবান হন। অথচ শারদীয় সংখ্যার আয়ু ফুরিয়ে যাওয়াতে পুরাতন শারদীয় সংখ্যা পাঠে দরদী পাঠক ও গবেষক ব্যতীত বড় কেউ উৎসাহী হন না। যদিও প্রবন্ধ সংকলন পাঠের উৎসাহ অনেকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। এই সব দিক বিবেচনা করে 'কল্যাণী' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীকে বর্তমান সংকলনরূপে প্রকাশ করা গেল। এ প্রসঙ্গে সংকলিত প্রবন্ধাবলী সম্পর্কে একটি কৈফিয়ৎ রাখা যুক্তিযুক্ত। সকলেই জানেন যে শারদীয় সংখ্যাগুলো যেমন তাড়াহুড়ো করে ছাপানো হয়ে থাকে তেমনি লেখকদের প্রতিও নানা ভাবে অত্যাচার করা হয় যাহোক একটা কিছু লিখে দেবার জন্যে। সাময়িক সহিত্য হিসাবে সেসব লেখা উপযুক্ত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ঐসব প্রবন্ধের মধ্যে পাঠক আরও বিস্তৃত তথ্যাদি পেতে চান। বর্তমান সংকলন পাঠে কোন কোন পাঠকের মনে এ ধরণের চিন্তা আসতে পারে। তাই তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন করে রাখা ভাল যে, বর্তমান সংকলনটিকে আমরা পরিকল্পিত প্রবন্ধ সংকলন হিসাবে প্রকাশ করিনি —কল্যাণীর পুর্ণমুদ্রিত সংখ্যা হিসাবে বের করছি। সুতরাং পাঠক-সাধারণও যেন সেভাবেই সংকলনটিকে গ্রহণ করে লেখকদের প্রতি সুবিচার করেন।

লেখক পরিচিতি

মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ—এম. এ. ডি. ফিল, কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। ইনি সাহিত্য বিষয়ক কয়েক-খানি গ্রন্থের রচয়িতা।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের (মেদিনীপুর) বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, কবি এবং সমালোচক।

খোন্দকার সিরাজুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (পূর্ব-পাকিস্তান) কৃতীছাত্র ও কবি।

নির্মলেন্দু ভৌমিক, এম. এ. ডি. ফিল, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী

কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, ইনি উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীতের উপর গবেষণা করে ডি. ফিল. হয়েছেন।

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, 'যুগান্তর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, বিখ্যাত সাংবাদিক, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার লেখক ও গ্রন্থকার।

পবিত্র সরকার, এম. এ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের উপাধ্যায়।

রাজিয়াখাতুন চৌধুরী, পূর্ব-পাকিস্তানের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী।

কাজী ফেরদৌস খাঁন, পূর্ব-পাকিস্তানের সাংবাদিক ও সমালোচক।

মুহম্মদ আবদুল খালেক, এম. এ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসের ছাত্র, সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, এম. এ., ডি. ফিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক।

পীযুষকান্তি মহাপাত্র, এম. এ., ডি. ফিল, ডিপ, লিব্., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী সাইন্স বিভাগের উপাধ্যায় এবং বাঙলা প্রকাশনী বিভাগের সম্পাদক।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ, এম. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত বাংলা বিবেকানন্দ-গ্রন্থাবলীর অন্যতম সম্পাদক ও গ্রন্থকার।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, এম.এ, প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক। বর্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সাধারণ সম্পাদক। ইংরেজী ও বাংলা গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ রচনায় সমান পারদর্শী।

দীনেশচন্দ্র সরকার, এম. এ., পি. এইচ. ডি., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান এবং কারমাইকাল অধ্যাপক। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক।

দিলীপকুমার বিশ্বাস, এম. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনায় সিদ্ধহস্ত এবং সুপণ্ডিত বলে খ্যাত।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য, এম. এ. ডি. ফিল. রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন্ অব দি ফ্যাকাল্টি অব আর্টস্, বিশিষ্ট গ্রন্থকার ও শিক্ষাবিদ।

দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, পি. এইচ. ডি, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ।

পঞ্চানন মণ্ডল, এম.এ. ডি. ফিল, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের রীডার, বাংলা পুঁথি বিভাগের অধ্যক্ষ এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিষয়ে সুপণ্ডিত।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, এম. এ, কলিকাতা সিটি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক এবং শাক্ত সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ও গ্রন্থকার।

সুখময় মুখোপাধ্যায়, এম. এ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের উপাধ্যায় ও গ্রন্থকার।

ভবতোষ দত্ত, এম. এ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা সাহিত্যের উপাধ্যায়, কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ও গ্রন্থকার।

নিরঞ্জন চক্রবর্তী, এম. এ, কলিকাতা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের বাংলা সাহিত্যের উপাধ্যায় ও গ্রন্থকার।

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. ডি. ফিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিভাগের গবেষক ও গ্রন্থকার।

অক্ষয়কুমার কয়াল, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও বাংলা পুঁথি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। বিশিষ্ট পত্র পত্রিকার লেখক এবং 'কল্যাণী'র সহঃ সম্পাদক।

শঙ্কর সেনগুপ্ত, সম্পাদক, 'কল্যাণী'।

শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত

সাম্প্রতিক কালে মঙ্গলকাব্য

মুনীন্দ্রকুমার ঘোষ

Literature is the mirror of an age—একথা সব যুগের সাহিত্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু কোথাও বা তা স্থূল দেহ ধারণ করে আর কোথাও তার ছায়াপাত ঘটে। আজকের দিনের আশা-আকাংক্ষা সাহিত্যে প্রতিভাত হয় কোথাও স্থূল ভাবে, কোথাও সূক্ষ্মভাবে, কোথাও রূপকে কোথাও প্রতীকে, কোথাও বা ইংগিতে। আর মধ্যযুগের সাহিত্যে তার এতো বৈচিত্র্য-আশ্রয় ছিলোনা তাই একমাত্র আধ্যাত্মিকতার নির্মোকটি সযত্নে অপসারণ করলেই সাহিত্যরসের প্রবাহের সঙ্গে বেরিয়ে আসে সেদিনের মানুষের মানসদ্যোতনা। এই মানসদ্যোতনার কক্ষে কক্ষে আশ্রয় লাভ করেছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজবোধ, ধর্মবোধ, সংস্কৃতি প্রভৃতি। ভারতের আর কোন ভাষা-সাহিত্য এভাবে এদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলো বলে জানিনা কিন্তু বাঙলা সাহিত্য তার প্রাচীনযুগ থেকেই এ কৌলিন্যের অধিকারী। সাহিত্যের ছাত্র ছাড়াও যাদের অম্বিষ্ট ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্মবোধ—তারাও বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগের প্রবাহে এসে নিজেদের অন্বেষিত তথ্য পেতে পারেন। তবে সর্বত্রই আধ্যাত্মিকতার নির্মোকটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অপসারণ প্রয়োজন। আর সেই সঙ্গে প্রথানুগ বর্ণনারীতিগুলোও যথাযথ যাচাই করে নিতে হয়। এখানে একটা সুবিধা আছে—প্রথানুগ বর্ণনারীতি প্রায় সর্বত্রই অপ্রাসঙ্গিক আর বৈচিত্র্যহীন, কবি-প্রাণের সজল অভিষেক নেই। তাই কবির সিদ্ধি যেখানে নেই সেখানে সযত্নে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

মধ্যযুগের বাঙালীজীবনের সংশ্লেষসাধনের দু'টি পথ পাওয়া যায়। একটিতে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি অনুবাদের মাধ্যমে লোকায়ত করে দেওয়া, আর অপরটিতে, লোকায়ত সংস্কৃতির উপাদানগুলি কিছুটা পরিবর্তন

ক'রে গ্রহণ করা। প্রথমটিতে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের ভাষান্তর হলো আর দ্বিতীয়টিতে লোকায়ত দেবদেবীর সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সাঙ্গীকরণ করে মঙ্গলকাব্য সম্ভবপর হল। অনুবাদের ক্ষেত্রে কবি তথা জাতি তথা যুগের আত্ম-প্রক্ষেপের স্থান সংকীর্ণ। কিন্তু সেখানেও যুগবন্যার প্রবাহ রোধ করা যায় নি। আর লোকায়ত জনমানসের অভিক্ষেপপূর্ণ মঙ্গলকাব্যে তা প্রতিরোধ করার প্রশ্নই উঠে না। বাঙ্‌লা দেশে তুর্কী বিজয়ের পরে হিন্দুধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে (বৌদ্ধ, জৈন, লোকায়ত বিভিন্ন ধর্ম ব্যতীতও) ইসলামধর্মী প্রবলভাবে দাঁড়ালো। এই সময় থেকেই হিন্দুধর্মকে কতকগুলি যুগোপযোগী পথে চলতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উদার প্রাঙ্গন নির্মিতির প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। এর আগেও এরূপ একটি নজীর পাওয়া যায়—

> স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ীন শ্রুতিগোচরা
> কর্মশ্রেয় বিমূঢ়ানাং শ্রেয় এব ভবেদিহ।
> ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্॥
>
> —বেদাধিকার বর্জিত

স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুদের প্রতি অসীম কৃপায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহাভারত সংহিতা প্রণয়ন করেন। সেদিনের এই কৃপা আর আজকের এই প্রয়োজনে প্রভেদ বিস্তর। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

মঙ্গলকাব্যগুলো সেজন্যেই হয়েছে বেশী জীবন্ত। লোকায়ত জীবনের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা এতে এতো সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়েছে যে এদের সঙ্গে সেদিনের বাঙালীর নাড়ীর যোগ খুবই স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। মঙ্গলকাব্যের উপাদান বহুদিন থেকেই এদেশের মানুষের কল্পলোকের বিশ্বাস হয়ে' ছিল্লো আর সেগুলি ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সাঙ্গী-করণের আশ্রয়ে এক একটি পূজনীয় দেবদেবীতে প্রতিষ্ঠিত হলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এজন্যে একটা মহাকাব্যের ছায়া পাওয়া যায়। বিশেষ করে ধর্মমঙ্গল কাব্যে তো বটেই। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীটি সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—সমগ্র কাহিনীটি মুসলমান অধিকারের পূর্বেই দৃঢ়রূপ নিয়েছিল (রূপরামের ধর্মমঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন)। মনে হয়

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কাঠামোও সম্ভবত এরূপ বহুদিন আগেই বাঙ্‌লা দেশে দানা বেঁধে উঠেছিল; তবে তা ব্রাহ্মণেতর সর্বশ্রেণীর মর্যাদা পায় নি, কেবলমাত্র লোকায়ত স্তরেই আবদ্ধ ছিলো। আর এই লোকায়ত স্তরে আবদ্ধ ছিলো বলে তার বাস্তবতার স্পর্শ আরো বেশী। এগুলোর স্রষ্টিকারী কবির উল্লেখ পাওয়া যায় না, মনে হয় মহাকাব্যের উপাদানের মতো জাতির স্বরচিত এবং স্বসাধিত। তাই মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মহাকাব্যের কিছুটা লক্ষণ সহজলভ্য। সবচেয়ে আনন্দের কথা মহাকাব্যোচিত গুণ কিংবা দেবোচিত পরিবেশ স্বষ্টি করতে গিয়ে মঙ্গল কাব্যের কবিরা বাঙ্‌লা দেশের মাটির উর্ধে উঠতে পারেন নি। মানব চরিত্রেও তাদের জীবনস্পন্দন খুবই স্বাভাবিকভাবে কবিরা উপলব্ধি করেছেন কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় দেবচরিত্রগুলিও এই জীবনস্পন্দনের উর্ধে উঠে এক একটা আদর্শ হয়ে ওঠেনি। মুকুন্দরাম লিখছেন—

সুমঙ্গল সূত্র করে আইনু তোমার ঘরে
পূর্ণ বৎসর হইল সাত।
দূর কর অপরাধ পূরহ মনের সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পর্বত কন্দরে বসি নাহি পাট পড়সী
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
একদিন কোথা যাই যুড়াইতে নাহি ঠাঁই
বিধি মোরে কৈল জন্ম দুঃখী॥

এই দেবী আদ্যাশক্তি অভয়া হলেও ইনি বাঙালী ঘরের বিবাহিতা কন্যা। কিংবা শিবায়ণে—

রন্ধন করিতে ভালো বলিলে গোঁসাই।
প্রথমে যে দিব পাত্রে তাই ঘরে নাই॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ডুল॥

এই 'গণেশের মাতা'কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বাঙ্‌লা দেশের রমেশের মাতা, পরেশের মাতার উর্ধে স্থান দিতে পারেন নি। ধর্মমঙ্গল কাব্যে বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে বিয়ে করার ভয়ে কানাড়া পার্বতীর আশ্রয় প্রার্থনা করে বললেন—

তবে কেন বুড়া পতি ঘটাইলে মা।

পার্বতী তার জবাবে বলছেন—

কোথা পাব যুবক আপনি ভক্তি বুড়া। ১

এই মানুষ আর দেবতাদের মধ্যে পার্থক্য মঙ্গলকাব্যের কবিদের কাছে সামান্যই। যতই তাঁরা তাঁদের বর্ণিত দেব-দেবীর বিরাটত্ব প্রকাশ করতে চেয়ে থাকুন না কেন, তাঁদের উপরে নিজেদের অজান্তে সেদিনের মানুষের প্রলেপ পড়ে গেছে।

আনন্দের কথা, সাম্প্রতিক কালে মঙ্গল কাব্যের চর্চা সুধীমহলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর আগে এ চর্চা ও গবেষণা মাত্র কয়েকজন পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। গত কয়েক বছরে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক রীতিতে কয়েকটি মঙ্গল কাব্যের সম্পাদনা হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও বিশ্বভারতী থেকে সেই সব মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। যদিও এ কাব্যটির সর্বদেশীয় প্রচার সম্ভব হয় নি তবু এতে প্রথানুগ বর্ণনার উর্ধে এমন অনেক কিছু আছে যা মধ্যযুগের ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করে। সেই সঙ্গে মহাকাব্যোচিত গুণ এতে রয়েছে সবচেয়ে বেশী। আর এই কাব্যটির প্রামাণ্য সংস্করণের অভাবই ছিলো সবচেয়ে বেশী। ডঃ সুকুমার সেন সর্বপ্রথম প্রামাণ্য রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের সংস্করণ প্রণয়ন করে তাঁর অবিশ্রান্ত সত্য উদ্ধারের ব্রতের প্রমাণ রেখেছেন। তারপরে ডঃ বিজিত দত্ত ও ডঃ সুনন্দা দত্ত মাণিকরাম গাঙ্গুলীর আর ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র ঘনরামের কাব্য যথার্থ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের আন্তরিকতা বিশেষ করে, মধ্যযুগের সাহিত্য সম্বন্ধে এঁদের কৌতূহল সত্যি অভিনন্দনযোগ্য। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ডঃ আশুতোষ দাসের অভয়ামঙ্গল একটি উল্লেখ-যোগ্য সংযোজন। অবশ্য ডঃ দাস এর পরে মনসামঙ্গলে জগজ্জীবনের কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন যৌথভাবে শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে। সাম্প্রতিক কালে মঙ্গলকাব্যের উপরে যে কাজ হয়েছে তা সর্বাংশে ত্রুটিহীন তা বলিনা, তবে এর মূল্যায়ন অন্যদিক থেকে করা প্রয়োজন। আধুনিক কালের ছাত্র-সমাজে উনিশ শতকের ওপাশে গিয়ে গবেষণা

১। ঘনরামের ধর্মমঙ্গল—ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র

করার প্রয়াস বড় একটা লক্ষ্য করা যায় না, অথচ যা অবলুপ্ত বা প্রায়-অবলুপ্ত তাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন নয় কী! এখনো অনেক কবির কৃতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। কেবলমাত্র সাহিত্য রসিকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলেও অনেকের প্রতিষ্ঠাও নির্ভরযোগ্য কাব্যের সংস্করণ প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের সাহিত্য-মূল্য যত কম বা বেশীই হোক না কেন, তাদের ঐতিহ্যের উপরেই ইতিহাস আপন গতিপথ রচনা করেছে আর সেই জন্যেই সেই ঐতিহ্য-ইতিহাসকে সর্বাংশে স্বীকৃতি দেবার জন্য প্রয়োজন প্রামাণ্য সংস্করণ। আর একটা কথা, মুদ্রিত পুস্তকের ন্যায় পুঁথি সুলভ নয়, আর তা চিরস্থায়ীও নয়। এখনো বাঙ্‌লা-আসামের গ্রাম-গ্রামান্তে যে দু'একটি করে পুঁথি রয়েছে তার সদ্ব্যবহার আশু কর্তব্য। এমন পুঁথিও আমরা দেখেছি যা কেবল মাত্র ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের সাহিত্যের ইতিহাসেই উল্লেখিত হয়েছে, যাদের অন্য কোন প্রামাণ্য সংস্করণ তৈরী করা হয় নি, সেগুলিকে দৃষ্টিভাত করায় নবীন গবেষক-দের দায়িত্ব অনস্বীকার্য। পুঁথি থেকে সংস্করণ তৈরী করার রীতি প্রকৃতি সম্বন্ধে কৌতূহলী গবেষক বরোদা ও পুনার ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউট এবং ভাণ্ডারকর সোসাইটির রীতি গ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া বাঙলা মঙ্গলকাব্যের যে নির্ভরযোগ্য সংস্করণগুলি সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকেও মূল্যবান দিক্‌দর্শন পাওয়া যেতে পারে।

সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত কয়েকটি মঙ্গলকাব্য

(১) রূপরামের ধর্মমঙ্গল—ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ সুনন্দা সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, এপিক পাবলিশার্স।

(২) মাণিকরাম গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল—ডঃ বিজিত দত্ত ও ডঃ সুনন্দা দত্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৩) ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল—ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র, কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৪) কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণের শিবায়ন—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, সাহিত্য পরিষৎ।

(৫) রামেশ্বরের শিবায়ন—শ্রীযোগীলাল হালদার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৬) বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল—শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৭) বিপ্রদাসের মনসাবিজয়—ডঃ সুকুমার সেন, এসিয়াটিক সোসাইটি।

(৮) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল—অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(৯) বাইশ কবির মনসামঙ্গল—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১০) জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল—শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ডঃ আশুতোষ দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১১) দ্বিজ রামদেবের অভয়া মঙ্গল—ডঃ আশুতোষ দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১২) দ্বিজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত—শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৩) মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণ চণ্ডী—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৪) ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল—ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য সাহিত্য আকাদেমী।

(১৫) যাদুনাথের ধর্মপুরাণ—ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৬) রামেশ্বরের শিবায়ন—ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

(১৭) কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল—ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (যন্ত্রস্থ)।

(১৮) মানিক দত্তের চুর্গামঙ্গল—ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও ডঃ পীযুষকান্তি মহাপাত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (যন্ত্রস্থ)

বাংলা কবিতা : গত এক দশক

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক সময় বাঙলাদেশের তরুণতম কবি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। অচিরে তাঁকে স্থানান্তরিত করেছিলেন বিষ্ণু দে এবং যথাসময়ে সেই স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তরুণতম কথাটি এরপর আর সম্ভবত একবচনে ব্যবহৃত হয়নি। একক গরিমা বলতে যা বুঝি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গেই তা বোধ হয় অবসিত হয়েছিল, সম্ভবত আরও কিছুদিন পশ্চাৎগামিনী ছায়া জেগেছিল অত্যুক্তির মতো, কিন্তু অতঃপর তরুণতম কবিদের মুখপত্র প্রকাশিত হলো। একটি এবং কয়েকটি। যে সম্মিলিত স্বচ্ছলতায় উত্তররৈবিক ভাবনার স্বরগ্রাম আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে সেই রকমই, হয়তো তারও থেকে অনিবার্য যৌথ দায়িত্ব, কিন্তু অনেক বেশি অসংহত; প্রতিপক্ষহীন সমরে ব্যাপৃত কয়েকটি শিবির, আর কয়েকজন বিচ্যুত ও স্বাধিষ্ঠিত; প্রায় সবাই তাঁর স্নায়ব বিরুবতার প্রতি-লিখন ধরে রাখতে চান চীৎকৃত স্রস্ত ভাষায়; আর কচিৎ কেউ সেই বিভীষিকাকে শমিত করবার ব্রতে সেই অস্থিরতাকে এড়িয়ে ভীষণ একাকী দাঁড়িয়ে আছেন। এত অমোঘ নগরী এর আগে আর কখনও অধিষ্ঠিত হয়নি বাঙলাদেশে।

অথচ এই সম্প্রতিকালের ঐতিহাসিক অঙ্গীকার ছিল অন্যরকম। অপেক্ষাকৃত পুরাতন কবিদের মধ্যেই কেউ বলেছিলেন

বৃথাই বিগত প্রেক্ষাপটের শোচনা করো
নবজীবনের সন্ধিকালে
এবারে বরং দ্বিতীয় দৃশ্য রচনা করো
শালবীথিকার অন্তরালে

হয়তো সকল শালবীথিকা ইতিমধ্যেই অস্তমিত হয়েছিল এবং অন্তরাল

কোথাও আর অবশিষ্ট ছিল কি না সন্দেহ, তথাপি নবীন কবিদেরও কেউ কেউ নীবিত ধারণ করে নেমেছিলেন :

১. মরণমদমাতাল ডোম সবি করুক উপশম
শ্মশানে, আমি জীবন ছাড়বো না

২. আবার আমি রঙীন, সেই কাচের হৃদয়তা
কাছে পেলাম। প্রতিটি দিন নতুন সমন্বয়

৩. যে যে রঙ লাগে এই প্রাণের প্রসারে তাকে রাখো
বিমুখ হয়ো না মগ্ন পৃথিবীর প্রাণের প্রবাহে
বিশীর্ণ করো না ধারা, ঘুরে ঘুরে যতোই বিলাক ও
মাটিতে ক্ষয়ের লেখা, ছায়াতে ভয়ের লেখা।...

'শতভিষা' নামে যে কবিতাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তার সূচনাসংখ্যার ভণিতাংশে ছিল এই বিনীত দৃঢ়তা

স্পষ্টত কবিতা সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গিকেই আমরা আপাতত মর্যাদা দেব—সেটি হলো কবিতার রসোত্তীর্ণতা এবং 'আধুনিক কাব্য পরিচিতি' —নামে যে গ্রন্থমালা প্রকাশিত হয়েছিল তার কোনো পুস্তিকার ভূমিকায় সাধারণ সম্পাদক লিখেছিলেন

আদর্শগত অবক্ষয় বা অনিশ্চিতির কালে ঐতিহ্যের
প্রবহমানতার প্রতি মনোযোগ নির্দেশনাই একটি স্বাতন্ত্র্য।

ঐতিহ্য কথাটি যেন আর একবার ফিরে আসতে চেয়েছিল। হয়তো এই মনোভাব গড়ে উঠছিল আরও আগে থেকেই, কিংবা এমন বলাও হয়তো সঙ্গত যে আমাদের চেতনার একটি অংশ বরাবরই গোপনে আপাত-অগোচরে রক্ষণশীল হয়েই থাকে। কিন্তু সে যা-ই হোক, জীবনানন্দের মতো মর্বিড কবিও অন্তত 'রূপসী বাঙলা'র একটি গোটা পরিসর জুড়ে দীপ্র দীর্ঘশ্বাস মুদ্রাঙ্কিত করে গেলেন। সুধীন্দ্রনাথের স্বেদাক্ত অভ্যাস, mot juste-এর জন্য তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম তাঁর তমসাপ্রচ্ছাদিত নাস্তিবাদী মূর্তিটিকে অনেক আড়াল দিল। এবং তাঁকে মনে হলো হিউম-প্রস্তাবিত ও এলিয়ট-সমর্থিত সেই নীরস দুরূহ ধ্রুপদী কাব্য ধারার প্রবক্তা, অর্বাচীন মহলে সুধীন্দ্রনাথ ধ্রুপদী কবি হিসেবে আসন পেলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পুরাণের সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা বিষ্ণু দে-র ভূমিকাটিকে ঈষৎ

সুরঞ্জন ছুঁইয়ে আরও নিকট ও গ্রাহ্য করে তুললো। মাঝখানে এক-টুকরো ভূমিখণ্ড প্রি-রাফায়েলাইট অথবা কিংবদন্তীবিসর্পিত অবকাশ প্রতীয়মান হলো সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বরে

ভাঙা সিঁড়িতেই বঁধু দাঁড়ালেম আমি
আবার হৃদয়ে রেখে হাত

নরকনগরবাসী সমর সেনের চরণাবলী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সহানুভূতিনিক্ষিপ্ত সামাজিকতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। আরও শূন্যস্থান জুড়ে এলেন বিশ্রব্ধ ও ঔপদেশিক কবিমণ্ডলী, কবিতা যে পরিমাণে দূরে সরে গিয়েছিল ততোধিক সামাজিক হয়ে উঠলো, কবিতাকে জনপ্রিয় করার শোভাযাত্রা দেখা দিল কলকাতার রাজপথে।

ছবির সমগ্রতা থেকে ছিঁড়ে আনা কতকগুলি রেখা, কিন্তু বিষয়টিকে সেভাবে না দেখে বলা যায়—এই পূর্বলেখগুলি এই দশকের তরুণ কবিদের কাছে উপকারী দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করেছিল। নতুন যাঁরা প্রবেশ করলেন, অব্যবহিত সামনেই তাঁদের দেখার ছিল হরিৎভেদী তটিনীধারা, বনলতা সেন এবং অমিয় চক্রবর্তীর কতিপয় লিরিক মূর্ছনার স্পর্শাতুর প্রভাব, চতুর্দিকে উদ্‌যাপিত কবিতামেলা, অরুণকুমার সরকার এবং নরেশ গুহর উজ্জ্বল প্রেমের কবিতা, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকরণ-নিষ্ঠা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্যাস্টোরাল কৈশোরিকতা, নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরক্ত গীতলতা, যেমন জন বেটজামেন-এর পরামর্শ ছিল বিনীত নিটোল একটি কবিতা লিখে উঠতে পারার একাগ্রতা অর্জন, সেই মতো নম্র মধুর প্রত্যাশারক্ত নবীনেরা প্রবেশ করলেন। মাত্র এক যুগ আগে যে উত্তররৈবিক অস্থিরতা ও ক্লান্তিতে সমস্ত ভবিষ্যৎ নিমজ্জিত বলে বোধ হয়েছিল যেন সেই যুগান্ত আসন্ন হয়ে এলো। যে চেতনাভিঘাতে মুহ্যমান হয়ে জীবনানন্দ লিখেছিলেন

আজ এই শতাব্দীতে সকলেরই জীবনের হৈমন্ত সৈকতে
বালির উপরে ভেসে আমাদের চিন্তা কাজ সঙ্কল্পের তরঙ্গকঙ্কাল
দ্বীপসমুদ্রের মতো অস্পষ্ট বিলাপ করে তোমাকে আমাকে
অন্তহীন দ্বীপহীনতার দিকে অন্ধকারে ডাকে।

—হেমন্ত রাতে, বেলা অবেলা কালবেলা

তারও পরে অরবিন্দ গুহ লিখতে পারলেন—

আরও একবার তুমি দুঃসাহসী হও ; ভালোবাসো

একে নিশ্চয় কাগজের ফুলে ঘর সাজানো বলা সঙ্গত নয়, কিন্তু যে ব্যক্তিকতা সমগ্র ভূমিটি সহস্রধা ফাটলে দীর্ণ করে দেয়, সেই সমূহ বিপৎপাতন হয়তো শুধুমাত্র অভিরাম আত্মপ্রতারণাতেই প্রতিহত হতে পারে। পরন্তু বিগত যুগের রোমান্টিকদের, এমন কি মালার্মেরও ধারণা ছিল জগৎ প্রবাহের সর্বনাশা তমিস্রায় জীবনতরণী নির্মাণ করে দেয় শব্দবাহী কবিতার দৃশ্যমান গেস্টল্ট, অতএব এই রচনাকে আত্মপ্রতারণাই বা কী করে বলা সম্ভব। বরং বলা যায় এই দশকের নতুন কবিরা তৈরি করা নগরের বাসিন্দা হবার প্রস্তাবনা নিয়ে এলেন।

কিন্তু উপরের অনুচ্ছেদটিকে হয় মুহূর্তের নতুবা সংখ্যালঘুর দর্শন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেখানে তটরেখা ছিল অচিরে সেখানে বিস্তারিত হলো সমুদ্রতরঙ্গের অধিকার ; সমস্ত অবকাশরিক্ত নাগরিকতায় সমস্ত নগরপথ যুদ্ধান্তিক নৈরাজ্যে ভরে গেল। এভাবে বলা ঠিক হলো না। যে নৈরাজ্য অনেকদিন থেকে সমস্ত চেতনা নিঃশেষে জারিত করে দিয়েছিল পুনর্বার তার লোলুপ তপ্ত নিঃশ্বাস পড়লো পিঠে। সেভাবে বর্ণনা করেছিলেন অডেন

Not all together but one by one I knew
My states of mind were broken.

ঠিক সেই রকমই ক্রমান্বিত এবং অমোঘ, রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর প্রতিবেদনে

প্রত্যেক শহর আজ ধূমান্বিত যুদ্ধক্ষেত্র, প্রত্যেক গ্রামের
মূল্যমান বিপর্যস্ত

যে নবীন কবিরা কিশোরোপম শুদ্ধতায় পদার্পণ করেছিলেন, এক লহমার মধ্যে অকালবার্ধক্যে তাঁদের কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে এলো। যাঁর প্রথম আত্মপরিচয় শোনা গিয়েছিল

দিনের যুদ্ধে সমস্ত আশা নিঃশেষ হলে
রাত্রি তখন প্রেয়সীর মতো আভরণ খোলে।

তার রূপ যেন মৃত্যুর মতো ম্লান মনে হয়
সঁপে দিই তাকে নিজের ব্যর্থ ক্লান্ত হৃদয়।
শুধু মনে মনে প্রার্থনা করি অস্ফুট স্বরে
নতুন দৃশ্য ঘুম ভেঙে যেন দেখি কাল ভোরে।

তাঁরই নতুন মুক্তি ঘটলো চতুর নগরবাসী কবিতা লেখক হিসেবে। আর শুধুমাত্র তিনি একা নন। যেহেতু এখনকার দিনের কবিতা প্রতি মুহূর্তে একটি নতুন ক্লিংশর আঙিনা নির্মাণ করে দেয় এবং সমসাময়িকেরা সবাই সেই আঙিনায় পা রেখে সম্মিলিত আত্মপরিচয় উচ্চারণ করে ওঠেন সেই কারণে সহযোগী প্রায় সকলেই একযোগে স্বকালের প্রতি-লিপি রচনায় ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন। আর সেই নগরেরও অভিনব ও মৌলিক কোনো রূপ নেই। একই নগর যা আঁকতে এলিয়টকে ইন-ফার্নোর সাহায্য নিতে হয়েছিল;

পায়ে পায়ে হেঁটে শহর প্রান্ত শহর
জটিল জানালা কোরকে কোরকে ব্যাধি

নবীন কবির অভিজ্ঞতায় এ-ই যার স্বরূপ। প্রতিমুহূর্তের নিরাশ্রিত পদ-যাত্রা, 'চতুর্দিকে ব্যবহৃত সিঁড়ি কোলাহল, কলরব, ম্যাণ্ডোলিন, বাঁশি'—একযোগে, বিরক্ত বুকের দীর্ঘশ্বাস,

জীবন বা মৃত্যুও নয়, সে এক অদ্ভুতভাবে বাঁচা

আর অহরহ শ্বাসরোধী আত্মপ্রকাশ, আত্মহনন

আশৈশব বন্ধুকেও আচমকা পিঠে ছুরি মেরে
প্রেম কিংবা চাকরির সুকঠোর যুদ্ধ করি আজ

এবং সেই অপাবৃত তমসা

তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকবো বা অন্ধকার হবো।

যেমন আঁরি মিশোর পদাবলী

Tout enfonce, rien ne libere.
Le suicide renait a une nouvelle souffrance

—Labyrinthe

সব কিছু যায় চূর্ণ হয়ে দেয় না কিছুই ছেড়ে
আত্মহনন জন্মায় ফের নতুন ব্যথার ঘোরে।

—অনুবাদ সুপর্ণা সেন, সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত

অথবা শতবর্ষাধিক পূর্বে লেখা বোদলেয়রের

Cette vie est un hopital oie chaque malade est possede du desir de chanqer de lit. Celui-ci voudrait souffrir en face du poele, et celui-la croit qu'il querirait a cote de la fenetre.

ব্যাধিমন্দির এই জীবন, যেখানে সব রোগগ্রস্ত শুধু তার শয্যাটি পাল্টে নেবার বাসনায় অভিভূত। কেউ ধুঁকতে চায় উনুনের সামনে শুয়ে, আর জন ভাবে সে যদি পেত জানলার ধারটি, সেরে উঠতো।

'Hospital'—এই মুহূর্তের জীবনটিকেও বোধকরি এর চেয়ে যোগ্যতর শব্দে বর্ণনা করা যায় না, মনে হয় একচুল বদলায়নি সেই নিঃশেষিত পরিপার্শ্ব, বোদলেয়রের সেই 'আধুনিক পারি'র গ্যাসলাইট আজও সমস্ত নগরীর নিশীথনিসর্গ উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে। বস্তুত বোদলেয়র আবারও যেন ফিরে এলেন আমাদেরও সাক্ষাৎ পূর্বসূরি হিসেবে, সেই কবি, আধুনিক কবিতার জনকের গৌরব যাঁকে অনেকদিন আগেই দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর প্রায় একশত বছর পরে বোদলেয়র বিস্তারিতভাবে অনূদিত হলেন বাঙলায়, এবং 'পাপের ফুল' এর পরেই যা তর্জমাযোগ্য বিবেচিত হলো তা নিঃসংশয়ে 'নরকে এক ঋতু'। আর নবীনতরদের মধ্যেও কেউ এমন কি নিজের কবিতা সঙ্কলন প্রকাশ করতে গিয়ে পূর্বপত্রে র‍্যাঁবো ও ভের্লেন-এর উপস্থিতি অপরিহার্য বিবেচনা করলেন।

আসলে দীর্ঘদিন ধরে যে অভিপ্রায় তিলে তিলে সঞ্চিত হয়ে উঠছিল, এতদিনে তার আয়ত বিকাশ বোধ করি সম্ভব হলো, এবং বিশ্বকবিতার সহগ পান্থ হিসেবে অগ্রসর হতে গিয়ে প্রাগমুহূর্তেই ফরাসী তটিনীজলে অবগাহন কেন যে এমন জরুরি হয়ে পড়লো, তাও সহজেই বোঝা যায়। স্বাধীনতার পর থেকে সমগ্র দেশ ও জনতা যে ভাবে এবং যে প্রভাবে দ্রুত মর্মান্তরিত হয়ে চলেছিল, সেই 'আধুনিক বাস্তবতা' নামক বিষয়টিকে

লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তারও চেয়ে অবিশ্বাস্যরকমের চরিত্রান্তর অঙ্গীকার করতে হলো। নবীন কবিতাকে, বাঙলা কবিতার ঐতিহ্যরূঢ় মমতামদির শীর্ণা গ্রামীণ স্রোতোধারাটিকে একপলকে অস্বীকার করতে গিয়ে বাঙালি কবিকে গিয়ে দাঁড়াতে হলো বিশ্বনাগরিকতার আধুনিকতম বিদ্যুন্মণ্ডিত চন্দ্রাতপতলে, তাকে প্রার্থনা করে চেয়ে নিতে হলো অধুনাঙ্কিত সেই রাখী, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সেই রাখী ধারণ করতে হলো। যদিও এই প্রক্রিয়া একরকম অন্ত্য-রবীন্দ্রপর্বেরই অনুরূপ, তথাপি যে চেহারা নিয়ে সে দাঁড়ালো তা প্রায় অভূতপূর্ব। সুধীন্দ্রনাথ কাব্যের যে মুক্তি ঘোষণা করেছিলেন, তা ভবিষ্যবাদের ইস্তাহার নয়। সমগ্র চতুর্থ দশক জুড়ে যত বিদ্রোহের কবিতা রচিত হয়েছে আজ আবিষ্কার করা যায় তার মধ্যে অনেকখানি অংশই বড় অভিমানী, আবেগোষ্ণ, যে উপলবন্ধুর অনিচ্ছায় তাঁরা নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, তার বিরুদ্ধে অন্তর্গূঢ় প্রতিবাদ তাঁদের চৈতন্যে গোপনে এসে জমেছিল তখনই, বিষ্ণু দে প্রচ্ছন্ন আস্থা রেখেছিলেন পুরাণে, জীবনানন্দ ইতিহাসচেতনায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র মানবিকতায় মুক্তি খুঁজেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু শৃঙ্গারের অতিমর্ত্য সামর্থ্য ও সম্ভাবনায়। তাঁরা বর্তমানের হাত থেকে পরিত্রাণ যাচ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু অতীতকে বিস্মৃত হতে পারেন নি। তাঁরা শুভ ও সুষমাকে অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু শয়তানকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাঁরা ব্যাকরণকে লঙ্ঘন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শিশুর প্রথম উচ্চারণ অথবা pure psychic automatism তাঁদের রচনায় প্রকাশিত হয়নি। যেন ষষ্ঠ দশক এই পুরাতন দায়িত্বগুলিকেই নতুন করে সম্মানিত করার দুর্ভার গ্রহণ করলো।

একটি পালাবদলের পথ দ্রুত পেরিয়ে আসতে হয়েছিল নবীন কবিদের, বলা যায়, অ্যাক্সেল থেকে রোকাঁ্যাতা পর্যন্ত দ্রুত বিবর্তন তাঁরা এক লহমায় পেরিয়ে এলেন। উৎপীড়িত সামাজিক নয়, তাঁদের ভূমিকা নির্ধারিত হলো প্রবাসী বহিরাগতের। সুধীন্দ্রনাথ সামাজিক বাস্তবতা থেকে নিসর্গে নয়, স্বরচিত বৈদগ্ধ্যবলয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এঁদের সেই মালর্মেয়ান গজদন্তমিনার নেই। সেদিক থেকে এঁরা জনতার মতো অকিঞ্চন। নিরাশ্রিতের নির্দায় শিথিলতা নিয়ে এঁরা আবির্ভূত হলেন। একবার কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রামে বাস্তবের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গকেও নির্জিত

করলেন অনায়াসে, কবিতা যে এঁদের কাছে বিস্ফোরণ তা সহজেই প্রমাণিত হলো। একজন মারিনেত্তি পাপিনি বা মায়াকভস্কির মতো অনাগত বৈদ্যুতিকতায় এঁদের লালসা। কিংবা শুধুমাত্র তা-ই নয়, এঁদের বিঘোষিত একাকিত্ব নবীনতর আবির্ভাব ঘটুক।

আর সেই অচেনা চেহারা আনতে গিয়ে প্রাথমিকভাবেই তাকে সম্ভবত অনুসরণ করতে হলো সেই খ্যাতিমান অসংবদ্ধতাটিকে

> Yacketayakking screaming vomiting whispering
> facts and memories and anecdotes and eyeball kicks and
> shocks of hospitals and jails and wars.

কখনও দুঃশাসন বর্বরতা, এলোমেলো সযত্ন বিস্রস্ততা, কখনও স্মার্ট সাংবাদিকতার বর্ম এগিয়ে দিয়ে, কামিংস-এর দৃশ্যমান জড়ানো বর্ণযোজনায় ও পাউণ্ডের আচম্বিত ঈপ্সিত বর্ণপ্রাধান্যে অগ্রসর হয়ে এলো। কখনও সচেষ্ট উদ্ভটতা

> পাখি দেখিয়াছি খুব, পাখিদের বাবার মতন
> অলৌকিক জেব্রাগুলি দেখিয়াছি,

কিংবা অসঙ্কোচ আত্মপরিচয়

> কোনোদিন ইচ্ছা হয়, খেলাচ্ছলে আফ্রিকান নৃত্যের মুখোশ
> মুখে কিমাকার এঁটে, হঠাৎ তোমার একা ঘরে এসে আসি।
> স্বভাবে বালিকা, ভীত প্রবল চিৎকার করে উঠতে যাবে, দ্রুত
> মুখোশ চকিতে খুলে হেসে উঠবো ; ততোধিক ভয়ে তুমি এবার বিস্মিত
> শব্দ করে ভেঙে যাবে, মুখোশের থেকে আরো ভয়ানক লাগছে কি
> আমার প্রত্যক্ষ মুখ পুনর্বার এত কাছে, অতর্কিত প্রেত !

অথবা সেই অচেনা চেহারা আনতে গিয়ে তাকে সেই গতায়ু দাদা-বাদের খুব নিকটে আবার চলে যেতে হলো। এমন অজস্র কবিতা আজ পত্রালি কৃতার্থ করে মাথা তুলে আছে যার সঙ্গে ত্রিস্তাঁজারা-র সেই পারি-র আনুষ্ঠানিক রচনাপাঠের বেশ অনতিদূর সম্পর্ক আছে। মধ্যমণি জারা উঠে এলেন মঞ্চে, আর তিনি যতক্ষণ একটি খবরের কাগজের নিবন্ধ চেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন একটি ইলেকট্রিক বেল সশব্দে বেজে চললো সেই কণ্ঠস্বরকে অভিভূত করে। নবীন কবিতায় জনপ্রিয়তারও কিছু অংশ

অঙ্গীভূত হয়েছে। মানুষ যাতে মজা পায় তার প্রতি আর যা-ই হোক বিকর্ষণ অনুভব করে না। ভান্, হাইনে বা লাফর্গ-কে শিখণ্ডীর মতো সম্মুখে রেখে কিছু চটুল ইয়ার্কিও আজ নবীন কবিতায় আসর জমিয়ে রেখেছে।

মূলত স্থানাভাবে এই প্রতিবেদনে যথোচিত উৎকলনসচ্ছলতা আনা গেল না। তার ফলে এর অংশবিশেষ কখনও কখনও হয়তো সরল মন্তব্যের মতো নিদারুণও লাগতে পারে, কিন্তু অহংনিবিষ্টতার যেটুকু পরিণাম বক্ষে ধারণ করে আজ বাঙলা কবিতা ঈষৎ প্রমত্ত ও উত্তাল হয়ে উঠেছে, তা মোটামুটিভাবে অন্তত স্পষ্ট হয়েছে। এই অহংনিবিষ্টতা যে শুধু কবিতাকেই কৃতার্থ করেছে তা নয়, সহযোগী সমস্ত শিল্পরূপেই তার স্বাক্ষর পড়েছে পাশাপাশিই। আজকের গদ্য ও পদ্য যে এত নিকট হয়ে উঠেছে, সহস্র নিরীক্ষার উদাহরণ সত্ত্বেও নাটক যে বাঙালির জীবন থেকে আরও দূরস্থ হয়ে পড়ছে, তা সম্ভবত ওই এক নিশ্বাসস্পর্শে। কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। মনে পড়ে অজস্রবার বলার পরে রবীন্দ্রনাথ আরও একবার মিনতি করেছিলেন

তোমার হৃদয়তাপ
তোমার বিলাপ
চাপা থাক আপনার ক্ষুদ্রতার তলে।
যেইখানে লোকযাত্রা চলে
সেখানে সবার সাথে নির্বিকার চলো একসারে,
দেখা দাও শান্তিসৌম্য আপনারে—

কিন্তু এই প্রত্নপ্রসঙ্গ খুব কম মানুষকেই বোধ করি স্পর্শ করেছে। ওই ক্ষোভোর্মিল স্রোতটিই যে প্রবলতর তা কাউকে আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। শিল্পী-অ্যাপোলোর অনুবর্তীরা আজ ম্রিয়মাণ স্বল্পবাক হয়ে এককোণে সামান্যতম স্থান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সমস্ত মঞ্চ শিল্পী-দিওন্যুসসের পার্ষদবর্গের অধিকারে। বাঙলা কবিতার পাঠকেরাও আজ স্মিতসুষমায় বোধ করি লজ্জিত হন, অন্তত বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করেন। সেই কবিতা যে পুরোনোপন্থী, শুধুমাত্র শিক্ষক মহাশয়দের অনুমোদিত, এবিষয়ে তাঁদের আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

এই মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদেরও আর অন্য কোনো কথা বলার অধিকার নেই, অন্য কোনোভাবে আশ্বস্ত হবার বা আশ্বস্ত করার অধিকার নেই। সমস্ত মুহূর্তকেই মহাকাল একবার কৃতার্থ করে তুলে পরক্ষণেই ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়, কিন্তু তা-ও বর্তমানে প্রাসঙ্গিক নয়। আমরা বাতাসের যে চেহারার মধ্যে জন্মেছি, জন্মান্তরের সংস্কারবশে তাকে আমরা কেউ কেউ ধিক্কার না দিয়ে বুকে তুলে নিয়েছি, এই সত্য আমাদের আশ্বাস দিতে পারে। সেই কতদিন আগে হেল্‌ডার্লিন ধিক্কৃত করেছিলেন তাঁর সময়টিকে

...und wozu Dichter in durftiger Zeit?

...এই নিরাত্ম সময়ে, কেন আদৌ কবি হওয়া?

এমনকি সেই আলোড়িত ইয়েট্‌স্‌কেও একবারও বলতে শোনা গিয়েছিল

What shall I do with this absurdity—
O heart, O troubled heart—this caricature,
Decrepit age that has been tied to me
As to a dog's tail?

যে মায়াকভস্কী ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন পুশকিনকে, পরিণামে তিনিই আবার তাঁকে বরণ করে তুলে নিয়েছিলেন, যে-উগো আধুনিকদের করুণায় বিসর্জিত হয়েছিলেন, তাঁকেই আবার দিব্যআসনে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন স্বয়ং ভালেরি, আর শুধু তাই নয়, আত্মাহীন সময়ের অন্ধ তাণ্ডবের মধ্যেও কেউ কেউ সর্বদেশেই, পুরাতন নীবিতাটিকে স্পর্শ করে এখনও সব তাৎক্ষণিক দুর্ব্যবহারকে নিঃশেষে ভুলে যেতে চান। এই মুহূর্তেও রূঢ়তম নবীন বাঙালি কবিও সবকিছু সত্ত্বেও মাঝে মাঝেই অজস্র নস্টালজিক চরণ নিঃশ্বসিত করে তোলেন, নিসর্গপ্রণয়ে দীর্ণ, কৈশোরিকতার ভালোবাসায় অসহায় এমন কি অনিবার্য স্মৃতির আক্রমণে দুর্বল ও বিপর্যস্ত।

পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্য

খোন্দকার সিরাজুল হক্

পূর্ব পাকিস্তান কবিতার দেশ—একথা আজ নতুন নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের আকাশে-বাতাসে, খাল-বিল-নদীর কল্ কল্ তানে, বৃক্ষের পত্র-পল্লবে, ধানের ক্ষেতে—সর্বত্র এ কথাটিই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত—'পূর্ব পাকিস্তান কবিতার দেশ'। আর এদেশের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে এর প্রমাণ বিধৃত। বিভাগোত্তর যুগের কাব্য সাহিত্য এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য এমন এক পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যে পটভূমির নির্মাণ সুরু হয়েছে বিভাগ পূর্ব-যুগেই। তাই পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্যের সার্থক আলোচনা ও মূল্যায়ণের জন্য আলোচনার কাল-পরিধি স্বাধীনতা প্রাপ্তিরও কিছু পূর্ব পর্যন্ত প্রসারিত করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় অখণ্ডভাবে কাব্য-আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে না; আলোচনায় ক্রমবিকাশের সুরও বেজে উঠবে না।

সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি—উভয়দিক থেকেই ক্রমশ পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিষয়বস্তুতে যেমন বৈচিত্র্য এসেছে, তেমনি কাব্যের form নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। "অবশ্যি পূর্ব পাকিস্তানের কবিদের সবাই যদি যুগের পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই মূল্যায়ণ উপলব্ধি করতে পারতেন তবে তাঁদের কাব্যে তাঁরা বেশি sincere হতে পারতেন। কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, তাঁরা যা বলেন তার সবটুকুই তাঁদের জীবন-পথে-আহরিত অভিজ্ঞতালব্ধ নয়—বাইরে থেকে অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার বা ইংরেজী সাহিত্যের পরিবেশ থেকে গ্রহণ করা। অভিযোগটার মধ্যে যে কিছুটা সত্যতা

আছে তা অস্বীকার করা যায় না। নিজেদের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত, আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে যা সঞ্চয় করা যায় তার মূল্য সবচেয়ে বড়—অন্যের কাছে থেকে নিলে সেখানে বক্তব্যে ও অনুভূতিতে ফাঁক থেকে যায় তা এড়ান দুষ্কর। পাক-বাংলার অনেক তরুণ কবি সম্পর্কে এ কথাটা বলা চলে। তাঁদের অনেকের মধ্যে sincerity-র অভাব।"

—ডঃ মযহারুল ইসলাম।

পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্যে এ রকম দোষ-ত্রুটি কিছু কিছু চোখে পড়ে। ফলে কখনও কখনও কিছু কবিতায় কৃত্রিমতা দেখা যাচ্ছে। যাহোক সামগ্রিক বিচারে এ দেশের কাব্য সাহিত্যের সার্থকতা অস্বীকার করা যায় না। বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি উভয়ের ক্রম-পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্যকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করতে পারি।

(১) রবীন্দ্র-কাব্যসুধা পান করে যাঁদের কবিতার অবয়ব গড়ে উঠেছে তাঁরা হলেন প্রথম পর্যায়ের কবি। অবশ্য লক্ষণীয় যে, আধুনিক পাক-ভারতের কবিদের মধ্যে (তিরিশের কবি) যে rationalism ও ব্যক্তিত্ববোধ দেখা যায় তার উৎস রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কিন্তু পাকিস্তানের এ পর্যায়ের কবিরা রবীন্দ্রনাথের এ-বৈশিষ্ট্যটিকে আত্মসাৎ করে সাম্প্রতিক কবিদের পূর্বসূরীর মর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। তাঁরা রবীন্দ্রকাব্যের সৌন্দর্য-সচেতনতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকেই আজীবন কাব্যসাধনা করে চলেছেন। অবশ্যি এ-পর্যায়ের কবিদের কেউ কেউ মুসলিম ঐতিহ্যের পরিচয় দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্যকে নতুন পর্যায়ে উত্তরণে সাহায্য করেছেন। গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, আবদুল কাদির, সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা প্রমুখ কবিকে এ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

গোলাম মোস্তফা বিভাগোত্তর যুগ থেকেই কবিতা রচনা করে আসছেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে পঞ্চম দশক পর্যন্ত তাঁর কাব্যরচনার কাল-পরিধি বিস্তৃত। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অজস্র কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা প্রেম সম্পর্কীয় কবিতায় বিধৃত। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও সমসাময়িক বিভিন্ন

ঘটনা দ্বারা তিনি তাঁর কাব্যে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা করলেও, একমাত্র প্রেমের কবিতায় তিনি সাবলীলতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। অবশ্যি তাঁর প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ সর্বদা abstract idea রূপে কাব্যে প্রতিফলিত হয় নি, কখনও কখনও তা ব্যক্তিক অনুভূতিতে জারিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে :

"হায় প্রিয়া! কবি-চিত্ত একা কারো নয়!
কবি আমি, চিরদিন রূপের পিয়াসী,
এ বিশ্বের যত রূপ—সবারেই আমি ভালবাসি।"

এখানে ব্যক্তিক প্রেমের কথা উল্লিখিত হলেও প্রেমের ক্ষেত্রে sincerity-র পরিচয়ও রূপায়িত হয়েছে।

শাহাদাৎ হোসেনের কবিতার বিষয়বস্তু প্রকৃতি ও সৌন্দর্যবোধ। কিন্তু লক্ষণীয় যে, কবির প্রকৃতি বাস্তব জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতি নয়, আদর্শায়িত প্রকৃতি। তিনি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সেই প্রকৃতি ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চান :

"আজো কবি ফেরে নাই কল্পলোক-বাসে
ধরণীর বনকুঞ্জে আনন্দ প্রবাসে
আজো সে রয়েছে বসি শ্যামল মায়ায়
রূপচ্ছবি আঁকিতেছে কল্প তুলিকায়।"

শাহাদাৎ হোসেনের কাব্যে আমরা জাতীয়তাবাদেরও সাক্ষাৎ পাই। আর এদিক থেকে তিনি নজরুলের অনুসারী। কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবাদ নিজস্ব স্বপ্নের মধ্যেই পুনর্জাগরিত। এবং বাস্তব জীবনে সে জাতীয়তাবাদের মূল্য যে কতটুকু তা' প্রশ্ন সাপেক্ষ। বস্তুত, তিনি এমন এক স্বপ্নে আচ্ছন্ন যা' বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। কারণ তিনি ছিলেন কলাকৈবল্যবাদে বিশ্বাসী। শাহাদাৎ হোসেন প্রকৃতি ও সৌন্দর্য দৃষ্টির দিক থেকে রবীন্দ্র অনুসারী হলেও ভাষার দিক থেকে তিনি নজরুলের অনুসারী। তাঁর ভাষা উদ্দীপনামূলক ও পৌরুষব্যঞ্জক।

রবীন্দ্র-বলয়ের কবিদের মধ্যে আবদুল কাদির কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন। সৌন্দর্যবোধ ও কল্পনা তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে তিনি রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রমে

প্রয়াসী। রবীন্দ্রনাথের অশরীরী প্রেমানুভূতি অস্বীকার করে আবদুল কাদির প্রাণদৃপ্ত দেহবাদী চেতনার পরিচয় দিয়েছেন :

"মোর মনে জাগে একটি কামনা,
আকাশে জাগিছে চাঁদ ;
সাগরে অগাধ উতল কামনা,
তব দেহে অবসাদ।"

অবশ্যি এদিক থেকে তাঁর কাব্য দেবেন সেন, মোহিতলালদের সমধর্মী। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। আবদুল কাদিরের কাব্য-চর্চা এর বেশী অগ্রসর হয় নি। ফলে তিনি নতুনত্বের কিছু পরিচয় দিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

বেগম সুফিয়া কামাল বিভাগ-পূর্ব যুগ থেকেই কাব্য-সাধনা করে আসছেন। তাঁর 'সাঁঝের মায়া' ১৯৩৮ সালে, 'মায়া কাজল' ১৯৫১ সালে এবং 'মন ও জীবন' ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়। অন্যান্য রোমান্টিক কবিদের মতো সুফিয়া কামালও প্রেম ও প্রকৃতির পূজারী। লক্ষণীয় যে; তাঁর প্রেমের ভিত্তি জীবন জিজ্ঞাসা নয়, নারী-হৃদয়ের শুভ্র মাতৃত্ব। কিন্তু তাঁর কবিতায় মহত্ব এখানে যে, চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই কবিতার আবেদন নিঃশেষিত হয়ে যায় নি, পরন্তু পৃথিবীর ব্যাপ্তির মধ্যে তা' সার্থকতা লাভ করেছে। এ শ্রেণীর আরেকজন মহিলা-কবি হলেন 'পসারিণী' কাব্য-গ্রন্থের রচয়িতা মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা।

(২) পল্লী জীবন ও লোকগাথাকে অবলম্বন করে যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন তাঁরা হলেন দ্বিতীয় পর্যায়ের কবি। জসীমুদ্দীন এ-পর্যায়ের কবিদের পুরোধা। জসীমুদ্দীনের কাব্যসাধনা শুরু হয় মূলত প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের দেশে বিক্ষোভ ও আলোড়ন দেখা দিয়েছে। খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন আবিষ্ক্রিয়া, মাত্র বিশ বছরের ব্যবধানে দুটি বিশ্বযুদ্ধের সংঘটন, আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে নানাভাবে বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত করেছে। আর এই ডামাডোলের মধ্যে জসীমুদ্দীন তাঁর কাব্যে রূপায়িত করলেন পল্লী জীবনের শান্ত, স্নিগ্ধ ও আকর্ষণীয় রূপ। তাঁর কাব্যে জীবন্ত হয়ে উঠলো পল্লী-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম

ও প্রীতি। তাঁর 'নক্সী কাঁথার মাঠে'র সাজু-রূপাই ও 'সোজন-বাদিয়ার ঘাটে'র দুলি-সোজন আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। অপূর্ব লাবণ্যময়ী সাজুর রূপ বর্ণনায় তিনি যে সকল উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেছেন তা তাঁর আশ্চর্য কবি-কর্মের পরিচয় বহন করে:

"কচি কচি হাত-পা সাজুর সোনায় সোনার খেলা,
তুলসী তলার প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।

* * *

লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী
ভোরের হাওয়া যায় যেন গো প্রভাতী মেঘ নাড়ি।"

দীনেশচন্দ্র সেন জসীমুদ্দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' পড়ে যে মন্তব্য করেছিলেন তা উদ্ধৃতিযোগ্য—

"আজ জসীমুদ্দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্যখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এ যেন সেই পুরাতন পল্লীকে ফিরিয়া পাইলাম,—সেই পল্লীর পথ-ঘাট যেন কত চেনা-হৃদয়ের দরদ দিয়ে আঁকা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের দুটি ডাগর চোখ, পল্লী রাখালের চোখ জুড়ানো কালরূপ, মুসলমান লেঠেলদের মারামারি—বাংলার বিবাহবাসর, গিন্নির ঘর-কন্না—এই সকল দৃশ্যে বুক জুড়াইয়া গেল। এই পল্লী দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ছিল—এখনও হয়তো কিছু কিছু আছে। কিন্তু এ সকল হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। এই হারানো জিনিষ নতুন করিয়া পাওয়ার যে আনন্দ, কবি জসীমুদ্দীন তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন।" এ পর্যায়ের কবিতাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বিষয়বস্তু যেমন সহজ সরল, ভাষাও তেমনি সরল ও সাবলীল। গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগের ফলে এ-সকল কবিতায় স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়েছে। এ-পর্যায়ের অন্যান্য কবি—বন্দেআলী মিয়া, আবদুল হাই মাশরেকী, রওশন ইজদানী ও আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী।

বন্দে আলী মিয়ার 'ময়নামতীর চরে' পল্লীর প্রকৃতি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। প্রেমের কবিতা রচনায়ও তিনি সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। রওশন ইজদানীর 'চিহ্ন বিবি', 'রঙীলা বন্ধু' প্রভৃতি কাব্য গ্রন্থগুলোতে

পল্লী-জীবনের সুর সহজ ও সুন্দররূপে প্রকাশিত। কাব্য রচনার দিক থেকে তিনি জসীমুদ্দীনের ভাব শিষ্য।

আবদুল হাই মাশরেকীও পল্লী প্রকৃতির সৌন্দর্য ও পল্লী মানুষের সুখ দুঃখের বিচিত্র কাহিনী কাব্যে রূপায়িত করেছেন। তাঁর কাব্যে পল্লীজীবনের কাব্যিক প্রকাশ সূক্ষ্ম সৌন্দর্য সুষমায় মণ্ডিত। কবিতায় চিত্রাঙ্কণে তিনি যে কত দক্ষ তার পরিচয় পাওয়া যাবে নিম্নোধৃত কয়েকটি পংক্তিতে:

> "বধূটি দাঁড়ায় ঘাটে।
> করুণ কান্নার মতো সন্ধ্যা নামে গ্রামে
> দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে পথিকেরা দ্রুত হাঁটে।"

একটি মধ্যযুগীয় লোক-গাথাকে অবলম্বন করে আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী 'আমির সওদাগর' নামে একটি সুন্দর কাব্য রচনা করেছেন। ইতিপূর্বে এই লোক গাথাটিকে অবলম্বন করে অনেক গ্রাম্য কবি অনেক গান রচনা করেছেন, জনসাধারণের কাছে যা 'আমির সাধু' বা 'ভেলুয়া সুন্দরী'র পালা নামে পরিচিত। কাব্যটি সহজ-সুন্দর ছন্দে রচিত। কিছুটা উধৃত করা যাক:

> "কেঁদোনা কেঁদোনা মাগো এ-দুঃখের দিন
> একদিন হবে অবসান,
> আপনার দেলে মাগো রাখিও একিন,
> মসিবতে আল্লা নেগাবান।"

এখানে লক্ষণীয় যে, 'দিল', 'একিন', 'মসিবত', 'নেগাবান' প্রভৃতি আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করে কাব্যটিতে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস আছে।

(৩) পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনবাদে (revivalism) যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা হলেন তৃতীয় পর্যায়ের কবি। এ-পর্যায়ের প্রধান কবি হলেন ফররুখ আহমদ। তাঁর কাব্যে এক দিকে আছে আরব্য উপন্যাস, ইরাণ ও আরবের সংস্কৃতি এবং কোরাণের কাহিনীর ঐতিহ্য, অপরদিকে আছে মুস্‌লিম অভ্যুত্থান যুগের ব্যক্তিত্ব ও

ভাবধারার ঐতিহ্য। এই দুই ভাবধারার নিদর্শন পাওয়া যাবে যথাক্রমে 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজুল মুনীরা' কাব্যে :

"কোন অজ্ঞাত বন্দরে এসে লাগলো সেই জাহাজ
মনে পড়ে নাকো আজ,
তবুও সেখানে ভ'রেছে জাহাজ মারজানে মর্মরে
এইটুকু মনে পড়ে।

—সাত সাগরের মাঝি

লক্ষণীয় যে, ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যে প্রতীকের মধ্য দিয়ে মুস্‌লিম ঐতিহ্যের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন :

"আজকে তোমার পাল উঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ওঠাতেই হবে।"

এখানে 'ছেঁড়া পাল' ও 'ভাঙা মাস্তুল' দ্বারা কবি মুস্‌লিম সমাজের মুমূর্ষু অবস্থার কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কবি আশাবাদী। পূর্ব ঐতিহ্যের কথা মনে করে 'তবুও জাহাজ আজ ওঠাতেই হবে'। সম্প্রতি প্রকাশিত ফররুখ আহমদের কাব্য গ্রন্থ 'মুহূর্তের কবিতা'য়ও এই আদর্শানুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সাত সাগরের মাঝি'তে কবির যে ঐতিহ্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায় 'মুহূর্তের কবিতা'য় তা সনেটের সীমাবদ্ধ পরিসর ও সুনির্দিষ্ট আঙ্গিকের মধ্যে তা আরো সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। এ কাব্য গ্রন্থে ফররুখ আহমদের কৃতিত্ব এই যে, সনেটের বিশিষ্ট আঙ্গিকে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ভাবানুভূতিকে বন্দী করে রেখেছেন। ফলে D. G. Rossetti সনেটকে যে 'moment's monument' বলে অভিহিত করেছেন তা' তাঁর কাব্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য :

"ক্ষণিকের অবকাশে রেখে যায়
রক্তিম স্বাক্ষর,
নিঃশব্দের বিয়াবানে করে
কোটি কণ্ঠকে সরব,
তারপর মিশে যায় কীটানুর
ক্ষীণ অবয়ব
কোনদিন, কোনখানে আর যার,
মেলে না খবর।"

—মুহূর্তের গান

এ-ধারার আর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন তালিম হোসেন। 'দিশারী' ও 'শাহীন' তাঁর দুটি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ। তাঁর দুটি কাব্য গ্রন্থে তালিম হোসেনের দুই কবি-সত্তা বিধৃত। 'দিশারী'তে তাঁকে একজন ইস্‌লামের ঐতিহ্যবাদী বলে মনে হয়। এবং এ-দিক থেকে তিনি ফররুখ আহমদের অনুসারী। কিন্তু 'শাহীনে' কি দেখলাম? দেখলাম 'শাহীন' কতকগুলো মৌল লক্ষণে মণ্ডিত—যা থেকে অনুমেয়, কবি মেজাজে রোমান্টিক এবং আবরণে ধ্রুপদী। আধুনিক কবিতায় যে অবিশ্বাস, সংশয় ও নৈরাশ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তালিম হোসেনের শিল্পতত্ত্ব তার বিরোধী নয়:

"সুন্দর তার দিঠি তলে
থাকে সত্যের সন্ধান
অথবা থাকে সে মায়া-জালে
মিথ্যার চারু রূপদান।"

—শিল্পতত্ত্ব, শাহীন

(৪) রবীন্দ্র বিরোধিতা দিয়ে যাঁদের কাব্য চর্চা শুরু এবং যুদ্ধোত্তর জীবনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অবিশ্বাস ও সংশয় যাঁদের কাব্যের বিষয়বস্তু এবং যাঁরা বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসারী তাঁরাই আমার পরিকল্পিত চতুর্থ পর্যায়ের কবি। পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কবিগণের অধিকাংশই এ পর্যায়ে পড়েন। এ পর্যায়ের অধিকাংশ কবিদের সম্পর্কে আলোচনার অসুবিধা এই যে, মাত্র কয়েকজন কবি ছাড়া এ পর্যায়ের অধিকাংশ কবিই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন মাত্র। তাঁদের পরিপূর্ণ রূপ দর্শনের জন্য আমাদিগকে আরো অপেক্ষা করতে হবে।

যাঁরা কাব্য রচনায় মোটামুটি পরিণতির পরিচয় দিতে পেরেছেন, তাঁরা হলেন, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, মযহারুল ইসলাম ও মসুর রহমান। এছাড়া যে-সকল কবিদের মধ্যে প্রতিভার দ্যুতি দেখা গিয়েছে তাঁরা হলেন সানাউল হক, সৈয়দ আলী আহসান, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ মামুন, আব্দুল গণি হাজারী, মাহফুজুল্লাহ, আব্দুস সাত্তার, হাবীবুর রহমান, ওমর আলী, সেবাব্রত চৌধুরী, মণিরুজ্জমান, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, সৈয়দ আলী আশরাফ, লতীফা হিলালী, জাহানারা আরজু প্রমুখ।

আহসান হাবীব পূর্ব-পাকিস্তানের একজন প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'রাত্রি শেষ' ১৯৪৭ সালে ও দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'ছায়া হরিণ' ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। 'ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে' নীড়-রচনার বাসনা 'রাত্রি শেষের' অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সমকালীন বাঙালী সমাজের আলোড়ন, ক্লান্তি ও অবসাদের গভীর যন্ত্রণা আহসান হাবীব তাঁর কবি মন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং তা' পরিপূর্ণরূপে রূপায়িত করেছেন তাঁর 'রাত্রি শেষ' কাব্যগ্রন্থে। তাঁর কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি দুঃখ ও ক্লান্তিজর্জর পরিবেশেও মানবজীবন সম্পর্কে আশাবাদী। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ছায়া হরিণে' সেই আশাবাদ ক্ষয়িষ্ণু ও ক্ষীণ। যে বিশ্বাসকে অবলম্বন করে তিনি 'রাত্রি শেষে' যাত্রা শুরু করেছিলেন—যাত্রার বিভিন্ন স্তর, তার আনুষঙ্গিক অভিঘাত ও প্রতিক্রিয়ায় সে বিশ্বাস শিথিল ও ছিন্নমূল। কেননা :

'সমুদ্র অনেক বড় আর তার বড় বেশী
দম্ভ আছে বলে
তাকে ভয় ;"

—সমুদ্র অনেক বড়

আবুল হোসেনের কাব্যে মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা ও বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন প্রমুখাৎদের অনুসারী। তবু এই নাগরিক জীবনের রূপকারদের থেকে আবুল হোসেন স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত। তাঁর 'নব বসন্ত' বিভাগ-পূর্ব যুগে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। বিভাগোত্তর যুগে তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। এবং বর্তমানে তিনি কাব্যচর্চার ক্ষেত্র থেকে প্রায় অনুপস্থিত। আবুল হোসেন ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। আর এখানেই আহসান হাবীবের সঙ্গে তাঁর মৌল পার্থক্য। আহসান হাবীব সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ বলে তাঁর কাব্যে গণচেতনার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু আবুল হোসেনে তা নেই। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আবুল হোসেন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন :

"মাঝে মাঝে মনে হয়
একটু একটু করে এই প্রাণক্ষয়
না করলেই নয়।

দিনে দিনে তিলে তিলে মরে মরে
এই বেঁচে থাকা
এর মানে কী।"

—ঢাকা মধ্যবিত্ত

মযহারুল ইসলাম সাম্প্রতিক কালের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি। বিভাগ-পূর্ব যুগ থেকেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে আসছেন। তাঁর কাব্য রচনার মধ্যে একটি সুন্দর ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, মযহারুল ইসলাম পূর্ব-পাকিস্তানের একজন প্রতিষ্ঠিত গল্পকার ও প্রাবন্ধিক। তাঁর গল্প-সংকলন 'তাল-তমাল' ও প্রবন্ধ গ্রন্থ 'সাহিত্যপথে' যার সাক্ষ্য। এছাড়া গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। মধ্যযুগের মুসলিম কবি 'হেয়াত মামুদ' তাঁরই গবেষণায় অতলান্ত বিস্মৃতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। সম্প্রতি 'লোক-সংস্কৃতি' নিয়ে গবেষণা করে আমেরিকার থেকে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরেছেন। বর্তমানে তিনি পাক-ভারতের অন্যতম কৃতী 'লোকবৃত্ত' বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃত। মযহারুল ইসলামের বিভিন্নমুখী প্রতিভার উল্লেখের তাৎপর্য এই যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর এই অভিজ্ঞতা ও মননশীলতা তাঁর কাব্যকে পরিণতি দানে সহায়তা করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর কাব্যে যেমন এসেছে বৈচিত্র্য, তেমনি গবেষক সুলভ মনোভাবাপন্ন হওয়ায় তিনি তাঁর কাব্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

মযহারুল ইসলামের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মাটির ফসল' ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 'মাটির ফসলে'র কয়েকটি কবিতায় শিক্ষানবিসীর ছাপ পরিলক্ষিত হলেও অধিকাংশ কবিতাই অনবদ্য। বিশেষত তাঁর 'রাজহাঁস' কবিতাটি পাঠক সমাজের অত্যন্ত প্রিয়।

হিংসা-দ্বেষ-জর্জরিত, পরস্ব-লোলুপ একজাতীয় মানুষ সাধারণ মানুষের শান্ত ও আনন্দময় জীবনে ধ্বংসের প্লাবন এনে দেয়। শিকারী যেমন রাজহাঁস শিকারে সাগর তীরে সঞ্চরণশীল, তেমনি হানাদারেরা মানুষরূপ রাজহাঁস শিকারে সংসার-সাগর তীরে অপেক্ষমান। কিন্তু কল্পনা-চারী মানুষ আপন কল্পনায় প্রেমপূর্ণ পৃথিবীর স্বপ্ন রচনা করে। সে সসীম ও অসীমের মাঝে মিলন-সেতু রচনায় ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু রক্তলোলুপ,

পরশ অপহরণকারী শিকারী-মানুষের শরাঘাতে তার সে স্বপ্নের সেতু, সুন্দরের আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়। কবি মযহারুল ইসলাম রাজহাঁস রূপকের মধ্য দিয়ে এই ভাবধারাটিকে 'রাজহাঁস' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। বর্তমানে তাঁর কবিতা ভাবধারা ও আঙ্গিক উভয় দিক থেকেই পরিণতি লাভ করেছে, তার প্রমাণস্বরূপ নিয়ে দুটি কবিতাংশ উধৃত করা যাক :

(১) কি হবে কি হবে বলো, এখানে এমন
এই দাঁতো-হাসি হেসে, যেখানে যেমন
প্রয়োজন, ওষ্ঠের ভাষা দিয়ে অপরের মনে
দাগ কেটে। হৃদয়কে চাপা দিয়ে শত আবরণে
যন্ত্র চালিয়ে শুধু সভ্যতার শীর্ষে উড্ডয়ণ
ভব্যতার মুখোসের ছিন্ন বস্ত্রে ঢেকে দুনয়ন
কি পেয়েছি অথবা কি পাবো বলো : চলো যাই
সেই ভালো চলো ফিরে যাই
যেখানে পাতার ছায়ে সোনার স্বপনমাখা গ্রাম...

—চল ফিরে যাই

(২) আমার দু'হাত ভরে সেই দান কেন বা নেব না
কণ্টক বিদীর্ণ পথে কেন পা দেব না
যদি জানি ওপারের মেঘ
নরম মাটির বুকে ঢেলে দেবে সবুজ আবেগ...

—চুম্বনের শেষ লগ্ন : মিলনের প্রথম প্রহর

প্রথম কবিতায় দেখা যাচ্ছে নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতায় কবি ক্লান্ত হয়ে, বিরক্ত হয়ে, গ্রামের শান্ত, স্নিগ্ধ, আবহাওয়ায় ফিরে যেতে চান। ফিরে যেতে চান 'মধুমাখা মধুমতী নদীটির তীরে'। কিন্তু কবি পলায়ণ-বাদে (escapism) বিশ্বাসী নন। রূঢ় বাস্তবতাকে স্বীকার করবার মতো মনোবল তাঁর আছে। সুন্দর মুহূর্তগুলো জীবনে খুব বেশী আসে না। সেই সুন্দর পেলব মুহূর্তগুলো পেতে হলে যদি 'কণ্টক বিদীর্ণ পথে' পা দিতে হয় তবু দিতে হবে কারণ ফলশ্রুতি হিসেবে 'সবুজ আবেগ' পাবার সম্ভাবনা আছে। মযহারুল ইসলামের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ভিরিদেশের কবিদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ক্রমপরিণতির পথে এগিয়ে চলেছেন।

সাম্প্রতিক কালের আর একজন বিশিষ্ট কবি হলেন শামসুর রহমান। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' ১৯৬০ সালে এবং দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে' ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। শামসুর রহমান প্রেম ও প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন সত্য কিন্তু তাঁর কাব্য প্রতিভা এই কবিতাগুলোর মধ্যে বিধৃত হয়নি। তাঁর বাস্তবনিষ্ঠ কবিতাগুলোই তাঁর কাব্যপ্রতিভার স্বাক্ষর। নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সমাজের হাতে আক্রান্ত ভাবার ফলেই শামসুর রহমানের পক্ষে সমাজের স্বরূপ-উপলব্ধি সহজ হয়েছে। সমাজের অস্বাস্থ্যকর ও আপাত মনোরম আবহাওয়া বিস্মৃত হতে পারেন নি তিনি, দেখেছেন এর কুৎসিত রূপ, দেখেছেন সুন্দরের ছদ্মবেশে অসুন্দরকে। তাই কখনও তিনি এই ক্লিন্ন পরিবেশকে চিত্রায়িত করেছেন, আবার কখনও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে সমাজের সেই ক্ষত দূর করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ থেকে দুটি কবিতাংশ তুলে ধরলেই এই বক্তব্যটি সুপরিস্ফুট হবে :

(১) পোষাকের জেল্লা তবু পারে না লুকাতে কোন মতে
বিকৃত দেহে ক্ষত লোবানের ঘ্রাণ সহজেই
ডুবে যায় প্রাক্তন শবের গন্ধে, নীল আঙুলের
প্রান্ত বিদ্ধ তিনটি দিনের ক্ষমাহীন অন্ধকার।'

—প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে

(২) এ পাড়ার ১৭টি উজবুক ৫ জন বোবা
৭টি মাতাল আর ৩ জন কালা বেঁচে-বর্তে
আছে আজো দুর্দশার নাকের তলায়। মাঝে মাঝে
দুর্লভ আঙুর চেয়ে কেউ কেউ তারা বলে থাকে :
"টক সব টক—তার চেয়ে তাড়ির ঝাঁঝালো চোক
ঢের ভালো, ভালো সেই গলির মোড়ের জলজলে
পানের দোকান আর বাইজীর নাচের ঘুঙুর।"

—রৌদ্র করোটিতে

শামসুর রহমানের কবিতার বিষয়বস্তুতে আছে আন্তরিকতা ও অনুভূতির স্বাক্ষর। কিন্তু প্রকাশভঙ্গীতে এখনও তিনি স্বাতন্ত্র্য অর্জন

করতে পারেন নি। রূপক ও প্রতীকের জন্য আজও তিনি জীবনানন্দ, সুধীন দত্তদের ঘূর্ণাবর্তে পথ ভ্রান্ত। প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে স্থূল অনুকরণের ফলে তাঁর অনেক কবিতা সম্ভাবনা থাকলেও মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। মনধর্মিতা ও জীবন প্রীতির সঙ্গে প্রকাশ ভঙ্গীর সুষ্ঠু সমীকরণ হলে তাঁর কবিতা অনন্য সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখে যেতে পারবে। তাঁর মধ্যে এ সম্ভাবনা ও শক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে।

সানাউল হকের প্রথম কাব্য গ্রন্থ : 'নদী ও মানুষের কবিতা'। ৩৯টি কবিতার এই সঙ্কলনটি বের হয় ১৯৫৭ সালে। সানাউল হকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অত্যন্ত আত্মসচেতন কবি। অন্তত তাঁর এই কাব্যটিতে ব্যক্তি-মনের ছাপ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সমাজ ও জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু বার বার একই বৃত্তে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সূর্য অন্যতর' ও 'সম্ভবা অনন্যা' সম্প্রতি প্রকাশিত হবার পর সানাউল হকের সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয় স্থাপন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই নতুন পরিবেশে তিনি obscurity-র ভক্ত হয়ে পড়ছেন। অন্তত তাঁর শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থ দুটিতে যে ভাবে নতুন রীতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, তাতে আমরা সত্যিই এক সত্যের মুখ-দর্শন করি। ঘন ঘন কমা, দাড়ি, কোলন, সেমিকোলনের কণ্টকে তাঁর কবিতার গতি প্রতিহত হয়েছে। টেলিস্কোপিক এই রীতিতে কবিতা লেখার পরীক্ষা আরো কয়েকজন কবি করেছেন। জেরার্ড হপকিন্সই প্রথম স্প্রাং রিদমের পরীক্ষাকালীন ছন্দেরএই উল্লম্ফন-রীতি আবিষ্কার করেন। এর পরে বাংলা কাব্যে অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে এ-রীতির সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য ক্ষেত্রে সানাউল হক এ-রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন সত্য, কিন্তু এর সার্থকতার ওপর নির্ভর করছে তাঁর কাব্য-সাফল্য।

'বিমুখ প্রান্তর' হাসান হাফিজুর রহমানের'সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ। এলিয়টের 'Waste Land' এর সঙ্গে কাব্যটির নামকরণের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এ-কাব্যটিতে এলিয়টের কাব্যের মতো নাগরিক অস্তিত্বের আর্তধ্বনি, গ্লানির দুঃসহ পীড়া ও বন্ধ্যাত্বের নিদারুণ

দাহ নেই, আছে শুধু আশা, প্রতীক্ষা ও বিশ্বাস। চিত্রকল্প রচনায় হাসান হাফিজুর রহমান পারদর্শী :

> "আমাদের স্তব্ধ মূর্তিগুলো অখণ্ড এক শ্রদ্ধায় যেন
> পবিত্র আজানের মত হয়ে উঠলো,
> পবিত্র আজানের মতো হয়ে উঠলো এক একটি জৈবিক মানুষ।'

'প্রেমে পড়েছি কৃষ্ণচূড়ার' কবি মোহাম্মদ মামুন আবেগের প্রাবল্যে কবিতা রচনায় সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। আবেগকে সংযত করতে পারলে তিনি যে সার্থক কাব্য রচনা করতে পারবেন তার পরিচয় 'প্রেমে পড়েছি কৃষ্ণচূড়ার' কোন কোন কবিতায় দেখা যায় :

> "শুনেছিলাম, সে নাকি চাঁদ ভালবাসে
> ভালবাসে ফুল, পাখী আর নক্ষত্র-মানুষ-মন।
> পুরানো ইতিহাসে তলিয়ে গেলাম
> জিনিয়া ফুলের মতই সে হাসি
> যাকে আমি দেখেছিলাম তখন
> ছবির তলায় লেখা ছিলো :
> 'আমাকে কেউ ভালবাসে না।"

সৈয়দ আলী আহসানের কাব্য গ্রন্থ 'অনেক আকাশ' ১৯৬০ সালে প্রকাশিত। কবি তাঁর এই কাব্যে সমস্ত স্বপ্ন ও বিশ্বাসকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি অনভূতিকে রূপ দিয়েছেন :

> "যে নায়িকা মূর্চ্ছাহত সূর্যের দিবসে
> অথবা পাণ্ডুর রাত্রে দেহ উদ্ঘাটন
> অথবা আকাশ যেন উদ্দাম ঝঙ্কার
> স্নায়ু কেন্দ্র উচ্চকিত সে-নায়িকা প্রেয়সী আমার।"

আদিম বৃত্তি প্রকাশ ভঙ্গিতে কতদূর মার্জিত ও সুসমঞ্জস হতে পারে 'অনেক আকাশে'র উধৃত কবিতাংশটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইংরেজী সাহিত্যে সুপরিচয়ের ফলে তাঁর অনেক কবিতায় এজরা পাউণ্ড ও জেম্‌স্ জয়েস-এর ছাপ পড়েছে।

'সামান্য ধন' আবদুল গণি হাজারীর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ। আবদুল গণি হাজারী সমাজ-সচেতন কবি। তাঁর কাব্যে একদিকে যেমন রূপায়িত হয়েছে পারিপার্শ্বিক জীবনের সাধারণ রূপ অপরদিকে তেমনই

তাতে যুগ-যন্ত্রণাও অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি নীচুতলার মানুষের জীবন নদে ডুব দিয়ে সার্থকভাবে কাব্যবস্তু আহরণ করেছেন :

"ঘাসের তাঁবুর বুকে দু'একটি চাষী
কখনো ককিয়ে উঠে নিবিড় নিদ্রায় যায় ফিরে।
গাজনার ঘুম নেই গাজনার চোখে।"

—গাজনা

প্রেম ও প্রকৃতিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে মাহফুজুল্লাহর 'জুলেখার মনে'র পরিসর। অবশ্যি তাঁর কাব্যে প্রেমের চেয়ে প্রকৃতিরই প্রাধান্য :

"এত ভিড় এই দেশে, এত রূপ রয়েছে ছড়ানো
তবুও কবিতা নেই আকাশের খিলানে গম্বুজে।"

— কবিতার স্বপক্ষে।

গভীর জীবনবোধ অথবা জীবন-দর্শনের ব্যাপক ক্ষেত্রে নয়, প্রেম ও প্রকৃতির জগতেই মাহফুজুল্লাহর কল্পনার পক্ষ-সঞ্চালন।

মাহফুজুল্লাহ পুঁথি সাহিত্য ও লোক গাথা নিয়ে মাঝে মাঝে কাব্য রচনা করেন। আর এদিক থেকে তিনি ফররুখ আহমদের অনুসারী।

প্রেম ও প্রকৃতিকে অবলম্বন করে যুগ যুগ ধরে কবিরা কাব্য রচনা আসছেন এবং আবদুস সাত্তারের 'বৃষ্টিমুখর' কাব্য গ্রন্থটিতেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ও প্রেমের নভোচারী মহৎ বৃত্তি আবদুস সত্তারের কবি মনকে মুগ্ধ করেছে। এবং লক্ষণীয় যে, এই প্রকৃতি প্রীতির অনুসঙ্গ হিসেবে তাঁর মনে নাগরিকতার প্রতি বিতৃষ্ণা জেগেছে।

"সেই ভালো ফিরে যাবো গ্রামের নিভৃতে
যেখানে মোমের মতো শিয়রে
মায়ের স্নেহ জ্বলে..."

—সেই ভালো

উপমা প্রয়োগে আবদুস সাত্তার সার্থকতার পরিচয় দিলেও ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর হাত অপরিণত।

একত্রিশটি কবিতার সংকলন 'উপান্ত' হাবীবুর রহমানের প্রথম কাব্য গ্রন্থ। কবিতাগুলোতে সাধারণভাবে রোমান্টিক ও সামাজিক

ধারণা ও ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফল দেখা যায়। কবিতায় image ব্যবহারে ও ছন্দ নির্মাণে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় 'উপান্ত'র অধিকাংশ কবিতাই বক্তব্য সর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

আটত্রিশটি কবিতা নিয়ে গড়ে উঠেছে তরুণ কবি সেবাব্রত চৌধুরীর 'স্বদেশ আমাকে নিসর্গ'-এর কলেবর। এ-কাব্যের কিছু সংখ্যক কবিতায় অপরিণতির ছাপ থাকলেও কয়েকটি কবিতায় কবির বক্তব্য স্বার্থকতা লাভ করেছে। জীবনের সম্ভাবনায় বিশ্বাসই কবি-চিত্তের মুক্তি ঘটিয়েছে শাশ্বত আশা ও আশ্বাসের জগতে। তাই কবি বলতে পেরেছেন—

'নিঃসঙ্গ দুঃখের আর্তি শেষ সত্য নয়।'

পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্যের এই আলোচনা থেকে আমরা একথা সহজেই বলতে পারি যে, এ-দেশের কাব্য-সাহিত্য দ্রুত পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। অনেক কবি এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত আছেন, ফলে এখনও তাঁরা আত্মস্থ হতে পারেন নি। তাঁরা নিজ নিজ পথ আবিষ্কার করতে পারলে পূর্ব-পাকিস্তানের কাব্য সাহিত্য যে সমৃদ্ধি লাভ করবে, তাতে সন্দেহ নেই।

সমসাময়িক কবিদের কাব্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভব নয়। কারণ, তাঁদের অনেকেরই পরিপূর্ণ রূপের অভাব। তাঁদের প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে আমাদিগকে আরো অপেক্ষা করতে হবে। সাহিত্য চলতা ধর্মী। নদীর স্রোতধারার মতই তা' গতিবান। পূর্বপাকিস্তানের কাব্যতরী বাঁক ফিরে ফিরে চলেছে। মোহনা এখনও দূরে।

বাংলা সংবাদপত্রের ভাষা : গত এক দশক

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

রচনাভঙ্গী ও ভাষার দিক থেকে বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রগুলিকে রক্ষণশীল বলা চলে। কথাসাহিত্যে যেসব পরীক্ষা হয়েছে তার দ্বারা বাংলা সংবাদসাহিত্য সামান্যই প্রভাবিত হয়েছে। কথাসাহিত্যের জগৎ থেকে সাধু ভাষার প্রায় নির্বাসন ও তার জায়গায় চলতি ভাষার প্রায় একাধিপত্য স্থাপিত হলেও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত চলতি বাংলার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। (যুদ্ধের সময় প্রকাশিত অধুনালুপ্ত "প্রত্যহ" পত্রিকাটি ব্যতিক্রম। এর সংবাদ ও মন্তব্য আগাগোড়া চলতি বাংলায় লেখা হত। শুধু সাধু ভাষাই নয়, এক ধরণের গুরুগম্ভীর চালের তৎসম শব্দ বহুল বাংলাকেই আমরা সংবাদ-পত্রের উপযুক্ত ভাষা বলে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিলাম)।

কিন্তু গত এক দশকের কথা যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে আমার মনে হয়, দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চলতি বাংলার প্রবেশ এই এক দশকের বাংলা সংবাদসাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ, ফিচার জাতীয় রচনা, সংবাদ পটভূমি প্রভৃতি ইতিমধ্যে চলতি ভাষার এক্তিয়ারে এসে গেছে। গতানুগতিক রিপোর্টের বাইরের কিছু কিছু বিশেষ ধরণের সংবাদও আজকাল চলতি ভাষায় লেখা হচ্ছে।

এই পরিবর্তন শুধু ভঙ্গীর নয়, বিষয়বস্তুরও। গত এক দশকে সংবাদের সংজ্ঞা ব্যাপকতর হয়েছে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পাঠ্যবিষয়ের বৈচিত্র্য এসেছে। বিষয়বস্তুর এই বৈচিত্র্যই ভাষার বৈচিত্র্যকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে।

বাংলা সংবাদপত্রের সংবাদ আজকের দিনে কতকগুলি ঘটনার বিবৃতিমাত্র নয়। কোথাও বাৎসরিক মেলা হচ্ছে, আগেকার দিনে

বাংলা সংবাদপত্রে এটা ফলাও করার মত সংবাদ ছিল না—যদি না সেখানে বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা বা চুরিডাকাতি ঘটত। কিন্তু আজকের দিনে এই মেলাটাই একটা বড় সংবাদ হয়ে ওঠে—যদি তার বিবরণ একটা বিশেষ ভঙ্গীতে উপস্থিত করা হয়। এই বিশেষ ভঙ্গীটি হচ্ছে একটা অভিজ্ঞতাকে অথবা কতকগুলি অনুভূতিকে পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়ার কৌশল। বলা বাহুল্য, এই ভঙ্গীটি লেখকের নিজস্ব। ফলে এই ধরণের সংবাদ ব্যক্তিগত রচনার আকার ধারণ করতে বাধ্য হয়। যে নৈর্ব্যক্তিক ভাষায় কতকগুলো জ্ঞাতব্য সংবাদ জানিয়ে দেওয়া যায় সেই ভাষায় একটা অভিজ্ঞতাকে লেখকের কাছ থেকে পাঠকের কাছে স্বাক্ষরিত করে দেওয়া যায় না। এই ব্যক্তিগত রচনার স্বাধীনতাই গত দশ বৎসরে বাংলা সংবাদপত্রে রক্ষণশীলতার গণ্ডী ভেঙেছে এবং শুধু চলতি ভাষার ব্যবহারই নয়, ভাষা নিয়ে পরীক্ষারও কতকটা সুযোগ করে দিয়েছে।

"রাঢ় দেশ! তাম্রদগ্ধ দিগন্ত। রোদেপোড়া মানুষের চেহারা। ছোট ছোট নদী, ঢেউখেলানো মাঠ। এর মধ্যে কি কল্পনা করা যায় হঠাৎ পূর্ববঙ্গের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে?"—এইভাবে যে একটি বন্যার রিপোর্ট আরম্ভ করা যায় একথা ১৫ বৎসর আগে কোন সংবাদপত্র পাঠক চিন্তাও করেন নি। কিন্তু এই ধরণের রিপোর্ট আজকাল সংবাদপত্রে হামেশাই প্রকাশিত হচ্ছে।

সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর রক্ষণশীলতার প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী। আজও এই স্তম্ভে চলতি ভাষার প্রবেশ ঘটে নি। কয়েক বৎসর আগে, আনন্দবাজার পত্রিকা ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের তৃতীয় সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি মধ্যে মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে চলতি ভাষায় লিখবেন। কিন্তু সেই পরীক্ষা চালানো হয় নি। তবে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের ভাষা দশ বৎসরে একেবারে অপরিবর্তিত থাকে নি। সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মধ্যে শব্দ নিয়ে খেলা করার ঝোঁক, অনুপ্রাস সৃষ্টির চেষ্টা, কাব্যগন্ধী অথবা রহস্যপূর্ণ শিরোণামা দেওয়ার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়ভাবে বেড়ে গেছে। কোন কোন পত্রিকার কোন কোন প্রবন্ধে আবার "যারা", "তারা", "যাদের", "তাদের" প্রভৃতি চলতি রূপের সর্বনাম পদগুলিকে সাধু রূপের ক্রিয়াপদের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই ভাষাবিপ্লবে কিছু কিছু কুফলও দেখা যাচ্ছে। সংবাদের মধ্যে তথ্যের অভাব কখনও কখনও ভঙ্গী দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা হয়। মনে আছে, পূজোর আগে ধনীর ঘরে বিলাসবাহুল্যের ছড়াছড়ি আর দরিদ্রের ঘরে নিরানন্দ—এই বিষয়ে "ষ্টাফ রিপোর্টার"—চিহ্নিত একটি অত্যন্ত করুণরসাত্মক বর্ণনা পড়েছিলাম। রচনা হিসাবে উৎকৃষ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই বিবরণের মধ্যে স্থানকাল পাত্রের এমন একটিও উল্লেখ ছিল না যার থেকে বোঝা যেতে পারে, এটা নিছক কাল্পনিক কাহিনী নয়, তথ্যভিত্তিক সংবাদ। যা একটা সুখপাঠ্য কাহিনীমাত্র তাকে সংবাদ বলে পরিবেশন করার এই ঝোঁক বাংলা সংবাদপত্রের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

এই ভাষাবিপ্লব প্রয়োগের ক্ষেত্রে কতকটা শৈথিল্য এনে দিয়েছে। গ্রাম্যতাদুষ্ট, অশালীন ও রুচিবিগর্হিত শব্দও কখনও কখনও ব্যবহৃত হচ্ছে। "ল্যাংমারা" শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত হতে দেখেছি। "গ্যাঁড়াকল" শব্দটি সংবাদের শিরোনামায় দেখেছি।

এইসব ত্রুটি সত্ত্বেও, অতীতের মত আজও বাংলা সংবাদপত্র নূতন নূতন দানে ভাষার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছে। গত দশ বৎসরে বাংলা সংবাদপত্রের কল্যাণে আমরা যেসব বিশেষার্থক শব্দ পেয়েছি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'মধুচক্র', 'আম দরবার', 'দমদম দাওয়াই'। [এই প্রবন্ধে সংবাদপত্র বলতে দৈনিক সংবাদপত্রই বোঝান হয়েছে।]

সাম্প্রতিক বাংলার লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতি-চর্চা

নির্মলেন্দু ভৌমিক

● এক ●

ইদানিং 'লোক' সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং শিল্প সম্পর্কে আমরা, কি পূর্ব কি পশ্চিম—দু' বাঙলাই খুব খানিকটা সচেতন হয়ে উঠেছি। ব্যাপারটি যে বেশ মনোরম, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। এবং তারই ফল হিসেবে দেখছি, লোক-সাহিত্য-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, আলোচনা-গবেষণাও চলছে। লোক-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও সংরক্ষণের জন্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলোতেও লোক-সাহিত্য বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু পাঠ্য-তালিকাতেই তা স্থান পায় নি কিংবা প্রকাশনার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে নি, গবেষণার ক্ষেত্রেও তা স্বীকৃতি পেয়েছে। 'আকাশবাণী' এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো একে দিন দিন জনপ্রিয় করে তুলছে। আজ লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্র-পত্রিকাও চালু হয়েছে।

এ উদ্যম একান্তভাবেই সাম্প্রতিক,—ঐতিহাসিক দিক থেকে বলা চলে, স্বাধীনতা-উত্তর কালে। তার আগে থেকেই যে ধারাটির পত্তন হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন মণীষী এবং সাধারণ লেখকদের হাতে, আমাদের জাতীয়তাবোধ সেই সাহিত্য-রুচিকেই যেন আজ পূর্ণতা দিতে চাইছে। কিন্তু, সেই সঙ্গে আজ এ কথাও ভাববার সময় এসেছে যে: আমাদের এই লোক-সংস্কৃতির চর্চা কোন্ পথ ধরে এগোচ্ছে, তার দোষ-গুণ-বিশেষত্ব কি এবং কোথায়, তাকে কি আরো উন্নত করা যায় এবং করতে হলে সে কেমন করে? একথাও অবশ্য মনে রাখব যে, যে উদ্যম আজ সাড়া আনল, একদিনেই তা একটি বিশিষ্ট ও সংহত মূর্তি ধরে পূর্ণতা পেতে পারে না।

আমাদের সাম্প্রতিক লোক-সাহিত্য-সংগ্রহ অনেকটাই আমাদের

সাহিত্য-প্রীতির সৌখীন দিক মাত্র। কিন্তু, সেই প্রীতি একটি বিশেষ দৃষ্টির আলোতে সংহত হয়ে, নিষ্ঠার আকারে ফুটে উঠতে পারে নি এখনও। আমাদের অনেক 'সংগ্রহ' এবং 'সমীক্ষা'-র মধ্যে আমরা তাই প্রত্যাশিত পরিমাণে 'বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি'র পরিচয় দিতে পারি নি। লোক-সাহিত্য ভালো লাগে, মনে দোলা আনে, সেই প্রীতি-সমুখ আনন্দের বশে বিচ্ছিন্নভাবে বা বিক্ষিপ্ত ভঙ্গীতে দু'চারটি গান বা গাথাকে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে আমাদের দায়িত্ব থেকে আমরা মুক্ত হই। তাতে নিষ্ঠার চেয়ে বিশেষ একটি সাহিত্য-বিলাসই বড়ো হয়ে ওঠে। অধিকাংশ সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ এবং সমীক্ষা এ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁদের সেই সাহিত্য-প্রীতি আরো একটু গভীর বা ব্যাপক, তাঁরা সাময়িক পত্রের পাতা থেকে তাঁদের 'লেখা'-কে একটি বইতে তুলে রাখছেন। এ আরো ভালো। কিন্তু, সাময়িক পত্রের পাতায় যে সংগ্রহ বা সমীক্ষার অপূর্ণতা সহনীয়, অবিকৃত ভাবে বইতেও তা স্থান পেলে লেখককে সমালোচনা সইতে হবে।

'বিক্ষিপ্ত' বা 'বিচ্ছিন্ন' ভাব বা ভঙ্গী অনেক লোক-সাহিত্য-সংগ্রহ বা আলোচনায় আজকাল দেখা যাবে। তার কারণ দুটি। প্রথমতঃ, একটি অঞ্চলকে বিভিন্ন দিক থেকে পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করবার জন্য যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দরকার, অনেকেরই তা নেই। দ্বিতীয়তঃ, একটি 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' বা দৃষ্টিকোণের অভাব। লোকসাহিত্য যে লোক-সমাজেরই প্রতিফলন, সমাজ ও সাহিত্যের এই যোগাযোগটুকু আবিষ্কারের বোধ-দৃষ্টির অভাব,—কাজেই নিষ্ঠারও অভাব।

অনেকেই বলেন, 'আমি শুধু সংগ্রহ করে যাচ্ছি। সমীক্ষার ভার গবেষকদের হাতে।' গবেষক বলেন, 'উপকরণ পেলে তবে তো গবেষণা। সেই উপকরণে ফাঁক এবং ফাঁকি দুইই আছে সমান ভাবে।' কাজেই, ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে যিনিই সংগ্রাহক তিনিই গবেষক। কিন্তু, সব সংগ্রাহকের যেমন সমীক্ষার প্রতিভা নেই তেমনি গবেষকেরাও বা কেমন করে একা একা সব সংগ্রহ করবেন।

সংগ্রাহক যিনি, দেখা যাক, তিনি সংগ্রহ করছেন কেমন করে। যে কোনো গানই সংগ্রহ করার দরকার কি না, এ বিষয়ে তিনি কতখানি

সচেতন ; একটি গানের বা প্রবাদ-ধাঁধা-ছড়ার সাহিত্যিক মূল্য এবং সামাজিক-ঐতিহাসিক মূল্যের মধ্যে তফাৎ বোঝার ক্ষমতা তাঁর আছে কি না ; গান বা কথাকে লিখে নেবার সময় বিকৃত করা হল কি না ; যে গান বা কথাকে নেওয়া হল, গায়ক-গায়িকা তার যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তাও সঙ্গে সঙ্গে টুকে নেওয়া হল কি না ; যাঁর কাছ থেকে তা সংগৃহীত হল—তাঁর নাম, বয়স, পুরো ঠিকানা লেখা হল কি না ; আনুষ্ঠানিক গান হলে, সেই অনুষ্ঠানের নিখুঁত এবং পর্যায়ধর্মী বিবৃতি গ্রথিত হল কি না ; সহযোগী বাদ্য-যন্ত্র এবং নৃত্যের বর্ণনা ও ছবি এবং পরিশেষে তার স্বরলিপি নেওয়া হল কি না,—এ বিষয়ে সংগ্রাহকের সচেতনতা থাকলে তবেই তাঁকে 'সংগ্রাহক' বলা চলবে।

বলা বাহুল্য, এমন করে গান-গাথা-ছড়া-ধাঁধা এখনো আমরা সংগ্রহ করতে শিখি নি। আজকের অনেক আলোচনা বা সংগ্রহকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতে যদি কোনো নৃতাত্ত্বিক বা সমাজতাত্ত্বিক একটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে চান, প্রথমতঃ তিনি আসতে পারবেন না ; দ্বিতীয়তঃ তাঁর ভুল হবে। আমাদের মধ্যে অনেক সংগ্রাহকই প্রত্যক্ষভাবে গ্রাম-জীবনের সঙ্গে জড়িত নই বা গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দে নই। অনেকেই হঠাৎ 'কোনো এক সুন্দর সকালে' সুযোগ-মাফিক গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম—এবং ঝটিকাবেগে খানকয়েক গান টুকে নিয়েই কলকাতায় ফিরে এলাম। পরের মাসে বা সপ্তাহে কোনো সাময়িক পত্রের পাতায় তা স্থান পেয়ে গেল এবং 'ফোকলোরিষ্ট্' বলে লেখকের নাম দৃঢ় হল।

আর সে আলোচনাও কি! অনেক লোক-সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা পড়েছি,—যেন উপন্যাস বা রোমাঞ্চকর কাহিনী। আলোচকের objectivity আদৌ নেই। তার জন্যে ভয় আর ভাবনা দুই-ই আছে। ভয় আলোচকের ক্ষমতার অভাবে। ভাবনা,—এই বুঝি কঠিন হয়ে যাওয়াতে পাঠক তাকে বর্জন করেন! এই সব লেখকদের সাধুবাদ দিই, তাঁরা অমন সুখপাঠ্য করে লিখছেন বলে। কিন্তু, যিনি সে আলোচনায় জ্ঞান অন্বেষণ করতে চাইবেন, তিনি হতাশ হবেন। তাঁর মনে হবে, অনেক প্রাসঙ্গিক এবং আবশ্যক তথ্য তাতে দেওয়া নেই কিংবা একটি গানের পুরোটা প্রকাশিত হয় নি। চারটি কি পাঁচটি গান সম্বল ক'রে যাঁরা এ ধরণের তথাকথিত 'লেখা' লিখতে বসেন, অগত্যা

ভুল, অসম্পূর্ণ অথবা কাল্পনিক তথ্যের ললিত ভাষায় পরিবেশন ছাড়া তা আর কী-ই-বা হবে। কাজেই সে পদার্থ না হল 'সংগ্রহ' না হল 'সমীক্ষা'।

আমরা বোশেখ মাসে রাঢ় বঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ভাদু-গান খুঁজি, কিংবা ফাল্গুন মাসে টুসু-গান। গানের সঙ্গে পরিবেশের খবর নিই নে। তার নাচের ছন্দ আর সুরের সঙ্গে কথার যোগ খোঁজা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করি। নাচের সঙ্গে বাজছে যে ঢোলটি, তার ঢোলটি ও তালটি আমরা ক'জনেই বা সংগ্রহ করেছি?

গান যদিও বা সংগৃহীত এবং প্রকাশিত হয়, স্বরলিপি কদাচ নয়। প্রথম কথা, সংগ্রাহকরা অনেকেই স্বরলিপি করতে জানেন না। যাঁরা স্বরলিপি করতে জানেন, তাঁরা সাময়িক-পত্রের কাছ থেকে উৎসাহ পান না। কেননা, ও বস্তু এক ঝামেলা বিশেষ। টেপ রেকর্ডারে গানের সুর কিংবা মুভি ক্যামেরায় নাচের ছন্দ তুলে নিয়ে আসা আমাদের দেশে একটি অকল্পনীয় ব্যাপার। সে সঙ্গতিও বোধ হয় অনেকেরই নেই। এই জন্যে বাঙলার লোকসঙ্গীত বা সাহিত্যের কথার দিকটি তবু খানিকটা পাই, কিন্তু সুর নিয়ে, গানের গ্রামারের দিক থেকে তার আলোচনা একটিও হয়েছে কিনা, সন্দেহ করি। আজ যদি কোনো ভদ্রলোক হঠাৎ মন্তব্য করেন: বাঙলার লোকসঙ্গীতে সুরের বৈচিত্র্য যত আছে, বিষয়ের বৈচিত্র্য তত নেই, কিংবা তার উল্টোটি,—তবে সে মন্তব্যটিকে সমর্থন অথবা খণ্ডন করবার মতো যথেষ্ট পুঁজি আমাদের হাতে নেই।

সংগ্রাহকের পর গায়কের কথা। অধিকাংশ সংগ্রাহক গায়কও বটেন। কিন্তু, এখানেও সকলের সমান পরিমাণ নিষ্ঠা আছে কিনা, সন্দেহ করা চলে। অনেক লোক-সঙ্গীত শিল্পীর মুখে শুনেছি, গানের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম্য-শব্দ বা একটি বিশেষ ধরণের সুরের টানকে কলকাতার মানুষের কানের ও মনের উপযোগী করে নিতে হয়, নইলে সে গানের সমাদর হয় না। রেকর্ডে, রেডিওতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গীত গানে এ ব্যাপারের সমর্থন লক্ষ্য করা যাবে। তার ওপর আর এক কাণ্ড। পাঁচটি লোকসঙ্গীত ভেঙে নিজের মত করে গান রচনা, এবং 'যার ধন তার নয়, নেপোয় মারে দই'-য়ের মত নিজেই রচয়িতা হয়ে বসা।

পূর্ব ও পশ্চিম—দু' বাঙলাতেই লোক-সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে

চেতনা এসেছে। তবে, পশ্চিমবঙ্গে সে চেতনার প্রকাশ প্রধানতঃ একক এবং ব্যক্তিগত, পূর্ববঙ্গে তা যেন সঙ্ঘবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠানগত। কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে যে 'ইণ্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে তার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। এবং সোসাইটির উদ্দেশ্যাবলীতে যে ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে তা অভিনন্দনযোগ্য। তাছাড়া ঢাকার 'বাঙলা একাডেমী' প্রকাশিত লোক-সাহিত্য সংরক্ষণ গ্রন্থমালা ও 'লোক-সাহিত্যে'-র পরিশিষ্টে লোক-সাহিত্য সংগ্রহের জন্য তাঁরা যে সমস্ত নিয়মাবলীর উল্লেখ করেছেন—তাতে একটি সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা এবং সে প্রচেষ্টার পেছনে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আভাস মেলে। ফোক-লাইব্রেরী, ফোক-মিউজিয়াম, ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। বহুদিন আগে পি. ও. বোডিং সাহেব সাঁওতালী ফোক-মেডিসিন সম্পর্কে তথ্যাদি জোগাড় করেছিলেন। বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলের 'টোট্‌কা' চিকিৎসা (এবং এ প্রসঙ্গে ঝাড়-ফুক-মন্ত্র) সম্পর্কেও এখন পর্যন্ত তেমন কোনো আলোচনা হয় নি। ফোক-আর্ট এবং ফোক-ড্যান্স সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা হলেও ব্যাপকতর আলোচনার প্রয়োজন আছে। লোক-ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনাও বিস্তৃতির দাবী রাখে।

● দুই ●

গত কয়েক বৎসরে বাঙলা লোক-সাহিত্য সম্পর্কিত যে সমস্ত আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো থেকে আমরা লোক-সাহিত্যের স্বরূপ এবং সংজ্ঞাটিকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করব। ডাক্তার শ্রী সুকুমার সেন মশাই তাঁর 'বিচিত্র-সাহিত্য' (১৩৬৩) বইটিতে লিখেছেন, "সেই রচনাকে বলব লোকসাহিত্যের অন্তর্গত যার জন্যে বিদ্যার বা শিক্ষার প্রস্তুতি আবশ্যক নেই—না বক্তার পক্ষে, না শ্রোতার তরফে। লোক-সাহিত্য আসলে অপৌরুষেয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষের রচনা বলে কোনো ছাপ মারা নেই এতে। এ সাহিত্যের সৃষ্টি কলমের ডগায় নয়, জিবের আগায়।"—পৃঃ ১৯২। ডাক্তার সেনের এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই তিনটি

প্রসঙ্গ : (ক) বক্তা-শ্রোতার শিক্ষা-বিদ্যা (খ) বক্তা-রচয়িতার ব্যক্তি বিশেষ হীনতা (গ) মৌখিকতা।

ডাক্তার শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই তাঁর 'বাঙলার লোক-সাহিত্য' (প্রথম সং ১৯৫৪ ; দ্বিতীয় সং ১৯৫৭) বইটিতে পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন সমালোচকদের মতামত আলোচনা করেছেন। তিনি তাঁর আলোচনায় সমাজ-বিজ্ঞানের দিকটির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, লোক-সাহিত্য "সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নহে।" লোক-সাহিত্য যে ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নয়, একথা সকল দেশের সকল সমালোচকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। লোক-সাহিত্যের মৌখিকতার দিকটি ডাঃ ভট্টাচার্যের আলোচনায় বিস্তৃত হয়েছে। লোকসাহিত্য লিখিত হলে বা না হলে তার সুবিধে-অসুবিধের কথা তিনি পাশ্চাত্য সমালোচকদের অনুসরণে লক্ষ্য করেছেন।

মৌখিকতা, ব্যক্তিবিশেষহীনতা এবং শিক্ষা-বিদ্যা—এই তিনটি প্রসঙ্গ সম্পর্কেই আবার কয়েকটি জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথমে মৌখিকতা। একথা সত্যি, লিখলেই লোক-সাহিত্যের সুর, স্বর, ভাষা, ভঙ্গীর অনেকটা খোয়া যায় এবং তারই ফলে সাবেকী জিনিস বিকৃত এবং আধুনিক হয়ে পড়ে। কিন্তু, সেই বিকৃতির সম্ভাবনা মৌখিকতার মধ্যেও রয়েছে, উপরন্তু রয়েছে বিস্মৃতির সম্ভাবনা। অবশ্য, যদি সতর্ক গবেষক লিখে বা রেকর্ড করে নেন কিংবা লোক-সাহিত্য-শিল্পী নিজেই লেখেন, তবে ভ্রান্তি বা বিকৃতির সম্ভাবনা খানিকটা রোধ করা যায়। কিন্তু, আমার প্রশ্ন ভিন্ন। আমার প্রশ্ন হল : কোনো লোক-সাহিত্য-শিল্পী (অর্থাৎ রচয়িতা) যদি ভাগ্যক্রমে বা দুর্ভাগ্যক্রমে লেখা-পড়া জেনে ফেলেন, এবং সেই মানুষটি যদি কাগজে লিখেই কোনো গান বা গাথা রচনা করেন, তবে তার মৌখিকতা যখন থাকল না, অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা লোক-সাহিত্যের শ্রেণী থেকেও খারিজ হয়ে গেল কি না। আমি একাধিক লোক-সঙ্গীত রচয়িতাকে জানি,—যাঁরা সামান্য লেখা-পড়া জানেন ; এবং হয় তাঁরা লিখে-লিখেই গান রচনা করেন, নয়ত রচনার পর খাতায় লিখে রাখেন। অথচ, তাই বলে লোকসঙ্গীত হিসেবে তা যে অসার্থক বা কৃত্রিম তা মনে হয় না,—ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে। অতএব, মনে হয়,

মৌখিক বা মৌখিক রূপটির কথা বোধ হয় আপেক্ষিক। আসলে, লোক-সাহিত্য পাঠ্য নয়, শ্রাব্য। দ্বিতীয়তঃ লোকসঙ্গীতের রচয়িতা, গায়ক ও শ্রোতার বেশীর ভাগই নিরক্ষর বলে মৌখিকতার প্রশ্ন আরো বেশী করে ওঠে। পণ্ডিতেরা বিচার করে দেখবেন, ভাবে-ভঙ্গীতে এবং ভাষায় লোকসাহিত্যের স্বাভাবিক বিশেষত্বগুলো যদি বজায় থাকে তবে লিখিত হলেও তাকে লোকসাহিত্য বলা চলবে কি না?

তারপর ব্যক্তি-বিশেষিকতার প্রশ্ন। লোক-সাহিত্য 'অপৌরুষেয়', অথবা কোনো বিশেষ ব্যক্তি তার রচয়িতা নন, একথা যখন বলা হয়, তখন নিশ্চয় আমরা তাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করি নে। একজন কোনো রচয়িতাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে, নইলে লোক-সাহিত্য তো আর 'আকাশ-সম্ভব' নয়। কেউ কেউ আবার বলে থাকেন, গান করতে করতে বহু জনের মিলিত-প্রচেষ্টায়, এক এক জনের রচিত এক্ একটি কলি নিয়ে লোক-সঙ্গীত সৃষ্টি হয়। এ অনুমান নিশ্চয়ই স্বীকার্য। কিন্তু এমন মিলিত প্রচেষ্টাতে ক'টি লোক-সঙ্গীত রচিত হওয়া সম্ভব? তা ছাড়া, এমন করে খুচরো গান যদিওবা রচিত হওয়া সম্ভব, 'গাথা' রচিত হওয়া সম্ভব নয়। অনেকে বলেন, লোক-সাহিত্য কবে রচিত হয়েছে কেউ জানে না, সমাজে আবহমানকাল থেকে তা চলিত— অতএব ব্যক্তি বিশেষের অনুপস্থিতির অর্থ এটাই। কিন্তু, তবে কি আধুনিক জীবন ও ঘটনা নিয়ে রচিত হচ্ছে যে সমস্ত পল্লীগীতি, তা লোক-সাহিত্য নয়? প্রাচীনতাই কি তা হলে লোকসাহিত্যের একটি বিশেষত্ব হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? তারপর বাউল, ভাটিয়ালী গানের কথা। বাউল-ভাটিয়ালী গানকে লোক-সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত যদিও করা হয়েছে, তবু তাতে আমরা 'ভণিতা' পাই। 'ভণিতা' তো ব্যক্তি বিশেষিকতার ইঙ্গিত। তা হলেই বলতে হয়, লোক-সাহিত্যে ব্যক্তি বিশেষের যত নাম থাকুক বা না থাকুক, আসলে তাতে ব্যক্তি-মন নেই। স্বভাবতঃই একে বিরোধী ভাবমূলক বলে মনে হবে। আসলে লোক-সাহিত্যিককে সমস্ত সমাজ-মন ও মনস্তত্ত্বকে আয়ত্ত করে, স্বাঙ্গীকৃত করে নিয়ে এমন একটা সর্বজনীন রূপ ও রীতিতে ফোটাতে হবে যে, তা একান্ত ভাবেই তাঁর কিছু নয়, যেন সমাজের অন্য একজন লিখলেও তা ঠিক এমনটাই হত এবং তা ছাড়া অন্য কিছু হত না বা হতে পারত না। তিনি ব্যক্তি-

অনুভূতির উৎসটিকে সমাজের দেহে এমন ভাবে প্রসারিত করে দেন যার ফলে তা গোটা সমাজেরই অনুভূতি হয়ে দাঁড়ায়। এই অর্থে, সমাজই লোক সাহিত্যের রচয়িতা।

লক্ষ্য করুন, তা হলে চাই (ক) ব্যক্তি অনুভূতিকে সমাজদেহে প্রসারিত করা (খ) সমাজ ও ব্যক্তির অনুভূতি এক ও অভিন্ন হওয়া (গ) অতএব তা প্রকাশের রূপ-রীতি ঢংও অভিন্ন হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ একটি 'সর্বজনীন রূপ ও রীতি'র কথা এখানে বড়ো হয়ে উঠছে। কী সেই সর্বজনীন রূপ ও রীতি? কী সেই ঢং, যার ফলে একজন লিখলেও যা হবে, অপর একজন লিখলেও তাই হবে?—আমি এই প্রশ্ন করছি। উত্তরে যদি বলি, লোক-সহিত্যের সংজ্ঞাটিই সেই ঢঙের মধ্যে লুকিয়ে আছে, তবে তা কতখানি ভুল হবে?

আমার সম্পাদনায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'এক মাসের মধ্যেই একটি বই বেরুচ্ছে। বইটির নাম "শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীত"। আমি সেই বইয়ের দ্বাদশ অধ্যায়ে লোক-সাহিত্যের সেই সর্বজনীন রূপ ও রীতির দিকগুলোকে লক্ষ্য করেছি। আমার মনে হয়, (ক) ধুয়া ও 'পুনরাবৃত্তি' (এই পুনরাবৃত্তি অনেক রকমের—একই গানের বিভিন্ন অংশে; পঙ্‌ক্তিতে; সমভাবার্থক পুনরাবৃত্তি, বিপরীতার্থক পুনরাবৃত্তি, সংখ্যাবাচক পুনরাবৃত্তি) (খ) অর্থহীন পদ, পদসমষ্টি বা বাক্যাংশ দিয়ে পঙ্‌ক্তির পাদপূরণ (গ) বাক্যগঠনে বিশেষত্ব (ঘ) উক্তি-প্রত্যুক্তি (সর্বত্র নয়) (ঙ) সাদৃশ্য ও সাঙ্কেতিকতা (চ) বিশিষ্ট উপমা-অলঙ্কারের ব্যবহার (ছ) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধ্বনিপ্রধান, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার—এই সব মিশিয়েই সেই সর্বজনীন রূপ ও রীতি অর্থাৎ ঢঙটি ফুটে ওঠে। অতএব, আমার বক্তব্য হল, লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয়-কালে লোক সাহিত্যের ঢঙটিও লক্ষ্য করতে হবে, যা আমার দু'জন পূজনীয় অধ্যাপকের আলোচনায় ধরা পড়ে নি।

লোক-সাহিত্যের এই সর্বজনীন রীতি বা ঢঙটি শুধু বাঙলাদেশের লোক সঙ্গীতে বা সাহিত্যেই দেখা যাবে না অন্যান্য দেশের লোক-সাহিত্য-সঙ্গীতের মধ্যেও তা দেখা যাবে। এ ঢঙ বা রীতি বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন ভাষার লোক-সাহিত্যিকরা পরামর্শ করে স্থির করেন নি; আসলে এ রীতি শিক্ষাই করতে হয় না; লোক-মানসের সঙ্গেই তা

একাত্মক। ফলে, সকল দেশেই তা প্রায় এক। এই জন্তে আমি প্রস্তাব করি, লোক-সাহিত্যের সংজ্ঞার মধ্যে তার সর্বজনীন রীতিটিকেই প্রধান বলে মানা হোক।

লোক-সাহিত্যের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার প্রসঙ্গে বাঙলা দেশের বাউল ভাটিয়ালী গানের কথা এবারে উল্লেখ করি। সকলেই জানেন; বাউল-গান তত্ত্বমূলক এবং সে তত্ত্ব যৌন-যোগাচার ভিত্তিক। আবার কথার দিক থেকে অনেক সময় বাউল-ভাটিয়ালে কোনো তফাৎ নেই। বাউল গান নিয়ে অনেক আলোচনা এবং গবেষণা হয়ে গেছে। কাজেই, বাউল গানের তত্ত্বের মর্মোদ্ধার করতে এক এক সময় বেশ বেগ পেতে হয়। তবে কি তা লোক-সাহিত্য নয়? তত্ত্ব-প্রাধান্য থাকলেও আসলে সুরের বিশেষত্বই একে লোক-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছে। তা ছাড়া, সাধারণ মানুষের সম্মুখে গূঢ়-তত্ত্বমূলক গানগুলো গাওয়াই হয় না। গাইলেও সাধারণ মানুষ সব কথারই অর্থ জানার জন্তে উৎসুক হয়ে ওঠে না। সুরটাই তাদের কাছে বড়ো।

লোক-সাহিত্যের শাখা-বিভাগ কেমন করা যাবে? ডাক্তার শ্রীসুকুমার সেন মশাই তাঁর 'বিচিত্র সাহিত্যে' (১৩৬৩) জানিয়েছেন: "আলোচনার সুবিধার জন্তে দুভাবে লোক-সাহিত্যের শাখা বিভাগ করা যায়। এক, বিষয় হিসেবে: আন্তঃপুরিক, আনুষ্ঠানিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক; দুই, রূপ অনুসারে: ছড়া, কথা ও গান।" ডাক্তার সেনের বিভাগ দেখে মনে হয়, ধাঁধা ও প্রবাদকে তিনি ছড়া-কথার দলে ফেলেছেন। আবার, একই গান একই সঙ্গে অন্তঃপুরের বিষয়কে অবলম্বন করে আধ্যাত্মিক ভাবকে ফোটাতে পারে। ডাক্তার শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই তাঁর 'বাঙলার লোক-সাহিত্য' বইতে লোক-সাহিত্যের পাঁচটি শাখার উল্লেখ করেছেন: ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, কথা ও গীতি। কিন্তু, লোক-নাট্য বা ফোক্‌-ড্রামার কথা বলা হয় নি। শ্রীশঙ্কর সেনগুপ্ত তাঁর Folklorists of Bengal (Vol. 1, 1964) গ্রন্থের ভূমিকায় বাংলার লোক-সাহিত্যকে ৯ ভাগে বিভক্ত করেছেন: (১) কথা (২) ছড়া (৩) ধাঁধা (৪) সঙ্গীত ও নৃত্য (৫) প্রবাদ-প্রবচন (৬) বিশ্বাস-অনুষ্ঠান (৭) লোক নাটক-যাত্রা (৮) পোষাক বাস্ত-গহনা ও অন্তান্ত নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং (৯) আচার ব্যবহার।

● তিন ●

ছড়া-কে শুধু লোক-সাহিত্যেরই আদিম শাখা বলা হয় নি,—সাহিত্য মাত্রেরই আদিম শাখা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ রসবোধের অসীম অনুগ্রহে আজ ছড়ার বিভিন্ন দিকগুলো আমাদের আর অজানা নেই। একাত্তর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ছেলে-ভুলানো ছড়ার সম্বন্ধে যে রবিকোচিত আলোচনা করে গেছেন, আজ পর্যন্ত তাতে আর কোনো প্রসঙ্গ যুক্ত হতে পারে নি। তারপর, যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া'-র ভূমিকায় (৮ই আষাঢ় ১৩০৬) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাই। তারপর থেকে ছড়া বাঙলা সাময়িক পত্রের পাতায় বহু আলোচিত, সংগৃহীত এবং প্রশংসিত একটি বিষয় হয়ে আসছে।

সাম্প্রতিক ছড়া সংগ্রহ ও আলোচনাগুলোর প্রায় সব কটিই উল্লেখের দাবী রাখে। ডাক্তার শ্রীসুকুমার সেন একটি ছোট নিবন্ধে ছেলে-ভুলানো ছড়ার বিভিন্ন দিককে তুলে ধরেছেন রসিকের মতো। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব লিখেছেন 'ছড়া ও প্রবচনে পূর্ববঙ্গ'। ডাক্তার শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাঙলার লোক-সাহিত্যে'র দ্বিতীয় খণ্ডটি ছড়া বিষয়ক। আটটি অধ্যায়ে তিনি ছড়ার পরিচয় পূর্ণ করেছেন। অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত পরিচ্ছেদগুলোর নাম-চয়নে তিনি রসিকজনের পরিচয় রেখেছেন। 'সাহিত্যিক ছড়া'র আলোচনা তাঁর বইতেই প্রথম দেখা গেল। যে সব জায়গা থেকে ছড়াগুলো সংগৃহীত হয়েছে, তিনি তার নামও দিয়েছেন। তবে, ছড়ার রচনাভঙ্গী, ষ্টাইল, চিত্র এবং উপমা সম্পর্কে আরো কিছু যেন প্রত্যাশিত ছিল। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীর 'ছেলেভুলানো ছড়া'র কথাও উল্লেখ করি।

পূর্বপাকিস্তানও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। 'বাঙলা একাডেমী' থেকে বের হয়েছে মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর সম্পাদনায় 'লোক সাহিত্যে ছড়া' (বৈশাখ ১৩৬৯)। ছেলেভুলানো ছড়া, খেলাধুলা—আমোদ-প্রমোদের ছড়া এবং বিবিধ ছড়া সম্পর্কে তিনি আলোচনা ও সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনিও স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন, তবে বিভিন্ন ছড়ার 'কথান্তর' দেন নি।

ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে মা ছেলের কর্মজগৎ ও ভাবজগৎ এক সুতোয় বাঁধা পড়েছে। আমার কেন যেন মনে হয়, ছেলেভুলানো ছড়া যেন মায়েরই এক ধরনের কর্ম সঙ্গীত। মা-ই যেন তাঁর ক্লান্তিকে ভুলতে চান। আঙুল দুলিয়ে দুলিয়ে একই ছড়ার বারংবার আবৃত্তিতে যেন লোক-সমাজের প্রশান্তি ও রক্ষণশীলতার ছবি। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী তাঁর বইয়ের ১৪ এবং ৩৪ পৃষ্ঠায় যে সমস্ত ছড়াগুলো উদ্ধৃত করেছেন—সেগুলো পড়ে আমার তা মনে হয়েছে। ৮০ পাতায় কুকুর-শকুনির খেলায় যে পুনরাবৃত্তির ছড়া পাই, তাও লোক-মানসেরই রক্ষণশীলতা। ৯৩ পাতায় মাছ-ধরার ছড়া পড়ে প্রান্ত-উত্তর বাঙলার কয়েকটি অপ্রকাশিত ছড়াকে মনে পড়ল। ১৬৮ পাতায় কলার 'ছড়া'য় বাদুড় দেখে ছেলে-মেয়েরা যে ছড়া বলে,

বাদুর বাদুর চৈতা।
মামু কইছে খাইতা॥
তিলের সিন্নি খাইতা।
তিল লাগে তিতা।
তুমি আমার মিতা॥ —পৃঃ ১৬৬

তার একটি 'কথান্তর' জানি—

বাদুর বাদুর মিতা।
যা খাবি তা তিতা॥

ওপরে আমি 'কথান্তর' কথাটি 'পাঠান্তর'-এর বদলে ব্যবহার করেছি। অনেকেই এবং মোহাম্মদ কাসিমপুরীকেও দেখলাম 'পাঠান্তর' ব্যবহার করেছেন। যে 'পাঠ' বা রূপ আগে ধৃত আছে, অর্থাৎ একদা যা লিখিত হয়েছে, তারই পরিবর্তনকে 'পাঠান্তর' বলা চলে। কিন্তু, যা কোনো দিন লেখায় ধরা পড়ে নি, তার 'পাঠান্তর' হয় কি করে? এর চেয়ে যদি 'কথান্তর' শব্দটিকে লোকসাহিত্যের আলোচনায় চালু করা যায়, তবে তা অধিকতর উপযোগী বলে মনে হয়। লোকসাহিত্যের আলোচকেরা কথাটি ভেবে দেখবেন।

সব শেষে উল্লেখ করি অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর লেখা 'সিলেটি ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (প্রথম সং শ্রাবণ ১৩৬৮) বইটির কথা। এটিও ঢাকার বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত। এই বইটির মধ্যে প্রাসঙ্গিক ভাবে কিছু সিলেটি ছড়ার সংগ্রহ আছে।

ধাঁধা সম্পর্কে আলোচনা এই তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। সাময়িক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে একক বা সমবেত ভাবে ধাঁধার সংগ্রহ এখনও প্রকাশিত হয় নি। ডাক্তার শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই তাঁর 'বাঙলার লোক-সাহিত্য' বইতে এর ভূমিকা করে রেখেছেন এবং কিছু সংগ্রহ ও সমীক্ষা তাতে আছে। তাঁর বইয়ের পঞ্চম খণ্ডে ধাঁধার সংগ্রহ থাকবে। ধাঁধারও ছড়ার মতো পরিবর্তন হয়েছে। লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা এই ধাঁধা আজ সাহিত্যিক বেশ নিয়েছে মার্জিত সমাজের শিশু-সাহিত্যের মধ্যে—শিশুদের সাময়িক পত্রে। ভবিষ্যতের ধাঁধা-গবেষক নিশ্চয়ই ধাঁধার এই পরিবর্তনকে লক্ষ্য করবেন তাঁদের আলোচনায়।

ধাঁধার আলোচনাতেও কয়েকটি বিশেষ দিক লক্ষ্য করা দরকার। ধাঁধার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো যেটি—সেটি হল 'বিস্ময়বোধ'। প্রশ্নকর্তার নিজের বিস্ময়বোধই প্রশ্নের আকারে রূপ পায়। সেই বিস্ময়বোধের মধ্যে একটি সুন্দর রসের বোধও আছে। সেই রসবোধের প্রকাশ ধাঁধার রচনাভঙ্গীতে: তার ছন্দে, চিত্রে, অন্ধকার ধ্বনি ও সহচর শব্দে। পুরুষ ও মহিলার রচা ধাঁধার বিষয়ের ও পরিবেশের তফাৎ আছে। ধাঁধায় কাল্পনিক মানুষের নামোল্লেখ পাই। তেমনি আছে কাল্পনিক এবং সুখময় স্থানের নাম। ধাঁধার জগৎ বাস্তব জগৎ হয়েও তা অরূপ জগৎ। এখন পর্যন্ত ধাঁধা নিয়ে বিশেষ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয় নি।

বাঙলা প্রবাদ সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য সংগ্রহ ও আলোচনা হল—ডাক্তার শ্রীসুশীল কুমার দে-সম্পাদিত 'বাঙলা প্রবাদ' (প্রথম সং আশ্বিন ১৩৫২; দ্বিতীয় সং ভাদ্র ১৩৫৯)। এতে মোট ৯১০০টি প্রবাদ সঙ্কলিত হয়েছে। এই বইয়ের আগে পূর্ববর্তী সংগ্রহগুলোর (ইংরিজী ও বাঙলা) উল্লেখ করা হয়েছে পরিশিষ্টে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সঙ্কলিত প্রবাদ-বইয়ের তালিকা এতে আছে। তা ছাড়া, বাঙলা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবাদ-সম্পর্কিত আলোচনার পঞ্জীও সঙ্কলিত হয়েছে। এই সব কারণে, ভবিষ্যতের গবেষকরা নতুনতর এবং তুলনাত্মক আলোচনার সুযোগ পাবেন।

লেখক জানিয়েছেন, "আমাদের উদ্দেশ্য প্রবাদের বিস্তৃত অভিধান রচনা নয়, প্রধানতঃ সুপরীক্ষিত, নির্ভরযোগ্য ও যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ সংগ্রহমাত্র সম্পাদন করা,—যাহা এ পর্যন্ত কোনও মনীষীর মনোযোগ

আকর্ষণ করে নাই।"[৮] তিনি প্রবাদ ও ছড়ার সম্পর্ক-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন: "অধিকাংশ বাঙলা প্রবাদ ছড়ার আকারে প্রচলিত, কিন্তু ছড়া বলিতে এখানে ছেলে-ভুলানো ছড়া অথবা পল্লীগীতির ছড়া বুঝায় না, তাহা বলা বাহুল্য।" তিনি প্রবাদের সংজ্ঞা, উৎপত্তি এবং প্রকৃতি নিরূপণ করেছেন, প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত লিখিত সাহিত্যে তার প্রবেশের ধারা অন্বেষণ করেছেন, বাঙালীর জাতীয়, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের প্রেক্ষাপটে তার বিচার করেছেন। সবশেষে, সর্বপ্রথম বাঙলা প্রবাদ-পুস্তক উইলিয়ম মর্টন-কর্তৃক সংগৃহীত 'দৃষ্টান্ত-বাক্য সংগ্রহ' (১৮৩২ ?) থেকে শুরু করে নিতান্ত আধুনিক কাল পর্যন্ত সংগ্রহ ধরার ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন। এতে আগে সংগ্রহ কি পরিমাণ হয়েছিল তার পটভূমিকায় বর্তমান বইটির মূল্য নিরূপণ সহজ হবে।

প্রবাদের রচনাভঙ্গী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "প্রায় অনেক বাঙলা প্রবাদেই স্বতঃস্ফূর্ত কৌতুক বা ঝাঁঝালো রসিকতার আমেজ আছে, কিন্তু সকল প্রবাদই যে রঙদার হইবে এমন নয়, এবং অনুপ্রাস মিল প্রভৃতি ইহাকে লোকপ্রিয় করিলেও এগুলি প্রবাদের অপরিহার্য অঙ্গ নয়।" প্রবাদের অন্তর্লীন কৌতুক ও রসিকতাকে ডাক্তার দে তাঁর আলোচনায় সরস মন্তব্যে স্পষ্ট করেছেন। কিন্তু, অনুপ্রাস-মিলের দিকটি প্রবাদের পরিহার্য কি অপরিহার্য দিক, সে সম্পর্কে অনেকের মনে খট্‌কা লাগতে পারে। প্রবাদ দৈনিক ও সামাজিক প্রয়োজন-বোধেই কথিত হয়ে থাকে। কখন হঠাৎ কোন্ প্রবাদের প্রয়োজন হবে কেউ তা বলতে পারেন না। বিশেষ একটি মনোবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষ না হলে হর-হামেশা কেউ প্রবাদও আওড়ান না। এসব ক্ষেত্রে সেই বিশেষ মনোবৃত্তির পোষক প্রবাদের মধ্যেও রসের উপাদান চাই, মনে রাখবার জন্যেও তেমনি অনুপ্রাস-মিলকে অবহেলা করলে চলবে না। গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধের প্রসঙ্গে এই কথা আরো বেশী খাটে। তা ছাড়া, যে সমস্ত প্রবাদ কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিকের হাতে তৈরী (যেমন ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত), সে সমস্ত সাহিত্যিক-প্রবাদ যে অনেকটাই মিল-অনুপ্রাস বা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমার মনে হয়, প্রবাদের এই সাহিত্যিক দিকটি অধিকতর আলোচিত হলে ভালো হয়।

প্রবাদের ভাষা থেকে ভাবাভবের কিছু কিছু ইঙ্গিত মেলে। বাঙলার

প্রবাদের অধিকাংশই আজ আশ্রয় নিয়েছে বৃদ্ধা মহিলাদের কণ্ঠে। মহিলারা রক্ষণশীল। কাজেই তাঁদের কণ্ঠে আশ্রিত প্রবাদগুলো থেকে ভাষার প্রাচীনতর রূপ সন্ধান অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ডাক্তার শ্রীসুকুমার সেন মশাই তাঁর লেখা দুটি প্রবন্ধে: 'বাঙ্গালায় নারীর ভাষা' (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৩; বর্তমানে 'বিচিত্র সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)। অপরটি Women's Dilect in Bengali' (Journal of the Department of Letters, ১৮শ খণ্ড, ১৯২৮)। ডাক্তার দে এই সুন্দর দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে, কিন্তু নিজের আলোচনায় তা প্রয়োগ করেন নি। ভবিষ্যতে প্রবাদের সাহিত্যিক বিচার, আলঙ্কারিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা যুক্ত হলে সকলেই তাতে আনন্দিত হবেন।

প্রবাদ সম্পর্কে অপর উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন ডাক্তার শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই, তাঁর 'লোক-সাহিত্য' (তৃতীয় সংস্করণ) বইটিতে। তিনি মোটামুটি ডাক্তার দের অনুসরণে আলোচনা করলেও কয়েকটি দিকের উপর আলো ফেলেছেন। তিনি দার্শনিক সত্য ও প্রবাদের সত্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন; ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে প্রবাদের ভাগ করা যায় কিনা, পাশ্চাত্য লেখকদের অনুসরণে তা জানিয়েছেন; ভারতচন্দ্রের কতকগুলো পদ প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে,—না ভারতচন্দ্রই কতকগুলো লৌকিক প্রবাদকে একটি সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন, সে সংশয়ের উল্লেখ করেছেন; সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাদের গঠন ও রচনাভঙ্গীকে বিচারের প্রয়াস দেখিয়েছেন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের 'ছড়া ও প্রবচনে পূর্ববঙ্গ', অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর (ঢাকার বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত) 'সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'র প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখযোগ্য। বাঙলা একাডেমী থেকেই প্রকাশিত 'লোক সাহিত্য', (দ্বিতীয়) (১৩৭০), বইটির প্রবাদের পরিচ্ছেদে কুমিল্লা থেকে সংগৃহীত ১৫৭টি প্রবাদের বর্ণানুক্রমিক সঙ্কলন আছে। এই প্রবাদগুলো পূর্বে সংগৃহীত হয়েছিল কিনা, জানানো হয় নি; আমাদেরও মিলিয়ে দেখার সময় হয় নি। এই সংগ্রহের সঙ্গে প্রবাদ সম্পর্কিত কোনো আলোচনাই নেই।

● চার ●

বাঙলা দেশের ছড়া ও প্রবাদের গবেষণামূলক আলোচনা ও সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু 'গীতি' ও 'কথা'র আলোচনা-গবেষণা-সঙ্কলন তেমন হয় নি। একটি-দুটি সংগ্রহ ছাড়া বাকী সবই আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত, গবেষকের দৃষ্টির প্রতিফলন বা নিষ্ঠার ইঙ্গিত তাতে আদৌ নেই। এর কারণ বোধহয়, এই গানের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সুরের প্রসঙ্গ এসে যায়; যে সমস্ত গুণীরা ছড়া-প্রবাদের আলোচনা করেছেন, তাঁরা অনেকেই হয়ত সুরজ্ঞ নন,—কাজেই এ আলোচনায় তাঁরা হাত দেন নি। তা ছাড়া এমনিতেই দেখা যায়, সাধারণ আলোচনা-গুলো যত্তো না গবেষণাত্মক তার চেয়ে বেশী বিবৃতিমূলক।

গীতি-আলোচনার ধারা কোন খাত বেয়ে চলা উচিত? এবং এখন পর্যন্ত যে আলোচনার ধারাটি পেয়েছি তার রূপের স্বরূপটাই বা কেমন তর? আমার মনে হয়, ডাক্তার ভেরিয়র এল্‌উইন তাঁর "ফোক সংস্ অব ছত্তিশগড়" বইটিতে যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তা খুবই বিজ্ঞান সম্মত এবং রসিকোচিত। তিনি একটি মানুষের জীবনকে 'আদর্শ' ধরেছেন, তারপর সেই জীবনের ক্রম অনুসরণ করে গানগুলোকে সাজিয়েছেন। এতে সকলের আগে ঘুমপাড়ানী গান এবং সবশেষে শোক-গীতি স্থান পায়। আবার, কতকগুলো আনুষ্ঠানিক গান আছে, যা বৎসরের একটি বিশেষ তিথিতে বা উৎসবে গাওয়া হয়। এগুলোর 'আদর্শ' হল একটি বৎসর। বৎসর, মাস ও তিথি অনুযায়ী তা সাজানো চলে। এই দুটি আদর্শ ধরেও যে সব গান বাকী থেকে যাবে, সেগুলোকে আলাদা করে সাজানো যায়।

বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টিতে বিন্যস্ত বাংলা লোক-সঙ্গীত সঙ্কলন একটিও আমাদের নজরে পড়ে নি। নিম্নে আমরা কয়েকটি বই নিয়ে এবার আলোচনা করছি। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' (১৩৬০) গবেষণাগ্রন্থ নয়, পূর্ণাঙ্গ একটি সংগ্রহও নয়। অবশ্য সে দাবী তিনিও করেন নি। তিনি লিখেছেন, "......আমরা ভূমিকাতেই বলে নিয়েছি, আমাদের গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য পূর্ব বাঙলায় গ্রামে গ্রামে

সারা বছর ধরে যে সব গীতি বা গানের প্রচলন দেখা যায়, তারই কিছু সঙ্কলন করা। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমরা সেই গীতি বা গাথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না।" (পৃঃ ৫৩)। কিংবা "আমরা আগাগোড়াই জটিলতার পথ ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছি।" (পৃঃ ৯১)। এই মন্তব্যগুলো থেকেই সংগ্রাহকের আলোচনার রীতিকে বুঝতে পারা যাবে।

কিন্তু, সংগ্রাহক যখন "জটিলতার পথ ইচ্ছে করেই এড়িয়ে" গেছেন, আমরা তখন চাইব, সংগ্রহের দিকটিই (অর্থাৎ বিবৃতির দিকটিই) তিনি পূর্ণ করে দিন। তিনি যখন বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতে চাইছেন না, তখন সঙ্কলনের মধ্যেই পূর্ণতা আনুন। দুদিকই অপূর্ণ থাকলে বই প্রকাশনার সার্থকতা সম্বন্ধে মনে সন্দেহ আসে। তাঁর বইটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: প্রথম খণ্ড—'বারমেসে'। দ্বিতীয় খণ্ড—'সাময়িক'। তৃতীয় খণ্ড—'অকস্মাৎ'। 'বারমেসে' খণ্ডে নীল-পূজোর গান ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে বিবরণ আছে, সে গান শিবকে কেন্দ্র করে রচা। কিন্তু শেষে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক গানও গীত হয়। শিবের প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবতারণা কেন হল তার উত্তর লেখকের কাছে চাইব না, কারণ জটিলতার পথ তিনি পরিহার করেছেন। কিন্তু, তাই যদি লেখকের উদ্দেশ্য হয়, তবে 'ক্ষেত্রব্রত'-র গানটুকুই কেবল শোনালেন কেন, 'কথা'টুকু বাদ দিয়ে? না কি কেবল 'গান' সঙ্কলনই তাঁর উদ্দেশ্য? মাঘমণ্ডলের ব্রতটির বর্ণনা নেই। কেশবতী রাজকন্যার গল্পটি (পৃঃ ১১১) পূর্ববঙ্গীয় উপভাষাতেই কথিত হওয়া দরকার ছিল। বিষয়ের বিন্যাস-রীতিও সুচারু নয়। বেদে-বেদেনীর গানকেও কেন 'বারমেসে'র দলে ফেলা হল, বুঝলাম না। বারমেসের পর 'সাময়িকী'র খণ্ড ধাঁধা লাগায়। আবার 'অকস্মাৎ'-এর পর্যায়ভুক্ত গানগুলো বারমেসেও সাময়িকী প্রসঙ্গেই অনেক সময় গীত হয়। 'রয়ানী'-র গান হিসেবে মনসা-মঙ্গলের অতি পরিচিত কাহিনী নতুন করে সঙ্কলিত হবার দাবী রাখে না—বিশেষতঃ যেখানে পূর্ণাঙ্গ সঙ্কলন আছে।

ডাক্তার শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই তাঁর 'বাঙলার লোক-সাহিত্য' বইটিতে লোক-সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা এবং আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু

কিছু সঙ্কলন করেছেন। তাঁর বই আলোচনার, কাজেই সংগ্রহের দিক থেকে তাঁর বই আলোচ্য নয়। তিনি গানগুলোকে আলোচনার জন্ম এই ভাবে সাজিয়েছেন; আঞ্চলিক, ব্যবহারিক, আনুষ্ঠানিক, প্রেম এবং কর্ম। আমরা জানি না, এটি সঙ্কলন হলেও তিনি এমন রীতির অনুসরণ করলেন কেন। যাই হোক, এই বিভাগ রীতির অনুসরণের ফলে কয়েকটি প্রশ্নও আসে। 'সারি' বা 'ঝুমুর'কে কতোখানি আঞ্চলিক বলা চলে? কেননা, সারি গান পূর্ববঙ্গে বেশী দেখা গেলেও পশ্চিমবঙ্গেও একদা তা গীত হত। ঝুমুর গান কেবল সীমান্ত বঙ্গেই নয়; শ্রীহট্টেও এবং আসামের চা-বাগানের কুলী-কামিনদের মধ্যেও মেলে। এবং সে ঝুমুরের প্রকৃতি আলাদা। লোকসঙ্গীতের মধ্যে 'হাসির গান' একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। অথচ, এই হাসির গান কোন্ শিরোনামের নীচে স্থান পাবে, সে বিষয়ে তিনি নীরব। পূজানুষ্ঠান ছাড়াও সাধারণ ভক্তিমূলক লোকসঙ্গীত আছে। তাকে কতোখানি 'আনুষ্ঠানিক' বলব? তেমনি, ব্যবহারিক ব্যাপার ছাড়াও গান আছে, ইতরপ্রাণী ও পশুকে নিয়ে গান—সেগুলো কোন্ দলে পড়বে? ডাক্তার ভট্টাচার্যের প্রস্তাবিত লোক-সাহিত্যের তৃতীয় খণ্ড, বা লোকসঙ্গীতের আলোচনা, তার সূচী বিজ্ঞাপিত হয়েছে। এই প্রস্তাবিত খণ্ডের বিজ্ঞাপিত সূচীতে ভাটিয়ালী গানের নামোল্লেখ দেখলাম না। 'রাগ' ও 'ধামাইল' গানের নামও অনুল্লিখিত থেকে গেছে। তেমনি দৃষ্টিকোণেরও পরিবর্তন আছে। 'লোক-সাহিত্যে' তিনি বাউল গানকে আলোচনার বাইরেই রেখেছিলেন। প্রস্তাবিত খণ্ডে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কেন এই উদ্যোগ?

ধর্মানুষ্ঠান ও ভক্তিভাবাত্মক লোক-সঙ্গীতকে এক না করাই ভাল। আমার মনে হয়, একান্ত ভাবেই যা ritual-এর অন্তর্গত তাকে 'ধর্মীয় লোকসঙ্গীত' (religious folk-songs) এবং যা বিশুদ্ধ ভক্তিভাবাত্মক তাকে ভক্তিমূলক গান (devotional folk-songs) নাম দেওয়া বোধ হয় সঙ্গত।

লোকসঙ্গীত গীত হবার প্রসঙ্গে ডাক্তার ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন: "বৃদ্ধেরা প্রেম-সঙ্গীত গাহিবে না, বিধবাগণও কুমারী ও সধবাদিগের মত ব্যক্তিগত ঐহিক আশা-আকাঙ্ক্ষাযুক্ত কোন বিষয় সঙ্গীতের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবে না।" (পৃঃ ১৪২, দ্বিতীয় সং)। একথা সত্যি, পটুয়ারা

পট দেখানো ছাড়া, কিংবা সাপুড়েরা সাপ খেলানো ছাড়া তাদের গান গায় না; কিন্তু তাই বলে বুড়োরা প্রেমের গান গাইবে না, কিংবা বিধবারা কুমারী মনের আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে গান গাইবে না,—এমন কথা বাস্তব জগতের সঙ্গে মেলে না। আমি বহু গায়িকাকে হাজির করতে পারি, যাঁরা বুড়ী এবং বিধবা,—এবং সব রকমের গানই গেয়ে থাকেন।

এর চেয়েও অসম্পূর্ণ, অক্ষম এবং উল্লেখের সম্পূর্ণ অযোগ্য বই হল—শ্রীবুদ্ধদেব রায় রচিত 'বাঙলা লোক-সঙ্গীতের রূপরেখা' (পৌষ ১৩৭০)। বইটি মোট তের বার আমাকে ফাঁকি দিয়েছে। এর তেরটি প্রবন্ধ এবং গোটা বইটির নামের মধ্যে এমন একটা গাল-ভরা ব্যাপ্তি আছে যে, মহা উৎসাহে অভিনব তথ্য প্রাপ্তির আশায় যেই এক একটি প্রবন্ধ পড়তে গেছি, তেমনি ঠকেছি।

নিষ্ঠাপূর্ণ যে দুটি সঙ্কলনের কথা এবার উল্লেখ করব, সে দুটিই বাউল গানের। একটি ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মশাইয়ের 'বাঙলার বাউল ও বাউল গান' (১৩৬৪) এবং অপরটি ডাক্তার শ্রীমতিলাল দাস এবং অধুনা ডাক্তার শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত 'লালন গীতিকা' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮)। ডাক্তার ভট্টাচার্যের বই তাঁর দীর্ঘদিনের অনলস সাধনা এবং অনেক শ্রমের ফসল। এতে ৫১৭টি বাউল গান এবং পরিশিষ্টে আরো ১৮টি গান যুক্ত হয়েছে। বাউলিয়া তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এতে মিলবে। ডাক্তার দাস এবং ডাক্তার মহাপাত্রের বই লালন শাহ্‌ ফকিরের ৪৬২টি গানের সমাহার। গানগুলোকে একটি সুন্দর রসের দৃষ্টি নিয়ে সাজানো হয়েছে। একদিকে বাউল-তত্ত্বের গানগুলোকে, অপরদিকে বৈষ্ণব-প্রতিবেশে রচা গানগুলোকে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে অনেক শ্রম স্বীকার করে ডাক্তার মহাপাত্র একটি 'অর্থসংকেত' জুড়ে দিয়েছেন, যার ফলে তার আলোকে গান-গুলোর মর্মোদ্ধার করা সহজতর হয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রকাশনা রাজনৈতিক কারণেই দেখতে পাই না। তবু অনেক কষ্ট করে খান দু-তিন বই দেখেছি। তার মধ্যে একটি হল 'বাঙলা একাডেমী'র 'লোক-সাহিত্য' (দ্বিতীয়) (আশ্বিন ১৩৭০)। এমন নয়ন-মোহন সঙ্কলন সত্যিই অনেকদিন দেখিনি। এতে ছ'টি বিষয়ের সকলন আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমি শুধু 'পুঁথিগানের খোষা'

এবং 'নৌকা বাওয়ার গান'-এর উল্লেখ করছি। প্রবাদের কথা আগেই বলেছি। 'পুঁথিগানের ঘোষা'-র প্রারম্ভে সম্পাদকীয় মন্তব্য: "পুঁথি পাঠ করার সময় পাঠক মাঝে মাঝে পুঁথির ছন্দ ও সুরে যে অতিরিক্ত পাঠ সংযোজন করে, তাহা ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ এলাকায় 'পুঁথি গানের ঘোষা' নামে পরিচিত। সাধারণত পুঁথির কাহিনীর একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য এবং শ্রোতাদের মধ্যে হালকা রস পরিবেশনের উদ্দেশ্যে এই ঘোষা পাঠ করা হয়। কৌতুকময় কাহিনী বা ঘটনাই প্রধানতঃ ঘোষার বিষয়বস্তু। কোনো কোনো ঘোষা গান দীর্ঘও হইয়া থাকে, সেগুলিকে পুঁথি গানের লাম্বা ঘোষা বলা হয়।" ঘোষা গানের এই ধরনের সংগ্রহ, আমি যতদূর জানি, এই প্রথম। সংগ্রাহকের নাম, ঠিকানা, যাঁর কাছ থেকে তা সংগৃহীত হয়েছে, তাঁর নাম, ঠিকানা, বয়স এবং সংগ্রহের তারিখ উল্লেখের মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম অনুসরণের পরিচয় আছে। তবে, যদি একটি পুঁথির reference দিয়ে খানিকটা অংশ বুঝিয়ে দেওয়া হত, বাঙলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান সাহেব তবে অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী হতেন। এই বইটি পড়ে যে অভাবটি অনুভব করলাম—তা হল আলোচনার। ভবিষ্যতের সংগ্রহ ও সঙ্কলন গুলোতে তাঁরা যদি একটু বেশী করে আলোচনার আয়োজন করেন, তবে পরিচয় পূর্ণাঙ্গ হয়।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আরো অন্যান্য বই বেরিয়েছে। যেমন, মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি' বইটির সপ্তম খণ্ড। এটির প্রথম দুটি খণ্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকদিন আগে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর পাঁচটি খণ্ড পূর্ব-পাকিস্তান থেকে বের হয়েছে। হাসান হাবিবুর রহমান এবং আলমগীর জলিল-সম্পাদিত 'উত্তরবঙ্গের মেয়েলী গীত,' রওশন ইজদানীর 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য'। এই সব বইয়ের একটিও দেখবার সুযোগ আমাদের হয় নি।

লোক-গীতির প্রসঙ্গে 'গীতিকা' এবং 'গাথা' কথা দুটিরও ব্যাখ্যা দরকার। ইংরেজীতে যা ballad, স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মশাই তার বাঙলা করেছিলেন 'গীতিকা' বলে। মৈমনসিংহ গীতিকা, 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' প্রভৃতি তাঁর সম্পাদিত বইয়ে এই নাম খুব চালু

হয়েছে। ডাক্তার শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মশাই তাঁর 'লোক সাহিত্য' বইটিতে ballad-এর বাঙলা 'গীতিকা'-ই বহাল রেখেছেন। কিন্তু স্বর্গীয় ডাক্তার শশিভূষণ দাশগুপ্ত খুব সম্ভব তা মানতেন না। কাজেই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন ডাক্তার মতিলাল দাস এবং ডাক্তার পীযূষকান্তি মহাপাত্রের সম্পাদনায় লালনশাহ ফকিরের গান বের হয়, তখন তার নাম রেখেছিলেন 'লালন গীতিকা'। অথচ, তা 'ব্যালাড' নয়।

ডাক্তার শ্রীসুকুমার সেন, ballad-বলতে 'গাথা'-কে বুঝেছেন। তিনি লিখেছেন, "গাথা মানে যা গাওয়া হয়—গান অথবা ছোট বড় কাহিনী যা গান করা হত। আমাদের দেশে লোক-সাহিত্যের এই রূপটি বিবাহমঙ্গলের অনুষ্ঠানরূপে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হয়েছে, এবং অনেক জায়গায় শেষ পর্যন্ত বিয়ের ব্যাপারে এবং মেয়েলি আচারের মধ্যেই এর অধিকার রয়ে গেছে।" (বিচিত্র সাহিত্য, পৃঃ ২০৬)। বিয়ের ব্যাপারে 'গাথা' গাইবার রীতি অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডাক্তার সেন ঋগ্বেদের যুগে পৌঁছেছেন। "লোক-গাথার দুটো রূপ—কবিতা ও গান। লোক-সাহিত্যের কবিতা প্রথমে দু'ছত্রের হত, তাই এই কবিতার ও তার ছন্দের নাম প্রাকৃতে হয়েছিল গাহা।" (পৃঃ ২০৭)। 'গাহা'-র মধ্যে একটি মেয়েলী ঢঙ্ আছে। আজো যখন শ্রোতাদের 'সই' বলে সম্বোধন করে বাউল গান বা অন্য গান গীত-রচিত হয়, তখন সেই প্রাচীন মেয়েলী ঢঙ্টিরই অনুসরণ মেলে।

সম্প্রতি ডাক্তার বহ্নিকুমারী (চক্রবর্তী) ভট্টাচার্যের গবেষণা-গ্রন্থ 'বাঙলা গাথা কাব্য' (নভেম্বর ১৯৬২) প্রকাশিত হয়েছে। তিনি 'গাথা'র সংজ্ঞায় বলেছেন তা "মৌখিক কাহিনীমূলক গীতিকাব্য" (পৃঃ ৭)। "সপ্তদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত গাথা কাব্যগুলি গ্রাম্য সমাজে সুপ্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাদের প্রচলন কিছুটা কমিয়া যায় এবং তখন হইতে অল্প-শিক্ষিত গায়েনগণ গাথাগুলিকে লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন বলিয়া অনুমান করা যায়, কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ গাথার সংখ্যা

সর্বাপেক্ষা বেশী।" (পৃঃ ৮)। শ্রীমতী ভট্টাচার্য গাথাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন: প্রণয় গাথা, ঐতিহাসিক গাথা, ধর্মাশ্রিত গাথা, নীতিকথাশ্রিত গাথা, বারমাসী গাথা, আধুনিক গাথা। আধুনিক গাথা-কারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। গাথার সঙ্গে গানের এবং পাশ্চাত্ত্য গাথার বিশেষ যোগ রয়েছে। শ্রীমতী ভট্টাচার্য আশ্বাস দিয়েছেন, ভবিষ্যতে তিনি এ বিষয়ে বই লিখবেন।

আসলে বাঙলা 'গাথা' সঙ্কলন যেন দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-তে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। সম্প্রতি সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে কিছু কিছু গাথা সঙ্কলিত হচ্ছে। 'লোক সাহিত্য' (দ্বিতীয়)-এ পেলাম, 'ছইফা সুন্দরীর পালাগান,' (নামে 'পালা গান' হলেও আসলে গাথা) এবং 'চম্পাবতী কইন্যার পালাগান'। (দ্বিতীয় খণ্ড)। 'ছইফা সুন্দরীর পালাগান' সিলেটের একটি জনপ্রিয় পালাগান। মনে হয়, সিলেট জেলা থেকে আরো 'পালাগান' (অর্থাৎ গাথা) সংগ্রহ করে একটি গুচ্ছ করলে তার পরিপূর্ণ রূপটি ফুটে ওঠার সুযোগ পেত। তেমনি 'চম্পাবতী কইন্যার পালাগান'টির রস দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে বইয়ের দুটি খণ্ডে এর দুটিঅংশ সঙ্কলিত হবার জন্য। 'চম্পাবতী কইন্যার পালাগান' রঙপুর জেলার একটি বহু-চলিত জনপ্রিয় গান। শ্রীহট্ট এবং রঙপুর দু জায়গায় 'পালাগান' এই অভিধা সম্পর্কে আমার একটি বক্তব্য রয়েছে।

রঙপুরের পালাগান-কে 'পালাটিয়া' গানও বলে,—কিন্তু সেই একই 'পালাটিয়া' গান আবার জলপাইগুড়ি• জেলাতে 'নাট্যকাহিনী'-কে বুঝিয়ে থাকে। 'পালাগান,' 'পালাটিয়া গান' এবং 'গাথা'র সম্পর্ক আরো আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কার হওয়া দরকার। শ্রীহট্ট জেলাতেও কি 'গাথা' বোঝাতে 'পালাগান, চলিত আছে? কাহিনীমূলক গানকে শ্রীহট্টে 'লাচাড়ী' গানও বলা হয়। 'লাচাড়ী' এবং পালাগান' কি অভিন্ন?

● পাঁচ ●

'কথা' বা 'কাহিনী' ও লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট দিক। 'কথা'-র মধ্যেও আছে রূপকথা, ব্রতকথা, ইতিকথা, পুরাকথা। 'বিচিত্র প্রবন্ধ', (জুন ১৯৬১) বইটিতে ডাক্তার শ্রীসুকুমার সেন মশাই কথা, রূপকথা, এবং উপকথার মূল নির্ণয় করেছেন। "...'কথা' সর্বনামজাত অব্যয়। অর্থ "কেমন করে"। গল্প শুনতে শুনতে এখনকার শ্রোতারা যেমন কৌতূহলপ্রোরিত হয়ে বলে "তারপর তারপর"। দু হাজার আড়াই হাজার বছর আগেকার শ্রোতারা সেই ভাবাবেশে উদ্রিক্ত হয়ে বলত "কথা, কথা"। তার থেকে শব্দটি চলিত হয়ে গেল গল্প অর্থে, পদোন্নতিও হল অব্যয় থেকে বিশেষ্যে এবং স্ত্রীলিঙ্গে। তারপরে গল্প বলা অর্থে এর থেকে নামধাতুর সৃষ্টি হল 'কথায়তি'। ক্রিয়াটি অনতিকাল পরে অর্থ সম্প্রসার করে ব্রু ধাতুর সমার্থক হয়ে পড়ে।...

"বাঙলায় লৌকিক কাহিনী অর্থাৎ folk-tale বা fairy-tale অর্থে একদা অপূর্বকথা শব্দটি চলিত ছিল। কালক্রমে লোকমুখে অপূর্বকথা পরিবর্তিত হল অপুরূব কথায়, তারপর অপরূপ কথায়, অবশেষে "অপ" বাদ ত্যাগ করে দাঁড়াল রূপকথায়। অঞ্চল বিশেষের কথ্য ভাষায় এবং সর্বত্র শিশু রসনায় আদি রকারের প্রতি বিমুখতার ফলে শব্দটি দাঁড়িয়েছে উপকথায়।" (পৃঃ ২৫৪)

এই মন্তব্য থেকে বুঝি, ডাক্তার সেন (ক) folk-tale এবং fairy tale-এর মধ্যে পার্থক্য করেন নি (খ) রূপকথা এবং উপকথাকে অভিন্ন বলেছেন। ডাক্তার শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'লোক সাহিত্য' বইতে ভিন্ন পথে চারণ করেছেন। তিনি folk-tale এবং fairy tale-এর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে ইংরেজিতে যা fairy-tale, বাঙলায় তা-ই 'রূপকথা' "কোন কোন লোক -কথা অতিরিক্ত রোমান্স ধর্মী, কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে ইহারা স্বাধীন-বিহার করিয়া থাকে, ইংরেজিতে ইহাদিগকে fairy-tale ও বাঙলায় রূপকথা বলা হয়।" (দ্বিতীয় খণ্ড) (পৃঃ ৩৭৩)। তাঁর মতে, 'রূপকথা' ও 'উপকথা' এক জিনিষ নয়। উপকথা বলতে তিনি

"পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত" (পৃঃ ৫৮১) কথাকেই বুঝেছেন। তিনি 'রূপকথা'-কে শিশুসাহিত্য বলে মেনে নিতে নারাজ,— শিশুসাহিত্যের অস্তিত্বই তিনি স্বীকার করেন না।

রূপকথার একটি সাহিত্যিক দিকও আছে। অতি আধুনিক কালে অনেক সাহিত্যিক প্রচলিত রূপকথাকে নিজের ভাষায় রূপ দিয়েছেন, নয়ত রূপকথার ছাঁচে নিজের কল্পনাকে ঢেলে কথা রচনা করেছেন; এই ধরনের একটি লেখা অনেকদিন আগে লিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। 'টুনটুনির বই' (১৩২২) হয়ে তা বেরিয়েছে।

খাঁটি রূপকথার সঙ্কলন ও সংগ্রহ বর্তমানে বড়ই কম। যা-ও-বা সঙ্কলিত হয়, তাও খাঁটি বস্তু নয়,—ভাষার দিক থেকে। গদ্য জিনিস হুবহু সঙ্কলন করা কঠিন,—কেননা বার-বার শুনে অথবা টেপ-রেকর্ড করিয়ে বার বার বাজিয়ে তা লিখে নিতে হয়। সে ঝামেলা অনেকেই নিতে চান না। এই জন্যই, সংগ্রাহক বা সঙ্কলক নিজের ভাষায় কাহিনীকে রূপ দিচ্ছেন। শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' (১৩৬০) বইটিতে যে ক'টি কথা বা ব্রতকথা আছে, তাতে এই ব্যাপার লক্ষ্য করেছি।

'ধার্মিক রাজার কিস্সা' নামে একটি কাহিনী 'লোক সাহিত্য' (দ্বিতীয়) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এটি রঙপুর এবং ঢাকা জেলা থেকে সংগৃহীত। দু' জেলারই উপভাষাগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে আলাদা ভাবে তা দেখানো হয়েছে। ঢাকা থেকে প্রকাশিত আসরফ সিদ্দিকী সম্পাদিত 'কিশোরগঞ্জের লোক কাহিনী' বইটি আমি দেখি নি।

● ছয় ●

লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে 'লোক-নৃত্যে'র যোগ অচ্ছেদ্য। গানে যা কেবল 'ভাব' হয়ে থাকে, নৃত্যে সেই ভাবই নিজের মূর্তি খুঁজে নেয়। এই ভাব এবং 'রূপ' মিলেই পুরো রস। 'রূপ' ভাবেরই প্রতিরূপ। কাজেই যে মন ও জীবন লোক-সঙ্গীতের ভাবজগতের আড়ালে থাকে, সেই একই মন ও জীবন লোক-নৃত্যের রূপের মধ্যেও। এই জন্য 'লোক-নৃত্য' বিচার করবার সময় লোক-জীবন ও মানসের প্রেক্ষাপটেই বিচার করা দরকার।

বাঙলার লোক-নৃত্য নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সবার আগে যেটি উল্লেখযোগ্য, সেটি স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত, আই. সি. এস. রচিত 'The Folk Dances of Bengal (1954)। দত্ত মশাই নৃত্যবিদ্ ছিলেন না,—কিন্তু তিনি লোক-সংস্কৃতিকে আন্তরিক ভালবাসতেন—তাঁর রচনাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। তিনি বাঙলার লোকনৃত্যের কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছেন এবং তার অন্তর্লীন মনো-ভাবটি (motive)-কে ভিত্তি করে লোক-নৃত্যের শ্রেণীভাগ করেছেন। সব শেষে, লোকজীবনের দৃষ্টিকোণ থেকেই লোক-নৃত্যকে বিচার করতে চেয়েছেন, তার মধ্যে অন্য কোনো তত্ত্বকে আবিষ্কার করেন নি।

বাঙলার লোক-নৃত্যের যে বিশেষত্ব তিনি খুঁজে পেয়েছেন, মোটামুটি তার রূপরেখা এই: (১) বাঙলার লোক-নৃত্যে বীরত্ব ও কঠোরতার ভাব আছে, কোমলতার অভাব আছে। এর কারণ বোধ হয় বাঙলা-লোক-নৃত্যের কালে তাদের ললিত যন্ত্র না বাজিয়ে ঢাক-ঢোল বাজানো হয়, যা ললিত নয়। এমনকি মেয়েদের ব্রত-নাচেও ঢাক বাজে। (২) পুরুষের নাচে দেহের ঊর্ধাংশ এবং মেয়েদের নাচে দেহের নিম্নাংশ অধিক ব্যবহৃত হয় (৩) কেবল বীরভাব বা আধ্যাত্মিকতাই নয়, সমাজের বন্ধনের সংহতি লোক-নৃত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। "Folk dances have a pronounced democratic base and are undoubtedly designed for solidarity, unity and fellowship in the village community among both men and women", (p.21) (৪) পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজ-বেশ, অলঙ্কার প্রভৃতির দিক থেকে নিরাভরণ ও অনাড়ম্বর। বাউল আলখাল্লা পরে বটে, তবে তা শত তালি দেওয়া, তাতে দৈন্যই ফুটে ওঠে। (৫) উন্মুক্ত অম্বর তলে বা প্রাঙ্গণেই বাঙলার লোক-নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বাঙলার লোক-নৃত্যের মধ্যে তিনি বিশেষ কয়েকটি মনোভাব (motive) লক্ষ্য করেছেন এবং তারই ভিত্তিতে লোক-নৃত্যকে ভাগ করেছেন। যেমন, যুদ্ধের মনোভাব (রায়বেঁশে, ঢালী); ক্রীড়ার মনো-ভাব (কাঠি, লাঠি, ঝুমুর, ধামাইল); আনুষ্ঠানিক (বরণ, আরতি); পূর্ণ আত্মপ্রকাশনা (ব্রত নাচ): সামাজিক মনোভাব (বিয়ের নাচ); আধ্যাত্মলোকের সঙ্গে আত্মার আনন্দময় সাযুজ্য (বাউল, মুরশিদী),

আধ্যাত্মিকতা ও আত্মশোধনের মনোভাব (কীর্তন) ; নীতির মনোভাব (রামায়ণ, সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, পদ্মপুরাণ, গাম্ভীর গান, মাণিক পীর, শ্লোক, বোলান) ; সামাজিক মিলন (জারী, দই নাচ) ; যোগ্যতা পরিচায়ক (ধর্মপূজা, চড়ক) ; পূজা (মনসা ভাসানের নাচ) ইত্যাদি।

কীর্তন গানে যেখানে সবাই ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়, তার মধ্যে তিনি দেখেছেন গণতান্ত্রিক সাম্যকে। ঝুমুর নাচে যেখানে সবাই হাত ধরে নাচে, তার মধ্যে তিনি লোক-সমাজের শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃঢ়তাকে লক্ষ্য করেছেন। সুন্দরভাবে ছাপা মোট ৮৩টি বিভিন্ন ছবি দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন।

এর পর উল্লেখ করি শ্রীশান্তিদেব ঘোষ লিখিত 'গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য' (১৮৮১ শকাব্দ) নামে বইটির। তাঁর 'বাউল' ও 'বউ নাচে'র আলোচনা (ছবি-সহ) সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। তাঁর বর্ণনা যেমন নিখুঁত ও নিঃশেষ, বিশ্লেষণও তেমনি objective দৃষ্টিতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণে মুদ্রিত, নৃত্যবিদ্ শ্রীমণি বর্ধনের 'বাঙলার লোকনৃত্য ও গীতি বৈচিত্র্য' (জুলাই ১৯৬১) বইটির কথা আমি আগে একবার উল্লেখ করেছি। এই বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের নাম হল 'নৃত্যাধ্যায়'! ৭৫ পৃষ্ঠা থেকে ১০০ পৃষ্ঠা—অর্থাৎ মাত্র পঁচিশ পৃষ্ঠার বিস্তারের মধ্যে তিনি ৬১ রকমের বাঙলা লোক-নৃত্যের কথা বলেছেন : এবং ১০১ পৃষ্ঠা থেকে ১১৬ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ১৬ পৃষ্ঠা'র বিস্তারের মধ্যে কতকগুলো প্রায়-অস্পষ্ট ছবি দিয়েছেন।

শ্রীবর্ধনের আলোচনার মধ্যে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণের অভাব চোখে পড়ল। তিনি কেবল বিবৃতি দিয়ে গেছেন। কিন্তু, বিবৃতির তথ্যকে অবলম্বন করে কোনো সত্যে বা মতবাদে গিয়ে তিনি পৌছতে পারেন নি।

বাঙলার লোক-নৃত্য প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন মনে জাগে। পুরুষ ও নারীর ভিন্ন ভিন্ন নাচ আছে, কিন্তু শিশুর নাচ নেই কেন? সে কি শিশুর খেলার ছড়ায় দুলুনিতে স্থান নিয়েছে? অঞ্চলের ভিত্তিতে যদি লোক-নৃত্যের ভাগ করি, তবে রূপের মধ্যেও তার পার্থক্যকে লক্ষ্য করা যাবে কিনা? অর্থাৎ 'বাউল গান' পূর্ব ও পশ্চিম দু'বাঙলাতেই আছে,

সঙ্গে নাচাও হয় সর্বত্র। দু বাঙলার নাচের রূপ কি পৃথক? কিংবা, যে বাউল অধিক মুসলমান-ঘেঁষা, আর যে বাউল অধিক বৈষ্ণব-ঘেঁষা (যদিও জানি, বাউলেরা সাম্প্রদায়িক নন) তাঁদের নাচে কি কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? 'সারি গান' এখন কেবল পূর্বপাকিস্তানেই আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু এককালে পশ্চিমবঙ্গেও তার চলন ছিল। নদী-মাতৃক দেশ বলে পূর্বপাকিস্তানে তার সমধিক চলনের কারণ বুঝি। কিন্তু, পূর্বপাকিস্তানে সারি-র সঙ্গে যে নৃত্য তা নদীর তীরে বা বুকে। আঙিনার নাচের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে কি?

লোক-নৃত্যের প্রসঙ্গে সবশেষে উল্লেখ করি শ্রীসাধনাপ্রসাদ দাশগুপ্তের 'ভারতের লোক-সংস্কৃতি পরিচয়' (এক: লোকনৃত্য) বইটির নাম। বইটিতে ভারতের লোকনৃত্যের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ও তালিকা আছে, ছবি দিয়ে তা পূর্ণ করার চেষ্টাও আছে। লোক-নৃত্যের মধ্যে ক্লাসিকতার দিকটিও সেখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

এইবার লোক-শিল্পের কথা বলি। বহুদিন আগে (১৯৩৯) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়েছিল অজিত মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'Folk Art of Bengal'। তারপর তার দ্বিতীয় সংস্করণও (১৯৪৬) বেরিয়েছে। আমাদের আলোচনার কাল সীমার মধ্যে যদিও এ বইটি পড়ে না, তবু উল্লেখযোগ্য বলে এটির নাম করলাম। লোক-সমাজের পরিবেশ, ধর্মীয় ও সামাজিক দিক, প্রতীকতা এবং স্থাপত্যের দিক নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। তিনি বাঙলার কাঁথা, বস্ত্রশিল্প, আলপনা, মাটির জিনিস, ধাতুর জিনিস, বাঁশ-বেতের জিনিস, কাঠের জিনিস প্রভৃতি লক্ষ্য করেছেন। ৫৮টি ছবিতে তাঁর আলোচনা সুন্দর হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'বাঙলার লোক-শিল্প' (১৩৬৮)। অজিত মুখার্জীর বইয়ের সঙ্গে কল্যাণ গাঙ্গুলীর বইয়ের তুলনা করলে দেখি,—অজিত মুখার্জী যেমন বাঙলার লোক-শিল্পের সর্বদিক স্পর্শ করে সে বিষয়ে নিঃশেষ আলোচনার আয়োজন করেছেন, কল্যাণ গাঙ্গুলী তেমনি তাঁর বইকে করেছেন কয়েকটি প্রবন্ধের সমাহার। তাঁর বইয়ের প্রবন্ধ-সূচী এই: লোব-শিল্পের পটভূমি। লোক-সংস্কৃতির স্বরূপ। রূপকথা। বাঙলা ও ভারত। পট ও লোক-চিত্র। বাঙলার কাঁথা ও

উৎসবের বিবৃতি এতে আছে। বইয়ের নাম এবং বিস্তৃতি দেখলেই বোঝা যায় এ বইয়ের আলোচনা অপূর্ণ হতে বাধ্য। কিছু কিছু ব্রতের কথা কেন উল্লিখিত হল, কেনই বা অন্যগুলো বাদ পড়ল, বোঝা গেল না।

বাঙলার লোকসঙ্গীতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বিদেশে, যেখানে গ্রাম ও শহর অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ সেখানেও যদি গ্রাম্য-জীবন শহরমুখী হবার দরুন লোকসঙ্গীতের ধারা লুকিয়ে না গিয়ে থাকে, তবে আমাদের ভারতবর্ষেও সে রূপ চিন্তা করবার কোনো কারণ নেই। আর বিদেশের তুলনায়, আমাদের গ্রাম অনেক কম শহরমুখী। আসলে, লোক-সঙ্গীতকে যদি 'আপেক্ষিক' দৃষ্টিতে দেখি, তবে এই সন্দেহ ওঠেই না। মার্জিত সাহিত্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে চিরদিনই লোক-সঙ্গীতের একটি পার্থক্য থাকবে। সেই পার্থক্যের আপেক্ষিকতাই, গ্রাম জীবন শহরাভিমুখী হলেও, লোক-সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখবে। লোক-সঙ্গীতের বিবর্তন মানেই বিস্মৃতি নয়; এবং লোক-সঙ্গীতের সেই বিবর্তনের সময় মার্জিত সঙ্গীতেরও বিবর্তন হবে, কাজেই ফারাক থেকেই যাবে। সেই ফারাকটাকেই তখন লোক-সঙ্গীতের স্বরূপ বলে মেনে নিতে হবে।

বাংলা নাটক :
গত এক দশক

পবিত্র সরকার

১.

মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাস ধারাবাহিক, কিন্তু সমালোচক জাতীয় জীবদের দরকারে তার উপর নানা জরিপকর্ম চলে। মূলত তারই উদ্দেশ্যে 'যুগবিভাগ' নামক কিম্ভূত ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। 'যুগ' জিনিসটা প্রায়ই দিগ্‌ভ্রান্ত করে, আর আমাদের সুবিধার জন্য মানবসংস্কৃতির স্রোত কেবল বাঁক নিয়েই চলে এমনও নয়! সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের আলোচনায় তাই ১৯৫০ থেকে ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়খণ্ডকে নিয়ে একটু বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। এই চোদ্দ বৎসরের মধ্য থেকে আভিধানিক অর্থে ছাড়া অন্য কোনো গভীরতর অর্থে একটি যুগ উদ্ধার করা অসম্ভব। বাংলা নাটকের ক্রমপ্রকাশমান আয়োজনে ১৯৫০ সালটির তেমন কোনো ভূমিকা আছে কিনা সন্দেহ, বরং এই বছরটি বাংলা নাটকের চলতি ধারার আড়ালে কখন অপসৃত হয়েছে কেউ লক্ষ্যই করে নি। সুতরাং কাজের সুবিধার জন্য ঐ তথাকথিত চলতি ধারার উৎসটি অনুধাবন করা যায়। উনিশ শো পঞ্চাশের আগে বাংলা নাটক যে নিকটতম বাঁকটি নিয়েছে সেখানে গিয়ে পৌঁছুলেই আজ এই উনিশ শো চৌষট্টি পর্যন্ত বাংলা নাটকের গতিবিধির স্পষ্ট ধারণা করা যাবে। কেন না এই সময়ের মধ্যে বাংলা নাটক আর নতুন কোনো বাঁক নেয় নি, বরং সেই পূর্ববর্তী বাঁকের সম্ভাবনাগুলিকেই আরো বিস্তৃত করেছে। নাটকের বিষয়গত বৈচিত্র্য বেড়েছে কিনা বলা শক্ত, তবে অভিনয়ের উৎসাহ, প্রয়াস ও সিদ্ধি বেড়ে গেছে বহুলপরিমাণে।

২.

১৯৪৪ সালে নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, 'নবান্ন' নাটক, এবং গণ-

নাট্য সংঘ—এই তিনটি ব্যক্তি বস্তু ও প্রতিষ্ঠানের যোগে বাংলা নাটকের সেই বহুকথিত এবং সর্বাপেক্ষা গৌরবময় দিক্‌পরিবর্তন ঘটেছিল। বলা বাহুল্য, বাংলা নাটকের এই জন্মান্তর আকস্মিক নয়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে রোমান্সের স্বপ্নবিহ্বলতা, বা ঐতিহাসিক আস্ফালনের তখন অত্যন্ত দুরবস্থা। যুদ্ধের প্রবল ঝাঁকুনি দেশের চৈতন্যকে নাড়া দিতে-না-দিতেই এসেছে দুর্ভিক্ষ, এবং ঐ দুর্ভিক্ষে 'নবান্নে'র ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষাকে কিছুতেই রোধ করা গেল না। বিজন ভট্টাচার্যের আরেকটি নাটক, 'জবানবন্দী', হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'Queue' নামে Skit, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযান' নামে দু-দৃশ্য-সম্বল নাটিকা [যা পরে 'দীপশিখা' নাম দিয়ে পরিবর্ধিত করা হয়], বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' ইত্যাদির অভিনয় দিয়ে নবনাট্যের অকুণ্ঠ অগ্রগমন সূচিত হয়েছিল। গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠান হিসাবে যূথবদ্ধ হয়েছে তার পরে, চীন প্রভৃতি দেশের People's Theatre-গুলির আদর্শে; এবং 'নবান্ন' নাটকই গণনাট্য আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করে। তার আগে অসংগঠিতরূপে গণনাট্য সংঘ ছিল 'ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী' সংঘের সাংস্কৃতিক শাখা।

১৯৪৪ সালে যার শুরু, যার প্রচণ্ড উদ্দীপনা প্রায় সমস্ত দেশে সঞ্চারিত হয়েছে, ১৯৫০-এ সেই প্রতিষ্ঠান দ্বিধাগ্রস্ত, শিথিলবদ্ধ, প্রায় কিংবদন্তীতে পর্যবসিত। তার তিন বছর আগে যে রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে তার মানবিক গুরুত্ব সাত বছর আগেকার মন্বন্তরের চেয়ে কম নয়। দেশ-বিভাগের প্রচণ্ড অভিঘাত বাংলা দেশের সংস্কৃতিকে বিভক্ত করে দিল, সংস্কৃতির ভিত ধরে নাড়া দিল বলা চলে—কিন্তু এ দুঃখ আমাদের কিছুতেই যাবে না যে, ঐ দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে গণনাট্য বাংলার মানুষকে কোনো আশ্বাসই দিতে পারল না। না রচিত হল উন্মাদনাকর নতুন নাটক, না দেখা গেল বিপ্লবী অভিনেতা। সলিল সেনের 'নূতন ইহুদী' (১৯৫১-তে প্রকাশিত) যাওবা একটু উচ্চারণ নিয়ে এল, তার আবেদন কলকাতার সংকীর্ণ দর্শক সমাজকে ছাড়িয়ে সারা দেশে বিস্তৃত হতে পারল না। এবং এই সাতচল্লিশেরই অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর ঘটনা, স্বাধীনতা লাভ, তা-ও কোনো সফল নাটকে তেমন সাগ্রহ অভ্যর্থনা পেল না। কিছু অকালকুষ্মাণ্ড নাটক লেখা হয় নি তা নয়, কিন্তু তা

নাট্যকার বা স্বাধীনতা কিছুরই সম্মান বাড়ায় নি। উনিশ শো সাত-চল্লিশের দারুণ সম্ভাবনা বাংলা উপন্যাসে যেমন, নাটকেও তেমনি নিষ্ফল হয়ে রইল। সংস্কৃতির এই ভয়াবহ বন্ধ্যাত্বের ক্ষমা আছে কি না সন্দেহ।

৩.

উনিশ শো পঞ্চাশ, এবং তার পরবর্তী এই তেরো-চোদ্দ বছর বাংলা নাটকের সেই লক্ষ্যচ্যুতির ইতিহাসই ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে চলেছে। লক্ষ্যচ্যুতি নয় তো কী? নবনাট্য আন্দোলনের মধ্য থেকে আন্দোলন ব্যাপারটা খসে গেল এবং একটি ঘনিষ্ঠ সংহত প্রচেষ্টা টুকরো টুকরো হয়ে অসংখ্য প্রায়ই-উদ্দেশ্যহীন প্রয়াসে গিয়ে পৌছুল। এ প্রসঙ্গে পাঠকদের সবিনয়ে নিবেদন করি যে, নাটক বলতে ব্যক্তিগতভাবে আমি বুঝি, যা মঞ্চে দেখা যায়, যে-বস্তু দুটি মলাটের বন্ধনে পাঠযোগ্যরূপে বাঁধা পড়ে আছে সে-বস্তু নয়। একথা অবশ্য ঠিক যে নাটকের অভিনেয়ত্ব একদিনে যাচাই করা যায় না, আজকের নাটক প্রায়ই কুড়ি-পঁচিশ বছর পরেকার প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতার প্রতীক্ষা করে—যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র ক্ষেত্রে। যাই হোক, এই চোদ্দ বছরের বাংলা নাটকের, অর্থাৎ মূলত অভিনীত বাংলা নাটকের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সর্বত্রই প্রায় একটি অরাজকতার ছবি চোখে পড়ে। গণনাট্য সংঘের সফলতা কয়েকটি নাট্যপ্রতিষ্ঠান অংশীদার হিসাবে ভাগ ভাগ করে নিয়েছেন। ১৯৫০ নাগাদ দেখা দিয়েছে আজকের গৌরবোজ্জ্বল 'বহুরূপী' সম্প্রদায়। বিজন ভট্টাচার্য প্রধানত নিজের নাটক সম্বল করে অধুনালুপ্ত 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র পত্তন করেছিলেন। শেক্স্‌পীয়র-পসরা নিয়ে 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ' দেখা দিয়েছিলেন উনিশ শো সাতচল্লিশেই, যদিও প্রথম দিকে এ দলের নাম ছিল 'Ameteur Shakespeareans'। ১৯৫৮-তে Mass Theatre বা Free Theatre-এর আদর্শে ডি. এন. মিত্র স্কোয়ারে নিবেদিতা দাসের 'শৌভনিক' গণ-রংমহলের প্রবর্তন করেন এবং ষাট সালে এ দলের 'মুক্ত-অঙ্গন' রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা হয়। সুধী প্রধান ১৯৫৭ নাগাদ 'অচলায়তন' নাট্য প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। 'বহুরূপী' ছেড়ে সবিতাব্রত দত্ত 'রূপকার' সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' এই সেদিন লুপ্ত হয়েছে, 'অচলায়তনেরও সচলতার কোনো লক্ষণ

দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু অবশিষ্ট দল কটি—অর্থাৎ 'বহুরূপী', 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ', 'শৌভনিক' এবং অধুনাখ্যাত 'রূপকার'—এদের অভিনয়ের তালিকাটি দেখলেই এই চৌদ্দ বছরে বাংলা নাটকের ভয়াবহ দৈন্যদশা চোখে পড়বে। কথাটা শুনলে অবাক লাগবে, কিন্তু আসলে এটি একটি বিপজ্জনক সত্য। 'বহুরূপী' কেবল তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক', 'ছেঁড়া তার', মন্মথ রায়ের 'ধর্মঘট', গঙ্গাপদ বসুর 'অংশীদার', শম্ভু মিত্রের 'উলুখাগড়া' এবং সাম্প্রতিক কালে অর্থহীন 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকে মাত্র সমসাময়িক নাট্যকারের শরণাপন্ন হয়েছেন। আর এঁদের বাকী নাটক? 'বিভাব' নামে সুপরিচালিত কাবুকি ধরনের নাটিকাটিকে বাদ দিলে—'চার অধ্যায়'—রবীন্দ্রনাথ ; 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে'—চেখভ ; 'দশচক্র'—ইব্‌সেন ; 'রক্তকরবী'—পুনশ্চ রবীন্দ্রনাথ ; 'পুতুল খেলা'—পুনশ্চ ইব্‌সেন ; 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন', 'রাজা'—নিরন্তররূপে রবীন্দ্রনাথ ; 'রাজা ওয়েদিপাউস'—সোফোক্লেস। লিটল থিয়েটার গ্রুপ : প্রথমে শেক্‌সপীয়র, তারপর বার্নার্ড শ ; 'রাশিয়ান কোয়েশ্চন'—আর্থার সিমনভ ; বাংলা 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস', 'ম্যাকবেথ'—শেক্‌সপীয়র ; 'অচলায়তন', 'কালের যাত্রা', 'তপতী'—রবীন্দ্রনাথ ; 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা'—মধুসূদন ; 'নীচের মহল'—গোর্কী ; 'গোষ্ট্‌স'—ইব্‌সেন ; 'গোরা', 'বাঁশরি', 'মুক্তির উপায়', 'রাজা', 'রাজা ও রানী'—রবীন্দ্রনাথ। এবং সাম্প্রতিককালে রূপকারও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন 'কালের যাত্রা' এবং অমৃতলালের 'ব্যাপিকা বিদায়' অভিনয় করে।

সহজ কথায়, প্রধান প্রধান নাটকের দলগুলিতে সমসাময়িক বাঙালী নাট্যকারের কোনো নাটক সাদরে গৃহীত হয় নি। এক, দলের পরিচালক বা দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাটক হয় তো অভিনীত হয়েছে, জনপ্রিয়ও হয়েছে, কিন্তু বাংলা নাটকের ইতিহাসে তার ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। উৎপল দত্তের 'ছায়ানট' বা 'অঙ্গার' বা 'ফেরারী ফৌজ' নাটক হিসাবে নিন্দনীয় নয়—যদিও আমার তাঁর 'ঘুম নেই' নাটকটিকে অধিক মহৎ মনে হয়—কিন্তু এইসব নাটকের অভিনয় সাফল্য বাংলা নাটকের সমুন্নতদশা সূচিত করে না। তবু উৎপল দত্ত সমসাময়িক বাংলা নাটক ধরে আছেন, হয় তো কিছু খ্যাত-অখ্যাত দল সে চেষ্টা করছে, বিজন ভট্টাচার্য নিজের নাটক নিয়েই এ চেষ্টা করেছিলেন আর করছে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ,

যাদের কোনো চেষ্টাই স্বার্থশূন্য নয় এবং নাটকের নামে লোকরঞ্জন সস্তা আবেগপ্রবণ বস্তুই যাদের একমাত্র মূলধন।

৪.

ভরতমুনির দোহাই, আমাকে কেউ এমন মনে করবেন না যে আমি সমসাময়িকের বেড়া ডিঙিয়ে তাকাতেই পারি নে, বা আমি এক ধরনের উদ্ভট কালগত chauvinism-এ ভুগছি। যাকে বলা হয় 'চিরায়ত' রচনা—সেই সব নাটক অভিনীত হওয়ার নিদারুণ পক্ষপাতী আমি। শেক্‌সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, ইব্‌সেন বারবার অভিনীত হোক, অত্যধিকভাবে অভিনীত হোক, হয় তো তাতে বাংলা নাটকের মঙ্গলই হবে। কিন্তু করুণ সত্য এই যে, হয় সমসাময়িক ভালো বাংলা নাটক শৌখিন বা পেশাদার অভিনয়কে প্রভাবিত করতে পারবে না, না-হয় শৌখিন বা পেশাদার অভিনয় সমসাময়িক ভালো বাংলা নাটকরচনাকে প্রভাবিত করতে পারছে না। অথচ ঐতিহাসিকভাবে নাটক ও নাট্যশালার পরস্পরনির্ভরতা আছে বলেই আমরা জানতাম। পেশাদার অভিনয়ের কথা ছেড়ে দিই। সেখানে দু-তিন-শো রজনীর উদ্‌যাপন একদিকে নতুন নাটকের প্রেরণা, অন্য দিকে তার সমাধিও বটে। পেশাদার মঞ্চে অলীক সফলতার আশায় ভালো নাটক শবরীর প্রতীক্ষায় থেকে এক সময় পুরানো হয়ে যায়, কারণ সাময়িকতা নাটকের একটি মস্তবড়ো সম্বল। অপেশাদার মঞ্চে যা কিছু সফলতা বেশির ভাগ অনুবাদ এবং 'adaptation',—'বিদেশী ভাবাবলম্বনে রচিত।' বিশ্বাস করুন, একপাশে রবীন্দ্রনাথ, অন্য পাশে এই অনুবাদ আর সংগ্রহণের বহুলতার মধ্য থেকে অধুনাসৃষ্ট মৌলিক বাংলা নাটক আবিষ্কার করা মুশকিল। তার উপর ইদানীংকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর নাটকগুলি পুনরুজ্জীবিত করার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। গণনাট্য-ভাঙা একটি দল 'নীল-দর্পণ' জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ মধুসূদনের প্রহসন দুটি সফলভাবে অভিনয় করলেন। রূপকার প্রতিষ্ঠিত হলেন 'ব্যাপিকা বিদায়' অভিনয় করে—চতুরঙ্গ বলে একটি দল খুব সাম্প্রতিককালে আবার ঐ অমৃতলালেরই 'বাবু' নামিয়েছেন। অমৃতলালের মধ্যে কট্টর প্রগতিবিরোধিতার সবগুলি লক্ষণ পরিপূর্ণরূপে ছিল—তাঁর নাটক এই সময় এত ব্যাপকভাবে

করার সার্থকতা কী থাকতে পারে জানি না। এ থেকে একটি দুর্ভাবনা জাগে—বিশেষ করে প্রহসনের এই জনপ্রিয়তায় এবং সাধারণ নাটকের মধ্যে relief-এর সংকীর্ণ-বেড়া-ডিঙোনো কমিকের প্লাবনে—হয় তো দর্শককে প্রস্তুত করার গুরুদায়িত্ব আমরা ভুলে যাচ্ছি। রূপকার সম্প্রতি 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'কে নাট্যরূপ দিয়ে দেখালেন। তাতে ইতিহাসের ক্রুশবিদ্ধ বেদনার চেয়ে মুচিরামের ভাঁড়ামো এবং সুযোগ-সন্ধানই বড়ো হয়ে উঠল। ফলে ব্যাপার দাঁড়াল এই যে, পরিচালকের বক্তব্য বা উদ্দেশ্য খুবই গম্ভীর ও জীবনধর্মী—কিন্তু নাটকটির পরিবেষণা বা সর্বাঙ্গীণ গতি ঐ বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমাদের সহানুভূতি জাগে মুচিরামের উপর, মানবায়িত ইতিহাস-পুরুষকে ঐ আনন্দ-আয়োজনের মধ্যে অনিমন্ত্রিত বলে মনে হয়। অবশ্য যে-সব প্রয়াস নাট্য-আন্দোলনকে সত্য-সতই আন্দোলনের উজ্জ্বলতা দেয়—তা যে একেবারে অনুপস্থিত এমন নয়। কিন্তু প্রায়শই সে সব প্রয়াস অনুবাদ বা ভাবানুবাদ। বহুরূপী আছেন, যাঁরা এক-একটি প্রয়োজনার সর্বাঙ্গীণ চরিতার্থতায় আমাদের চমকে দেন এবং দর্শকতোষণের নীতিকে যাঁরা খুব কম খাতির করে চলেন, 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' আছেন—উৎপল দত্তের বলিষ্ঠ নাটকগুলি যাঁদের সম্বল। সম্প্রতি 'বঙ্গীয় নাট্যকার পরিষদ' ইয়োনেস্কোর Rhinoceros সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অনুবাদে 'গণ্ডার' নামে অভিনয় করলেন। 'নান্দীকার' গোষ্ঠী পিরেনদেল্লোর 'Six Characters in Search of an Author'-এর ভাবানুবাদ অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেছেন। স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো' অশোক সেন অনুবাদ করেছেন এবং মাঝে মাঝেই তা অভিনীত হওয়ার সংবাদ দেখি। কিন্তু অনুবাদ—অনুবাদ—অনুবাদ। বড়ো দলগুলিকে কখনো এমন নাটক বেছে নিতে দেখি না যা একই সঙ্গে মৌলিক এবং সমকালীন, লিটল থিয়েটার গ্রুপ বা থিয়েটার সেণ্টার ছাড়া—কিন্তু তাঁরাও উৎপল দত্তের বা তরুণ রায়ের নাটকগুলির বাইরে কদাচিৎ পদার্পণ করেন।

লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রসঙ্গে আরেকটি ঝোঁকের কথা মনে এল। এই অভিনয়টিতে সার্থক নাটকের লক্ষণগুলি আছে কি না জানি না, কিন্তু উপন্যাসের নাট্যানুবাদের ঝোঁক এখনও

আগের মতোই প্রবল। গিরিশচন্দ্র ঘোষই ব্যাপারটা প্রথম শুরু করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে ধরে। এতে দোষের কিছু নেই, —যে-সব উপন্যাসে অত্যধিক নাটকীয় সম্ভাবনা আছে সেগুলিকে নাটকের সীমানার বাইরে রাখাই অনুচিত। কিন্তু এটাই তো অন্যদিকে নাট্যসাহিত্যের আত্মনির্ভরতা এবং স্বাবলম্বনের অভাব সূচিত করে। পেশাদার মঞ্চে শচীন সেনগুপ্ত কর্তৃক নাট্যানুবাদিত 'সাহেব বিবি গোলাম'-এর অভিনয় কিংবা গোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মঞ্চরূপায়িত 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর অভিনয় জনপ্রিয় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বা 'চতুরঙ্গ' বা 'ঘরে বাইরে' কখনো-কখনো অভিনীত হয়, শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী', 'রমা', 'পণ্ডিত মশাই' এখনও অফিস পাড়ায় বা মফঃস্বলে জনপ্রিয়, তারাশংকরের 'কালিন্দী' বা 'দুই পুরুষ'-তো সম্ভবত শখের অভিনয়ের সর্বাধিক গৃহীত নাটক। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাসর', 'গণশার বিয়ে', 'টনসিল'-ও চলেছে। উপন্যাসের চলচ্চিত্র-রূপায়ণের শাঁসালো সম্ভাবনার মতো নাট্যরূপায়ণের বিরুদ্ধেও আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু উপন্যাস-নাটকের মধ্যে এই মুহুর্মুহু চলাচলের ফলে নাটকের একটি সুচিহ্নিত এবং সুশাসিত সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার বাধা জন্মাচ্ছে কি না কে বলবে ?

৫.

চাই—সার্থক মৌলিক ও সমকালীন নাটক। এবং সর্বোপরি চাই শৌখিন বা পেশাদার মঞ্চে সেই সব নাটকের প্রতিষ্ঠা। উনিশ শো পঞ্চাশ থেকে চৌষট্টি—এই চৌদ্দ বছরে সেরকম নাটক কি কিছুই জন্মায় নি ? জন্মেছে। যিনি যাই বলুন, প্রথমে আমি বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে নাম করতে চাই। তাঁর 'জীয়নকন্যা' বেরিয়েছিল ১৯৪৯-এ, আর তারপর ১৯৬০-এ তাঁর একটি নাটক প্রকাশিত হল—'গোত্রান্তর'। উদ্বাস্তু মধ্য-বিত্তের শ্রেণীগত ভাঙন ও নতুন উদ্দীপনা তাঁর এই নাটকে আছে। উৎপল দত্তের নাটকগুলিতে অতি প্রয়োজনীয় একটি বলিষ্ঠতা আছে—তাঁর 'ছায়ানট', 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ' বা 'ঘুম নেই'-এ অহরহ সে প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যবিত্তের রুগ্‌ণতা তাঁকে সংক্রামিত করে নি দেখে ভালো লাগে। সলিল সেনের 'নূতন ইহুদি' ১৯৫১-তে প্রথম বেরোয়,

তারপর তিনি একে একে 'সন্ন্যাসী', 'দিশারী', 'মৌচোর' 'ডাউন ট্রেন' ইত্যাদি নাটকগুলি উপহার দেন। 'মৌচোর' এবং 'ডাউন ট্রেন' শখের অভিনয়ে বিশেষভাবে দুটি প্রিয় নাটক। সুন্দরবনের মধুসংগ্রহকারীদের রোমাঞ্চকর জীবন নিয়ে লেখা 'মৌচোর'ই সম্ভবত তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক। পরলোকগত তুলসী লাহিড়ীর নাম সর্বাগ্রে করা উচিত ছিল, কিন্তু ১৯৫০-এ প্রথম প্রকাশিত 'ছেঁড়া তার' নাটকের পর তিনি আবার লেখেন ১৯৫৯-এ—'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'। এই মর্মস্পর্শী নাটকটি একসময় জনপ্রিয় হয়েছিল। ধনঞ্জয় বৈরাগী ইতিমধ্যে অনেকগুলি নাটক লিখেছেন —তাঁর প্রায় সবগুলি নাটকই শখের দলে সমাদর লাভ করেছে। 'রূপোলী চাঁদ' সম্ভবত তাঁর প্রথম নাটক। তারপরে 'রজনীগন্ধা' বা 'এক পেয়ালা কফি' নাটকে তিনি বাঙালী কিশোরদের প্রিয় রহস্যরস আমদানী করেছেন। 'ধৃতরাষ্ট্র' ও 'আর হবে না দেরী' নাটকটি তাঁর দুটি সক্ষম রচনা। ১৯৫৪-তে একজন শক্তিশালী নাট্যকার এসেছেন—তিনি অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর 'শকুন্তলা রায়', 'নচিকেতা' উল্লেখযোগ্য রচনা। উমানাথ ভট্টাচার্য মূলত নাটকের অনুবাদ করে পরিচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর 'চার্জ সীট', 'জল', 'ফিরিঙ্গি কবি' ইত্যাদি নাটক উল্লেখযোগ্য। সুনীল দত্তের 'হরিপদ মাস্টার', 'জতুগৃহ', 'অঙ্কুর', 'ত্রিনয়ন' ইত্যাদি নাটক খ্যাতি লাভ করেছে। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁর নামের চতুষ্পার্শ্বে গণনাট্যের গৌরবযুগের উজ্জ্বল জ্যোতিঃরেখা বর্তমান—তাঁর সদ্যতন কোনো নাটক উল্লেখযোগ্য নয়—একথা বেদনার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। কিন্তু তাঁর 'বাস্তুভিটা', 'মশাল', 'তরঙ্গ' বা 'গোলটেবিল' আমাদের আলোচ্য পর্বের গোড়ার দিককার অন্যতম সফল কয়েকটি নাটক। 'মশাল' নাটকটিতো অবিস্মরণীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিল। ১৯৫২-তে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় 'কেরাণীর জীবন'-এ যে সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর পরবর্তী 'চোর' এবং 'স্ট্রীট বেগার' নাটক দুটিতে সে-সম্ভাবনা নিষ্প্রভতর বা উজ্জ্বলতর হয় নি —এই বলতে হয়। জোছন দস্তিদার নিচুতলার জীবন নিয়ে দুটি উল্লেখযোগ্য নাটক লিখেছেন, তার মধ্যে 'দুই মহল' নাটকটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। আর একটির নাম 'স্বর্ণগ্রন্থি'। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীও নাট্যকাররূপে প্রখ্যাত হয়েছেন তাঁর 'সকাল-সন্ধ্যার নাটক'-

এর জন্য। তা ছাড়া তিনি বঙ্গীয় নাট্যকার পরিষদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। অনুবাদক হিসাবে তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত অগ্রণী—সার্ত্রের Men without Shadows (ইংরেজি অনুবাদের নাম) তিনি 'ছায়াবিহীন' নামে অনুবাদ করেছেন। ইয়োনেস্কো থেকে গৃহীত 'গণ্ডার' নাটকটির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার কিরণ মৈত্র অনেকগুলি নাটক লিখেছেন, তাঁর একটি নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্যের দ্বারা বর্ধিত হয়ে পেশাদার নাট্যমঞ্চে দীর্ঘস্থায়িতার রেকর্ড করেছে। কিন্তু বর্তমান সমালোচক তাঁর নাটকগুলি থেকে এমন কোনো উল্লেখযোগ্যতা আবিষ্কার করতে পারেন নি। বীরু মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধেও কমবেশি একই কথা বলা যায়। তাঁর 'সংক্রান্তি' বা 'দ্বান্দ্বিক' জনপ্রিয় হয়েছে—কিন্তু সেগুলি নবনাট্য আন্দোলনের সফলতার স্বাক্ষর বলে মেনে নিতে আমি নারাজ। বরং 'রাহুমুক্ত' যাত্রার পালাটির জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁর সাম্প্রতিক নাটক 'বন্দর' আমি দেখি নি। পৃথ্বীশ সরকার 'লবণাক্ত' নাটকটির দ্বারা পরিচিতিলাভ করেছেন, কিন্তু এ নাটকও অবিস্মরণীয় কিছু হয় নি। তা ছাড়া অজস্র নাট্যকার আছেন যাঁরা অসংখ্য নাটক লিখেছেন, যে নাটকগুলি শৌখিনদের দ্বারা দু-একবার করে অভিনীতও হয়ে চলেছে। একটি দুটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা-সম্বল নাটক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যেমন—সত্যেন্দ্র সিংহের 'মনোবৈজ্ঞানিক' (১৯৫২), বা ইদানীন্তন সুধাংশু দাশগুপ্তের প্রত্নতত্ত্ব-নির্ভর নাটক 'সোমপুরা থেকে শোনপুর'। একজন রহস্য-উপন্যাস লেখকের একটি বিকৃতদেহ নায়কনির্ভর নাটক (পুরানো 'হাঞ্চব্যাক্'-এর ফর্মূলা) পেশাদার মঞ্চে জনপ্রিয় হওয়ায় আরো দু একটি এ ধরনের নাটক অভিনীত হয়—সন্তোষ সেন বিরচিত 'এরাও মানুষ' তার মধ্যে একটি। সম্ভবত 'এই সত্যি' নামে এটি 'মিনার্ভা' মঞ্চে একসময় অভিনীত হয়েছিল, এবং সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়গুণে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

পূর্বতন নাট্যকাদের—যাঁরা নবনাট্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন—কিছু কিছু নাটক এই সময়পর্বের মধ্যে বেরিয়েছে, কিন্তু সেগুলির খুব অভিনীত হওয়ার সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'তুষারকণা' ১৯৫১-তে বেরিয়েছে এবং তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'সবার

উপরে মানুষ সত্য' বেরিয়েছে ১৯৫৭-তে। এ নাটকটির অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয়। শচীন্দ্রনাথ নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মন্মথ রায় সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। তাঁর পুরানো একাঙ্কিকা-গুলির একটি চমৎকার নতুন সংস্করণ সেদিন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬০-এ প্রকাশিত 'অমৃত অতীত' নাটকটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক নাটক, অভিনয়েও এটি সমাদৃত হয়েছে। বিধায়ক ভট্টাচার্য অসংখ্য নাটক লিখেছেন, কিন্তু তাঁর নাটকগুলি দিন দিন সস্তা মনোরঞ্জনের দিকে ঝুঁকেছে। তা ছাড়া সাহিত্য পত্রিকার বিজ্ঞাপনের পাতা খুললে অসংখ্য নাট্যকারের উপস্থিতির আঁচ পাওয়া যায়—কিন্তু তাঁদের রচনার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নই বলে সবিনয়ে অক্ষমতা জ্ঞাপন করছি। শম্ভু ভদ্র বা মাধব রায় দুজন নাট্যকার—যাঁদের কোনো নাটক আমি দেখি নি। গিরিশংকর একাঙ্ক লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। চিত্তরঞ্জন ঘোষও একজন প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার। তাঁর 'ডিরোজিয়ো' নাটকটি একটি উল্লেখযোগ্য বাংলা জীবনী নাটক। হরিপদ বসু, অজয়কুমার চক্রবর্তী, নন্দগোপাল রায়চৌধুরী, পরেশ ধর, শৈলেন গুহ নিয়োগী, প্রশান্ত চৌধুরী বা জ্ঞানেন্দ্র নাথ চৌধুরীর নাটকও অল্পবিস্তর অভিনীত হয়েছে।

তা ছাড়া যাঁরা উপন্যাস ও নাটকের ক্ষেত্রে উভচর—তাঁদেরও অনেকের নাটক এই সময়ের মধ্যে বেরিয়েছে। ঠিক ১৯৫০-এই বেরিয়েছে তারাশংকরের 'দ্বীপান্তর'। এটি অভিনয়সাফল্যও উপার্জন করেছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাটকগুলির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকগুলি অভিনয়ে সবসময় চিত্তাকর্ষক, তাছাড়া তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলিও নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ বলে প্রায়ই নাট্যরূপে অভিনীত হয়। তাঁর 'বহ্নিপতঙ্গ' বেরিয়েছে ১৯৫৯-এ, কিন্তু তাঁর উপন্যাস বা গল্পগুলিকে শৌখিনদল নিজেরাই প্রায় নাট্যরূপ দিয়ে থাকেন। 'চুয়াচন্দন' অভিনয়ের কথা আমি জানি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাম-মোহন' (১৯৫২) বাংলা জীবনী-নাটকগুলিকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর 'ভাড়াটে চাই' এবং 'বারো ভূতে' নাটক দুটি অভিনয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'তখত-এ-তাউস'-এর পর আর কোনো নাটক বেরোয় নি—এটি শ্রীরঙ্গম মঞ্চের নির্বাপণের শেষ

পর্বারে অভিনীত হয়েছিল কিছুদিন ধরে। অন্নদাশংকরের 'চতুরালি'ও (১৯৫৬) অভিনয়ের কোনো খবর আমি জানি না। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উটরোগ' নামে কৌতুক নাটিকাটিও সমাদর লাভ করেছে। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, গজেন্দ্রকুমার মিত্র (বিধিলিপি—১৯৬০) প্রভৃতির নাটকও এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। মনোজ বসুর নাট্যকার হিসাবে স্বতন্ত্র মর্যাদাই আছে। তাঁর 'শেষ লগ্ন' আর 'বিলাসকুঞ্জ বোর্ডিং বেরিয়েছে ১৯৫৬তে। এ দুটি নাটক অভিনয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। শীতাংশু মৈত্রের নাটক পাই 'ঐতিহাসিক শ্যালক'। জ্যোতির্ময় ঘোষের 'কলের গন্ধ', বরেন বসুর 'নতুন ফৌজ'।

৬.

যার সমাদর এবং প্রাচুর্য সবচেয়ে বেশি—তা ঐ অনুবাদ এবং ভাবানুবাদ। উৎপল দত্ত Doll's House 'পুতুল খেলা" নামে ১৯৫৮-তে অনুবাদ করেছিলেন, শম্ভু মিত্রও একই নামের অনুবাদ বহুরূপীর অবিস্মরণীয় অভিনয়ে গ্রহণ করেছিলেন। এটা দেখা গেছে যে যাঁরা অভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত তাঁদের অনুবাদ আশ্চর্য সহজ, জীবন্ত ও স্বচ্ছ হয়। শম্ভু মিত্রের প্রত্যেকটি অনুবাদে তার পরিচয় আছে —'পুতুল খেলা' বা 'দশচক্র' বা 'রাজা ওয়েদিপাউস'-এ। উৎপল দত্তের শ'বা সেক্স্‌পীয়রের অনুবাদেও। শেষোক্তজনের ভাষা মাঝে মাঝে একটু প্রাকৃত হতে চায়, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ধারণায় ঐ লৌকিক ভাষা ব্যবহারে নাটকের সজীবতা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন'-তে তিনি চমৎকার কাব্যভাষার প্রয়োগ করেছেন। উমানাথ ভট্টাচার্য একজন স্মরণীয় অনুবাদক। তাঁর 'নীচের মহল' গোর্কীর 'Lower Depths' থেকে গৃহীত, 'শেষ সংবাদ' (১৩৬৭ সন) রুমানিয়ার নাট্যকার মিহাইল সেবাস্তিয়ানের Stop News নাটকের অনুবাদ। দুটি অনুবাদই স্বচ্ছন্দ ও সহজে অভিনেয়। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় অনুবাদক-নাট্যকার রূপেই বোধ হয় বেশি জনপ্রিয়। তাঁর ডস্টয়েভস্কি অবলম্বনে 'নির্বোধ' এবং বেকেটের The Inspector Calls অনুসরণে লেখা 'থানা থেকে আসছি" শৌখিন অভিনয়ের অন্যতম বাঞ্ছিত নাটক। 'আকাশবিহঙ্গী' (চেখভের The Sea Gull) কিন্তু তেমন জনপ্রিয় হয় নি। পরেশ ধরের 'ভাঙাভাঙা

পাখী' (১৯৮০) ইবসেনের The Wild Duck থেকে নেওয়া। সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর 'ছায়াবিহীন' এবং 'গণ্ডার'-এর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এর মধ্যে সংবর্ধিত হয়েছে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অনুবাদ 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'—যার উৎস পিরেনদেল্লোর 'Six Characters in Search of an Author'। জ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত অনুবাদ করেছেন 'Electra'। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের রমণীয় অনুবাদ 'আন্তেগোনে' সাহিত্য আকাদমির ধূসর প্রকাশনায় নির্বাসিত হয়ে আছে। ইব্‌সেনের গোস্ট্‌স্‌ 'বিদেহী' নামে শম্ভু মিত্রই অনুবাদ করেছিলেন।

৭.

নাটকের অগ্রগতি যাতে বোঝা যায়, অথচ যে ধরণের নাটক দর্শকমহলে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অভ্যর্থনা পায়—সেই কাব্য-সংকেত-প্রতীক নাট্যের প্রয়োজনা বা রচনা এই কালে কিছু হয়েছে। দিলীপ রায়ের 'একটি নায়ক' এ ধরনের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। দেবকুমার বসুর 'ব্রিজ' এক সময় রবীন্দ্র-ভারতীর সাহিত্য মেলায় অভিনীত হয়েছিল। পরে রাম বসুর 'নীলকণ্ঠ' ও 'রাজকীয় পদশব্দগুলি' অভিনয়ে আনন্দিত অভিনন্দন লাভ করেছে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'অন্ধকার বারান্দা' এখনও অভিনীত হয় নি। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'মহাকাব্য' নামে একটি প্রতীকী নাটক আছে। কৃষ্ণ ধর কাব্যনাট্য লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। খুব সম্প্রতি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'উত্তরমেঘ' ও আলোক সরকারের 'অশথগাছ' নামে দুটি কাব্যনাট্য অভিনীত হয়ে প্রশংসা পেয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে একাঙ্কের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বা আরো বিস্তৃতভাবে কাব্যনাট্য লেখার প্রয়াসে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' একটি বরণীয় রচনা।

ছোটোদের নাটক তেমন কিছুই হয় নি। অখিল নিয়োগী তাঁর জীবিকার অনুসরণে 'প্রথম পুরস্কার' ও 'প্রতিশোধ' নামে দুটি নীতি উপদেশাত্মক নাটক লিখেছিলেন, তা এককালে ছেলেরা খুব অভিনয় করত। দেব সাহিত্য কুটির থেকে একগাদা শিশুনাটক প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উটরোগ' বা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বারো ভূতে' ছেলেরা

অভিনয় করে—কিন্তু আমায় এখনও সুনির্মল বসুর 'কিপ্টে ঠাকুর্দা', 'শহুরে মামা', 'বীর শিকারী' ইত্যাদি অবিস্মরণীয় নাটকের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ইচ্ছে হয়। মৌমাছির রূপকথাধর্মী 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' ইদানীং সু-অভিনীত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। 'সবুজসাথী' কিছু শিশু-নাটক লিখেছেন।

৮.

তা ছাড়া পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত আকারে অনেকের নাটক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভবেন্দু ভট্টাচার্য, সুকৃতি রায়চৌধুরী, অতনু সর্বাধিকারী, মনোজ মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে প্রত্যাশার সঙ্গে উচ্চারণ করা চলে।

৯.

যা দেখা গেল, তাতে পাঠকেরা প্রত্যাশী হতে পারেন বা হতাশ হতে পারেন—কিন্তু যা-ই হোন, নিজের দায়িত্বে হবেন, এইটুকু প্রার্থনা।

পূর্ব-পাকিস্তানের নাটক

রাজিয়া খাতুন চৌধুরী

পাক-ভারতের নাটকের ঐতিহ্য খুব বেশী দিনের নয়। বাংলা নাটকের চূড়ান্ত উন্নতি আমরা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। এবং এর শুরু সম্ভবত মাইকেলের সময় থেকে। মাইকেল, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু, জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি বংলা নাটকের উন্মেষ পর্বের দিকপাল। দ্বিতীয় পর্বে রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। তৃতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ ও চতুর্থ পর্বে রবীন্দ্র পরবর্তী নাট্যকার সম্প্রদায়।

পূর্ব-পাকিস্তানের নাটক-আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। মুসলমান সমাজ ধর্মীয় কারণে নাটকের খুব ভক্ত ছিলেন না। তাই পাক-ভারতের যে শত শত নাট্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেখানে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমান নাট্যকারদের সংখ্যা আশাতীত কম। আযাদী পূর্ব-কালের নাটকের বিষয় বস্তুও ছিল একঘেঁয়ে, প্রাসঙ্গিক কারণে দুর্বল অথচ জনপ্রিয়।

নাটক সম্পর্কে এখন নানা আলোচনা হচ্ছে। আমরা অনেক বলা-বলি করছি। কিন্তু এই কথা বলার মধ্যে প্রায়শই কোন স্পষ্টতা নেই। অভিনেতা বলেন নাট্যকার নেই, অভিনয়যোগ্য 'সত্যিকার' নাটক লেখার মত নাট্যকারের অভাব। নাট্যকার বলেন—লিখব কী করে রঙ্গালয় কই। রচিত নাটক মঞ্চস্থ না হলে নাটক রচনার প্রেরণা আসবে কেন! একথা মানি। দেশ, সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা। নিজ নিজ ধারণা ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে নানাজন নানাবিধ আলোচনান্তে ব্যাপারটিকে এমন ধূসর করে রেখেছেন যেন মনে হয়: পূর্ব-পাকিস্তানে নাটকের স্থান নেই, এখানে নাটকের সম্ভাবনা নেই। তাই তথ্যে আসাই ভাল। তথ্য সংগ্রহ করলে স্পষ্ট

হবে যে গত এক দশকে পাক-বাংলায় প্রচুর পরিমাণে বাংলা নাটক রচিত হয়েছে ও হচ্ছে। একটু সচেতন দৃষ্টি মেললেই দেখা যাবে যে, আযাদী উত্তরকালে পূর্ব-পাকিস্তানের নাটকের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন: সামাজিক নাটকের বিস্তার। আযাদী-পূর্বকালে যে ঐতিহাসিক নাটকের প্রাধান্য ছিল আযাদী-উত্তরকালে তা লক্ষণীয় ভাবে কমে গিয়ে বিগত এক দশকে সামাজিক নাটকের মাত্রা প্রায় চারগুণ বেড়ে গেছে। এবং নাট্য রচনার উৎসাহ বেড়েছে প্রায় সাতগুণ* নাটক রচনায় দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকের নানাবিধ পরিবর্তনও দেখা দিয়েছে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ জীবনে মধ্যযুগীয় আরাম-আয়েশ বর্তমান যুগে কল্পনা করাই যায় না। পূর্ব-পাকিস্তানে নাটক রচনা ও প্রয়োজনার ক্ষেত্রে যারা নতুনত্ব আনতে সচেষ্ট তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য নাম: নূরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, ফররুখ আহ্‌মদ, শাহাদাৎ হোসেন, সিকান্দর আবু জাফর, ইব্রাহিম খাঁ প্রভৃতি। ঢাকার ড্রামা সার্কেল, বাঙ্‌লা একাডেমী, পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিল, সাতরঙ নাট্য সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহ পূর্ব-পাকিস্তানের নাটক সমুন্নত করতে বদ্ধ-পরিকর। আমরা নিম্নে আযাদী-উত্তরকালের পাকিস্তানী নাট্যকার ও নাটকের একটা তালিকা পেশ করছি। বলাবাহুল্য, এ তালিকায় আমরা শুধুমাত্র সামাজিক নাটকেরই উল্লেখ করেছি এবং ঐতিহাসিক বা অন্যান্য নাটকের আলোচনা উহ্য রেখেছি: আজীম উদ্দীন আহমদ 'কার দোষে?' আবু যোহানুর আহমেদ 'তামাসা' 'আগামী দিন', আবুল হাশেম 'মাষ্টার সাহেব', আবদুল ওয়াহেদ 'আঁধারে আলো', আবদুল মতিন 'অভ্যুদয়', জব্বার খাঁ 'জাগলো দেশ', 'প্রতিজ্ঞা', জব্বার চৌধুরী 'পাশাপাশি', আবদুল মাজেদ তালুকদার 'প্রতিজ্ঞা', আবদুর রহিম আখন্দ 'কার ভুলে', আবদুল হক্ 'অদ্বিতীয়া', আবদুল হাই মাশরেকী 'সাঁকো', আশরাফ উজ জামান খান 'সয়লাব', আসকার ইবনে শাইখ 'বিরোধ', 'পদক্ষেপ', 'বিদ্রোহী পদ্মা', 'অনুবর্তন', 'বিল', 'এপার ওপার', আলাউদ্দীন আল আজাদ 'ইহুদির মেয়ে', আলী মনসুর 'পোড়ো বাড়ী', 'বোবা মানুষ', ইব্রাহিম খাঁ 'ঋণ পরিশোধ', 'কাফেলা', বসিরউদ্দিন 'সংশোধন', 'বিচিত্রানুষ্ঠান', এম. এ. আজম 'গাঁয়ের মেয়ে', এম. এ. হাসেম

* সম্প্রতি বাঙলা একাডেমী পরিচালিত এক সমীক্ষায় এ তথ্য জানা গেছে।

খান 'দেশের দাবী', ওবায়েদুল হক 'এই পার্কে', চোরাকারবার', 'ভোট ভিখারী', 'দিগ্বিজয়ী' যোগেশচন্দ্র নাথ 'গণজাগরণ', 'আবর্ত' মোযহারুল ইসলাম 'বিচার', 'অগ্নিস্নান', 'কবি সমাচার', মোজাহার হোসেন 'জালিম', মোহাম্মদ ইউসুফ 'মেঘনা, মুনীর চৌধুরী 'রক্তাক্ত প্রান্তর', রাজিয়া খান 'আবর্ত', শওকত ওসমান 'কাঁকরমণি', 'এতিমখানা', 'তস্কর লস্কর', জসীমুদ্দীন 'পল্লীবধূ', ওহীদুল আলম 'কালুয়া', কবির চৌধুরী 'আহ্বান', কোবাদ আলী 'আমার দেশ', খলিল আহ্মদ 'উপেক্ষিতা', নুরুল মোমেন 'নয়া খান্দান', 'নেমেসিস', 'যদি এমন হোত', প্রসাদ বিশ্বাস 'অবিচার', 'পাকারাস্তা', ফররুক আহমদ 'নৌফেল ও হাতেম, ফররুখ শিয়ার 'ব্লাক মার্কেট', 'সামনের পৃথিবী' শফিকুল কবীর 'জীবন সংগ্রাম', শাহাদাত আলি খান 'ছোট মা', 'ভুল', সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ 'বহিপীর', সাইমুম 'জাহান্নাম' প্রভৃতি, এই নাটকগুলোর সকলের মান এক রকম নয় যা উল্লেখের দাবি রাখে না। খুব একটা উঁচু মানের নাটক পূর্ব পাকিস্তানে এ যাবৎ দেখা যায় নি, যা লজ্জার কথা হলেও স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আযাদীর পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের তরুণেরা খুব একটা নাটক সচেতন ছিলেন না। অভিজ্ঞ ছিলেন না। নাটক সম্পর্কে তাঁদের ধ্যান-ধারণা এসেছে যাত্রা, অপেরা ও আবেগপ্রধান পৌরাণিক-ঐতিহাসিক নাটকের নিকট থেকে। গ্রামে গ্রামে বাঁশ কাঠে তৈরী মঞ্চ, শাড়ী-ঝোলানো উইংস, বিয়ের পাল্কী জড়ানো শাদা লাল পর্দার দৃশ্য প্রভৃতি ছিল উপকরণ। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের নাটক সম্পর্কিত আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে যে এই দেশটি সবে নাটকের দিকে পা দিয়েছে, পনের-ষোল বৎসরের অভিজ্ঞতায় কোন ঐতিহ্য গড়ে তুলতে পারে নি, তাই মার্লো শেক্‌স্‌পিয়র শ' গিরিশচন্দ্রের তো নাটক রচনা শাহাদাৎ হোসেন, ইব্রাহিম খাঁর নিকট আশা করা যায় না। আলাউদ্দীন আল আজাদের 'মরক্কোর যাদুকর' এবং আবু জাফর সামসুদ্দিনের 'শনিগ্রহ ও পৃথিবী' কল্পনার মুক্তি-বিস্তারী নাটক।

শাহাদাৎ হোসেন মুখ্যত ঐতিহাসিক নাট্যকার। তাঁর 'সরফরাজ খাঁ', 'নবাব আলীবর্দী', 'মসনদের মোহ', 'আনারকলি' এখনও অদ্ভুত জনপ্রিয়। কাজী নজরুল ইসলামের 'আলেয়া ও ঝিলিমিলি', মন্মথ

রায়ের লোক-কাহিনী ভিত্তিক 'মহুয়া', অন্নদামোহন বাগচীর 'মসনদ', পরেশপ্রসন্ন সেনের 'তপস্বিণী এবং শওকত ওসমানের 'বাগদাদের কবি' বিশেষ জনপ্রিয়।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, পাক-ভারতের বাংলা নাটকের বয়স একশ বছরের কিছু বেশী। পাক-ভারতে হিন্দুরাজাদের আমলে নাটকের খুব প্রসার হয়েছিল। সংস্কৃত নাটকসমূহ যার প্রমাণ। মুসলমান আমলে নাটক ও রঙ্গালয়ের অবলোপ ঘটে। এই সময় থেকে জনসাধারণের নাট্যরস পিপাসা মেটায় যাত্রা। যাত্রার প্রসার সম্ভবত চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই হয়। উনিশ শতকের গোড়ায় পাশ্চাত্য রঙ্গালয়ের অনুকরণে পাক্-ভারতে রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্যকারদের সম্মুখে হিন্দু নাট্যকারদের আদর্শ ব্যতীত ইউরোপ-আমেরিকার নাট্যকারদের আদর্শ রয়েছে। পূর্বে এক একটি নাটক দেশব্যাপী যে চাঞ্চল্য তরঙ্গ সৃষ্টি করে তুলত, দর্শকদের চিন্তা-জগৎ, কর্ম-জগৎ আচ্ছন্ন করে ফেলত—সেরূপ নাটক না দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে, না দেখা যাচ্ছে পূর্ব-পাকিস্তানে। 'নীল-দর্পণ' 'চৈতন্য লীলা' বা 'প্রহ্লাদ চরিত্রের' মত জনপ্রিয় নাটক এ যাবৎ পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি করতে পারে নি। অথচ একথা সকলেই জানেন যে সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও জটিল সমস্যার অবতারণার পক্ষে নাটক গল্প, কবিতা বা উপন্যাসের সমকক্ষ নয়। জেম্‌স্‌ জয়েস অথবা ভার্জিনিয়া উলফের ন্যায় ঔপন্যাসিকেরাও কখনই নাটকের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে পারতেন না।

নাটক প্রধানতঃ রঙ্গালয়ের চাহিদা অনুসারে লিখিত হয়। রঙ্গালয়ের চাহিদা অনুযায়ী নাটকের রূপ গড়ে ওঠে। ভারতে একদিন ছিল যখন রঙ্গালয়ের চাহিদা মেটাতে পারে তেমন যথেষ্ট সংখ্যক নাটক ছিল না, বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তান এই অসুবিধা ভোগ করছে। পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্যকারগণ নাটকের সমস্যা মেটাবার প্রচেষ্টা করলেও খুব একটা কার্যকরী হচ্ছেনা না। অবশ্য, এতৎসত্ত্বেও লক্ষণীয় যে, বহু নাটক রচিত হচ্ছে, কিন্তু সমস্ত নাটকই মঞ্চস্থ হবার সৌভাগ্য অর্জন করছে না, যদিও নাটকের চাহিদা আছে প্রচুর। অর্থাৎ রঙ্গালয় বা দর্শক যে ধরণের নাটক চায়—নাট্যকার সে আলোক সঙ্গে তাল দিতে পারছেন না

প্রায়শই, আর তাই-ই নাটকও জনপ্রিয় হচ্ছে না।

পূর্বোল্লিখিত নাটকের তালিকা প্রমাণ করবে যে, আযাদী-উত্তরকালে আমাদের নাটক রচনার উৎসাহ-উদ্দীপনা বেড়ে চলেছে। এবং নাটকে নতুন চিন্তা ও আঙ্গিকেরও পরিচয় মিলছে। আমাদের প্রকাশিত নাটকের অধিকাংশই আঙ্গিক, অভিনয় ও মঞ্চরীতির ক্ষেত্রে পুরাতন। দেশের অত্যাচার, অবিচার, ঘুষখোর, মুনাফাখোর, সাম্প্রদায়িকতা, মামলাবাজ, ফতোয়াবাজ, নিরপরাধী ব্যক্তি-জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সাম্প্রতিক নাটকের বেশ কিছু অংশ জুড়ে তাই নায়ককে দেখা যায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। কিন্তু তথাপি যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

পূর্ব-পাকিস্তানের নাট্য-আন্দোলনের প্রমাণ নাট্যকর্মীর বিভিন্ন প্রচেষ্টা। সৈয়দ আলী আহ্‌সানের "কোরবানী" "জোহরা ও মুশতারী" এবং "জুলায় খাঁ" নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষায় প্রোজ্জ্বল। তিনি জাপানের 'নো প্লে'র সঙ্গে সুপরিচিত ও তাঁর রচনায় সে আঙ্গিক লক্ষণীয়। 'নো প্লে' মূলতঃ একটি বিশেষ মঞ্চ ব্যবস্থায় সঙ্গীতের আবহের মধ্যে প্রকাশিত একটি কাব্য। মুনীর চৌধুরীর 'কবর' এবং সিকান্দার আবু জাফরের 'শকুন্ত উপাখ্যান', সাইদ আহ্‌মদের 'কালবেলা' নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষায় উজ্জ্বল। দীর্ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দে ফররুখ আহমদের কাব্যনাটক 'নৌফেল ও হাতেম' এক অভিযাত্রীক প্রচেষ্টা। সৈয়দ আলী আহসান 'ইডিপাস রেক্স'-এর অনুবাদ করেছেন। মুনীর চৌধুরী আর্থার মিলার ও বার্ণাড শ'র নাটকের অনুবাদে দক্ষতা দেখিয়েছেন। তা ছাড়া আরও অনেকে অনুবাদে হাত পাকাতে সচেষ্ট।

পূর্ব-পাকিস্তানে যাঁরা নাটককে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন তাঁদের মধ্যে বাঙলা একাডেমী উল্লেখযোগ্য। একাডেমীর তত্ত্বাবধানে একটি রঙ্গালয়ও আছে। জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরোর সহায়তায় কিছু নাটক প্রকাশিত হচ্ছে। ড্রামা সিজন কমিটি, পাকিস্তান আর্ট-কাউন্সিল প্রভৃতির দানও আমাদের নাট্য আন্দোলনে যথেষ্ট। একথা উল্লেখের দাবী রাখে না যে নাট্যশালা একদিকে যেমন ব্যবসার স্থান তেমনি অপর দিকে শিল্প সাধনারও কেন্দ্র। রঙ্গালয় দেশের জাতীয় সম্পদ। দেশের ভাবনা চিন্তা, আশা আকাঙ্খার রূপায়ন হয় রঙ্গালয়ে। রঙ্গালয়ের

মাধ্যমেই জাতির যথার্থ পরিচয় পরিস্ফুট হয়, সুতরাং রঙ্গালয়কে রক্ষা ও পোষণ করা জাতির সর্বসাধারণের কর্তব্য। এই কর্তব্যবোধটি সম্প্রতি পূর্ব-পাকিস্তানীদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। তাই আশা করা যায়, অচিরেই পূর্ব-পাকিস্তান নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে একটি উল্লেখ-যোগ্য আসন করে নিতে পারবে। স্মরণীয় যে, পূর্ব-পাকিস্তানীদের নাটকের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে নাটক দেখে। কাজেই নাটক রচনা করে তার অভিনয়ের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত। এ কথা সবারই জানা যে, মীর মুশারাফ হোসেন নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু তা অভিনীত হয়েছিল কি না, জানা যায় না। খুব সম্প্রতি এখানে নাট্য যুগের আরম্ভ হয়েছে। পরিণতি আসার এখনও অনেক দেরী। রাষ্ট্রীয় ও যুগ পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবন ও মননে যে স্বাভাবিক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে এখানকার নাট্য সাহিত্যেও তার ছোঁয়াচ লেগেছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের শিশু-সাহিত্য

কাজী ফেরদৌস খান

শিশু-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যাকে দেশের সম্মুখে তুলে ধরতে কুমিল্লার 'ভিলেজ এইড একাডেমী'র অগ্রণী ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৬২ সনের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত 'শিশু-সাহিত্য সম্মেলনে' পূর্ব-পাকিস্তানের বহু সংখ্যক সাহিত্যিক ও প্রকাশক জমায়েৎ হয়েছিলেন। এই সম্মেলনের বিবরণী ও প্রবন্ধাবলীর একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে যা পূর্ব-পাকিস্তানের শিশু-সাহিত্য সম্পর্কিত তথ্য ও চিন্তার দর্পণ। এই বছরেরই মধ্যভাগে সরকারের পুর্নগঠন দপ্তরের সহযোগিতায় শিশু-সাহিত্যের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সেমিনারের ব্যবস্থা করেন বাংলা একাডেমী। তারপর থেকে এযাবৎ অর্থাৎ দু'বছরের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের নানা স্থানে ছোট বড় অন্ততঃ দ্বাদশটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে—বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিং, চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানে। সম্প্রতি 'পূর্ব-পাকিস্তানের পনের বছরের শিশু-সাহিত্য'-এর একটি নমুনা জরিপ পরিচালনা করেছেন সরদার ফজলুল করিম। যাঁকে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন সৈয়দ আলী আহসান, সাহায্য করেছেন, সরদার জয়েনউদ্দীন, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, রেজাউর রহমান প্রভৃতি।

১৯৬১ সনের আদমসুমারীর বিশ্লেষণানুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তানের আয়তন ৫৪,০০০ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা পাঁচ কোটি চুরাশি লক্ষ। শিক্ষার সাধারণ হার ১৭.৬, শিক্ষিতের সংখ্যা বিশ্লেষণে প্রকাশ যে, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিতের সংখ্যা হচ্ছে ছাপ্পান্ন লক্ষ এবং ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিতের সংখ্যা চৌদ্দ লক্ষ। ম্যাট্রিক মানের শিক্ষিতের সংখ্যা দু' লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার, ম্যাট্রিকোর্ধ কিন্তু ডিগ্রী মানের নীচ পর্যন্ত শিক্ষিত বায়ান্ন হাজার ও ডিগ্রী এবং ডিগ্রী

উত্তর পর্যায়ে শিক্ষিতের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ হাজার। এই বৃহৎ জনসমষ্টির তুলনায় আযাদী উত্তরকালে শিশু ও কিশোরদের জন্য সাহিত্যধর্মী যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৩ সন পর্যন্ত তার একটি তালিকা উধৃত করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এই তালিকায় শিশু ও কিশোরদের জন্য রচিত সমগ্র সাহিত্য কর্মকেই প্রযুক্ত করা হয়েছে; কিন্তু পাঠশালা, মক্তব কিংবা মাদ্রাসা ও স্কুলের পাঠ্যপুস্তক সমূহকে ধরা হয় নি। পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয় হিসেবে শিশু ও কিশোরদের আনন্দ এবং কল্পনার চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে এ কয় বৎসরে সে সমস্ত শিশু-সাহিত্য কর্ম সৃষ্টি হয়েছে নিম্নের তালিকায় শুধু তাদেরকেই ধরা হয়েছে:

বৎসর	শিশু-সাহিত্যের মোট সংখ্যা	শিশু-সাহিত্যে জীবনী	শিশু-সাহিত্যে রহস্যোপন্যাস	অন্যান্য
১৯৪৮	১৬	১০	০	৬
১৯৪৯	২৭	১২	২	১৩
১৯৫০	১২	৭	০	৫
১৯৫১	২৭	১৯	১	৭
১৯৫২	৫০	২৭	৩	২০
১৯৫৩	১৩	৫	৩	৫
১৯৫৪	১৫	৪	৮	৩
১৯৫৫	৭৩	৮	১৫	৫০
১৯৫৬	৬৫	১১	২৬	২৮
১৯৫৭	৪৮	৭	১২	২৯
১৯৫৮	৯৯	১১	৪৭	৪১
১৯৫৯	১০৩	৯	২৬	৬৮
১৯৬০	৭৩	১০	১০	৫৩
১৯৬১	৬৮	২২	১৩	৩৩
*১৯৬২	৪৭	১৮	৫	২৪
**১৯৬৩	৪৫	২২	৭	১৬
মোট	৭৮১	২০২	১৭৮	৪০১

* পূর্ব-পাকিস্তানের পনের বছরের শিশু সাহিত্যের জরিপ।

** রেজিস্টার অব পাবলিকেশনস ও সরকারী গেজেট থেকে গৃহীত।

এই তালিকাদৃষ্টে স্পষ্টই বোঝা যায় যে শিশু-সাহিত্যের চাহিদা ক্রমাগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে। উপরের তালিকায় সব রকম শিশু-সাহিত্যকেই স্থান দেওয়া হয়েছে, রচনাগুণ কিংবা সৌন্দর্য প্রকাশের দিকে নজর দেওয়া হয় নি।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, শিশু ও কিশোরদের রচনাকে বয়সানুক্রমে অধিকতর উপযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত করার জন্য ঢাকার বাংলা একাডেমী শিশু-সাহিত্যকে নিম্নোক্ত তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন :

স্তর	বয়স	বিষয়
প্রথম—	৩-৭—	অর্থহীন ঘুমপাড়ানী গান, কবিতা, ছড়া।
দ্বিতীয়—	৮-১২—	রূপকথা, অভিযানের কাহিনী, জীবনী, ছোটদের নাটক, বিদেশী গল্পের অনুবাদ এবং পারিপার্শ্বিক জ্ঞান।
তৃতীয়—	১২-১৬—	অভিযানের কাহিনী, বিজ্ঞান রহস্যোপন্যাস, কবিতা, জীবনী, মানব সভ্যতার ইতিহাস এবং মনোহর ভৌগলিক জ্ঞান।

বলাবাহুল্য, নাটক, উপন্যাস বা কাহিনী সমস্ত রকম বইকেই উপরের স্তর-পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে এবং বাঙলা একাডেমী সম্প্রতি এই স্তর বিন্যাস অবলম্বন করে একখানি ছড়ার বই ও একখানি শিশু-নাটক রচনা করে শিশু-কিশোরদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এতদ্ব্যতীত শিশু-সাহিত্যের উপর উত্তম রচনায় উৎসাহ দানের জন্যে বাঙলা একাডেমী একটি বাৎসরিক প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করেছেন। এই ধরণের প্রচেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগেও অনুষ্ঠিত হয় বলে শুনেছি। প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাণীপুরে যে শিশু-সাহিত্যিক-দের শিবির বসে তা নাকি উৎকৃষ্ট শিশু-সাহিত্য রচনার তাগিদেই। তাছাড়া ভারতে সাহিত্য-সৃষ্টির উৎসাহ দানের নিমিত্তে একাডেমী পুরস্কার, মৌচাক পুরস্কার, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রভৃতি নানাবিধ পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙলা একাডেমীর প্রচেষ্টা তাই সঙ্গত কারণেই অভিনন্দনীয়। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রকাশকেরা সম্প্রতি শিশু-

সাহিত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে আস্থা প্রকাশ করছেন যা সত্যই আনন্দের বিষয়। কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত পনের বছরের শিশু-সাহিত্যের একটি নমুনা জরিপে শিশু সাহিত্যকে মোট এগারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। (১) জীবনী (২) রহস্যোপন্যাস (৩) গল্প (৪) রূপকথা (৫) উপন্যাস (৬) বিজ্ঞান (৭) নাটক (৮) ধর্ম (৯) ভ্রমণ (১০) ছড়া ও কবিতা এবং (১১) বিবিধ। আমাদের মনে হয় এ ছাড়া (ক) খেলাধূলা (খ) ব্যায়াম ও শরীর চর্চা (গ) পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্য (ঘ) সাধারণ জ্ঞান (ঙ) ইতিহাস ও কিংবদন্তি (চ) ম্যাজিক যাদু, ছবি আঁকা ইত্যাদি ও (চ) দেশের কথা বিষয়ক গ্রন্থাদিরও প্রয়োজন আছে। ১৯৪৮-১৯৬২ সনের জরিপ ও তালিকায় উপরিক্ত এগারটি বিষয় সম্পর্কিত গ্রন্থাদির অস্তিত্ব বাজারে থাকলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের সাতটি বিষয়ে রচিত শিশু সাহিত্যের অভাব পূর্ব-পাকিস্তানের পক্ষে মর্মান্তিক সত্য।

২.

অদ্যাবধি পূর্ব-পাকিস্তানে শিশু-সাহিত্যের মধ্যে জীবনী সাহিত্যের হারই বেশী। দ্বিতীয় স্থান রহস্যোপন্যাসের। এই রহস্যোপন্যাসের অধিকাংশই ডাকাতি, হত্যা প্রভৃতি লোমহর্ষক কাহিনীযুক্ত। জীবনী-বিভাগে কোন মহাপুরুষ বা নেতার নাম অধিক পাওয়া যায় সে তথ্য মুল্যবান। এ দিক থেকে দেখা যায় যে ১৯৪৮-৬২ এই পনের বৎসরের মধ্যে যে একশ আশীখানা জীবনীগ্রন্থ দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে তেইশখানা পুস্তকই হযরত মুহম্মদের জীবনী নিয়ে। রচিত জীবনী বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। তাঁর উপর তালিকাভুক্ত গ্রন্থ ১৭ খানা। 'আমাদের কায়েদে আযম', 'ছোটদের কায়েদে আযম', 'জাতির পিতা', 'পাকিস্তানের স্রস্টা' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম। ইসলামের ইতিহাসের অপরাপর খলীফা এবং বীরপুরুষদের উপরও একাধিক জীবনীগ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। কারবালার যুদ্ধ, এবং 'হাসান-হোসেনের' উপরও গ্রন্থ আছে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল, নজরুল, সেক্সপীয়ার, শেখভ, জগদীশচন্দ্র বসু, ম্যাডাম কুরী, এডিসন প্রভৃতির জীবনীও রচিত হচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তানের

শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে এই বিভাগের লেখকদের রচনার দক্ষতা সাধারণভাবে স্বীকৃত।

রহস্য রোমাঞ্চ বিজ্ঞানের লেখকগণ সাধারণ ভাবে অপরিচিত, অথবা অনামী। রহস্যোপন্যাসের লেখকেরা অনেকেই আবার রহস্যোপূর্ণ ছদ্মনাম গ্রহণ করছেন। যেমন—'স্বপন কুমার', 'কুযাশা', 'ধূমকেতু', 'মরিচীকা', 'ইস্রাফিল' 'ইনকা' 'কেটি' প্রভৃতি। লেখকদের নামের ক্ষেত্রে যেমন বহস্য, গ্রন্থের নামেও তেমনি রোমাঞ্চের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'অদৃশ্য মায়াবিনী', 'অন্ধকারের আতঙ্ক' 'উড়ন্ত বিমানে দুরন্ত-ডাকাতি', 'কেনাই ডাকু' 'কে এই দস্যুরানী', 'খুন আর খুন', খুন, ডাকাতি গুম 'খুনীর ফাঁদে' 'খুনীর সাধনা', 'খুনে বাঘা', 'গুপ্ত ঘাতক সমিতি', 'গুম', 'গুলির মুখে সেলিম', 'গ্রীণ ভিলা-হত্যারহস্য,' 'জেলখানায় হত্যারহস্য', 'ট্রেনে ডাকাতি,' 'ডাকু সুলতানা,' 'ডাক্তারের মরণ কাপড়,' 'ড্যাগার যখন বিঁধল বুকে', 'তিন শয়তানের ষড়যন্ত্র', 'দস্যু বাহরাম,' 'দস্যু বেনজীর' 'দস্যু মোহন', 'দস্যু রানী' 'দস্যু রুস্তম', 'দুঃসাহসী জালিয়াতী', 'নিশাচর' 'নিশাচরী সুন্দরী কে', নিশীথের খুনী,' 'বিষাক্ত ছোবল' 'বিষাক্ত নিঃশ্বাস 'ভুলু ডাকাত' প্রভৃতি।

রহস্যোপন্যাসের পরে জনপ্রিয় গল্প গ্রন্থ। এ বিভাগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এ বিভাগে সাধারণভাবে সুসাহিত্যিকদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এবং এ বিভাগের গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় রহস্যোপন্যাসের সমান সমান যাচ্ছে। এর দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের কিশোরদের চরিত্র নিম্নমানের রহস্যোপনাসের দ্বারাই চালিত হচ্ছে না। এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য অনুবাদেরও সন্ধান মেলে।

অনুবাদ বিভাগে বিশ্বের প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক লিউইস ক্যারলের 'আজব দেশে এলিস' লুই ষ্টিভেনসনের 'কিডন্যাপড', জোনাথান সুইফটের 'গালিভারের ভ্রমণ কাহিনী', চার্লস ডিকেন্সের গ্রেট এক্সপেকটেশন', সারভানটিসের ডনকুইক্সোট', ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুসো,' ষ্টাইনবেকের 'লাল ঘোড়া' জর্জ ইলিয়টের 'সাইলাস ম্যারিনার', হানস ক্রিশ্চিয়ান এ্যানডারসনের গল্প, ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'রিপভ্যান উইনকল, 'কিশোরদের শেকসপীয়ার, 'ঈসফের গল্প' এবং আরব্য রজনীর কাহিনী পরিবেশন দেখতে পাই। বিজ্ঞান বিষয়ক অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যাও

ক্রমাগ্রগতির পথে। ১৯৫৫ সনের পর থেকে বিদেশী কিশোর বিজ্ঞান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ সুরু হয় পূর্ব-পাকিস্তানে, যার হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিশোর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক রচনা অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক। ১৯৬২ সন পর্যন্ত যেখানে কিশোর বিজ্ঞান অনুবাদ বত্রিশ খানা সেখানে কিশোর বিজ্ঞানের মৌলিক গ্রন্থ মাত্র নয় খানা। গত ১৯৫২ সন পর্যন্ত শিশু ছড়া ও কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে মাত্র তেরখানা এবং এই ছড়া ও কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৩ সনের পরে।

৩.

পূর্ব-পাকিস্তানের শিশু সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের দৈনিক পত্রিকা সমূহের সাপ্তাহিক শিশু মজলিস, এবং সাপ্তাহিক, মাসিক কিংবা সাময়িক শিশু পত্র-পত্রিকাগুলোর উল্লেখ প্রয়োজন। পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত বাংলা দৈনিক খবরের কাগজেই সপ্তাহে একদিন 'খেলা ঘর', 'ছোটদের মজলিস', 'মুকুল মাহফিল', 'মুকুল মেলা' প্রভৃতি নামে বিভাগ ছাপা হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে ঢাকাস্থ 'এডুকেশন সেণ্টার' মেয়েদের স্কুলের পাঁচশ তেতাল্লিশজন ছাত্রীর মধ্যে দৈনিক পত্রিকার শিশু বিভাগের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে একটি নমুনা জরিপের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই জরিপে দেখা গেছে যে উক্ত ছাত্রীদের নব্বই ভাগ ছাত্রীই দৈনিক পত্রিকার শিশু বিভাগের নিয়মিত পাঠক। এই শিশু মজলিসগুলো ব্যতীত শিশুদের সাময়িক এবং মাসিক পত্রগুলোও শিশু ও কিশোরদের মনের ক্ষুধা মেটাতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করছে।

৪.

ঢাকা পূর্ব-পাকিস্তানের শিশু সাহিত্যের প্রধান প্রকাশকেন্দ্র। তারপর চট্টগ্রাম, তৃতীয় নোয়াখালী, বগুড়া প্রভৃতি। রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহ থেকেও কিছু কিছু শিশু সাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু তা উপরিক্ত প্রকাশকেন্দ্রের তুলনায় তা নগণ্য।

৫.

আমরা এ আলোচনায় ইচ্ছা করেই কোন শিশু সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করলাম না।

পূর্ব-বাঙলার লোক-সাহিত্যের একটি দিক : সারি গান

মুহম্মদ আবদুল খালেক

লোক-সাহিত্য বাঙলা দেশের অমূল্য সম্পদ। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে 'লোক-সাহিত্য' বাঙালী কবির আদি ও অকৃত্রিম রচনা। যদিও প্রমাণ স্বরূপ কিছু দেখানো সম্ভব নয়, তবুও আমার মনে হয় বাঙালীর প্রাচীনতম সাহিত্য চর্যাপদ নয় : লোক-সংগীত, কারণ যে দেশে এক শ্রেণীর সুসংহত মানব সমাজের অস্তিত্ব মিলছে, যাদের হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার অভাব ছিল না, সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা নিয়ে যাদের ঘর-সংসার গড়ে উঠেছিল, তাদের বাণী সুরে-তালে, কথায়-গানে রূপ পাবে না এটি কি করে সম্ভব! হতে পারে সে সমাজের মানুষ মূর্খ অথবা অশিক্ষিত, না জানতে পারে তারা লেখা-পড়া, না পেতে পারে তারা শিক্ষার আলোক। কিন্তু লোক-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে এগুলো কোন বাধা নয়। কাজেই যে সময় থেকে বাঙলার মাটিতে মানুষ বাসা বাঁধতে শুরু করেছে, যেদিন থেকে বাঙলার মাঠে-ঘাটে এখানকার রাখাল বালকেরা গরু-ভেড়া-ছাগল চরাতে শুরু করেছে, যেদিন থেকে বাঙালী কৃষক তার জীবিকা অর্জনের জন্য লাঙ্গলের মুঠি ধরেছে, সেই শুভ লগ্নেই বাঙলার মাটিতে লোক-সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কালের কবল থেকে সেগুলো রক্ষা করা যায় নি বলেই সৃষ্টির সত্যকে অস্বীকার করা যায় না কোনক্রমেই। বাঙলা দেশের উর্বর মাটিতে তৃণলতা, ঘাস-পাতা যেমন বিনা যত্নে, বিনা পরিশ্রমে প্রকৃতির কোন এক স্বাভাবিক নিয়মে আপনা থেকেই গজিয়ে উঠেছে, বাঙালী হৃদয়ের দুঃখ-বেদনা আশা-আকাঙ্খা, হাসি-কান্নাও তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রাচীন কাল থেকে তাদের কথায়-গানে, সুরে-বেসুরে বেজে উঠেছে। সুতরাং লোক-গীতিকেই বাঙালীর প্রাচীনতম রচনা হিসেবে ধরে নেওয়া যায়।

পূর্ব বাঙলা এবং পশ্চিম বাঙলার লোক-সাহিত্যে যে মৌলিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় তা আজকের নয়, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই এ পার্থক্য বিদ্যমান। আর এই পার্থক্য এসেছিল প্রকৃতির একান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই। লোক-সাহিত্য প্রকৃতির ফসল। আলো-বাতাস, জল-মাটির সাথে থাকে ফসলের প্রাণের মিল। পূর্ব বাঙলার পলিমাটিতে যে সমস্ত ফসল অতি অনায়াসে পরিপুষ্টি লাভ করে, পশ্চিম বাঙলার কাঁকর বিছানো লাল মাটিতে অনেক সাধ্য-সাধনা করেও সে ফসল জন্মানো সম্ভব হয়ে ওঠে না, আবার এমন কতকগুলো ফসল আছে যা পশ্চিম বাঙলার মাটিতেই জন্মান সম্ভব, পূর্ব বাঙলার মাটিতে নয়। লোক-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও উপমাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মটি অস্বীকার করতে গেলে সাহিত্যে কৃত্রিমতা আসতে বাধ্য, আর লোক-সাহিত্যে কৃত্রিমতার স্থান নেই বললেই চলে।

গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, ইছামতি, করতোয়ায় পরিবেষ্টিত আমাদের পূর্ব বাঙলা। এ দেশের লোক-সাহিত্য সম্পর্কে কোন কিছু বলতে গেলেই মনে পড়ে এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা যার সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে এ দেশের মানুষের ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্খা, কর্ম-সাধনা। কাজেই প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে এখানকার লোক-সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করা মানে আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহ নিয়ে গবেষণা করা। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ ফসল মানুষ, আর মননশীল মানুষের শ্রেষ্ঠ ফসল তার শিল্প; তার সাহিত্য। লোক-সাহিত্য সাধারণতঃ গড়ে ওঠে শিল্পীর পারিপার্শ্বিক রূপ-সৌন্দর্য, গতি-প্রকৃতি এবং জীবন পদ্ধতিকে কেন্দ্র করেই। পূর্ব বাঙলার প্রকৃতিতে সৌন্দর্যের অভাব নেই। বারো মাসে তেরো রকমের সাজ-পোষাক পরে এখানকার প্রকৃতি শিল্পী হৃদয়কে মাতিয়ে তোলে, যার ফলে এ দেশের লোক-শিল্পীদের কথায়-গানে, সুরে-তালে, চিত্রে-নৃত্যে কোনদিন বৈচিত্র্যের অভাব ঘটে নি। পূর্ব-বাঙলার গতিশীল প্রকৃতি এ দেশের লোক-শিল্পীদেরকে উদাস করে তুলেছে, ভাবুক করে তুলেছে। নদীর স্রোতের সাথে মানুষ ছুটে চলেছে কোন্ সীমাহীন পাথারে, উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মেঘনা-যমুনার অকূল সায়রে নৌকা ভাসিয়ে পাল তুলে ঢেউয়ের তালে তালে মাঝি খুঁজতে বেরিয়েছে তার জীবনের পথ, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের ফাঁকে ফাঁকে নদীর বাঁকে বাঁকে

সে চালিয়ে দিয়েছে তার জীবনের রথ। কিন্তু বাঙালী জনম জনম সাধনা করেও তার জীবনের কোন কুল-কিনারা করতে পারে নি। জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত মাঝি তাই হয়তো নিরাশার সুরে এক সময় গেয়ে উঠেছে:

"আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে
অকুল দরিয়ায় বুঝি কুল নাই রে।"

নিরাশায় ভরা বাঙালী মাঝির জীবন। বেঁচে থাকবার নিশ্চয়তা তারা কোন দিন পায় নি, কাজেই তাদেব কথায়-গানে করুণ সুরের এত প্রাধান্য। এর পর আসে বাঙালী কৃষকের কথা। মাঝিদের জীবন সংগ্রাম এবং কৃষকদের জীবন সংগ্রাম এক নয়, যার ফলে বাঙালী কৃষকদের গানের ভার এবং সুর বেশ খানিকটা আলাদা হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দুপুরে আমরা শহুরে ভদ্রলোকেরা শান্তি ছায়ায় বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসে ছট্‌ফট্ করতে থাকি, তখন বাঙলা দেশের কৃষকেরা দল বেধে ছোট ছোট ফসল নিড়াতে ব্যস্ত। হাতের পাচন তাদের ক্ষিপ্র গতিতে চলতে থাকে ধানের চাবা থেকে পাটের চারায়, মুখে তাদের অবিরাম ফুটতে থাকে গানের ফোয়ারা:

"ও তোর সাথী যারা জুয়াচোর তারা
যাস্‌না রে কথার মধ্যি
ভজন-সাধন করিস মন তুই
সামনে রাইখা সুবুদ্ধি।

দিন শেষে গোধূলি লগ্নে শস্য-শ্যামল মাঠ থেকে এক পাল গরু নিয়ে রাখাল বালকেরা বাড়ি ফিরছে। পশ্চিমাকাশে সূর্যের রঙীন আভা ম্লান হয়ে গেলেও রাখাল বালকের মুখের গান ফুরায় না। সদ্যাগত বন্যায় মাঠ-ঘাট পথ-প্রান্তর একে একে ডুবে যাচ্ছে। কৃষকের এক মুহূর্ত অবসর নেই। শুধু কাজ আর কাজ। সারা বছরের কঠোর সাধনার ধন তাকে মাত্র ক'দিনে কেটে ঘরে তুলতে হবে। এক মাজা পানির মধ্যে দাঁড়িয়ে তারা ধান আর পাট কাটছে। হাতে তাদের কাস্তে চালানোর চঞ্চলতা, মুখে তাদের বারোমাসী গান। পল্লী-বাঙলার শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশের সাথে যাদের পরিচয় আছে তাঁরাই শুধু উপলব্ধি করতে পারবেন মাঠ থেকে ভেসে আসা এই সুরগুলো কত করুণ এবং প্রশান্ত।

বর্ষার সময় এদের নৌকা বাইচ পূর্ব বাঙলার একটি উপভোগ্য দৃশ্য। এই নৌকা বাইচকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত গান রচিত হয় সাধারণ অর্থে তাকেই সারি গান বলা হয়ে থাকে। সারি শব্দটির আভিধানিক অর্থ পঙ্‌ক্তি বা শ্রেণী। অর্থাৎ কথাকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে যখন সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় তখন সে গানগুলো সারি গানের মর্যাদা লাভ করে। এই গানগুলো কর্মসংগীতের পর্যায়ভুক্ত। বাঙলা দেশের কৃষক-মজুর শ্রেণী যখন সমবেতভাবে কোন কাজ করতে যায় তখনই সাধারণতঃ এই সারি গানগুলো গাওয়া হয়ে থাকে।

বর্ষাকালে পূর্ব বাঙলার পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর বন্যার জলে ভরে ওঠে। সারাদিন হারভাঙ্গা পরিশ্রমে হাফিয়ে ওঠে কৃষকদের মন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাই তারা একটু আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। হাটে হাটে খোঁজ নেয় ক'বে কোথায় নৌকা-বাইচ হবে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে বলিষ্ঠ দেহের জোয়ান বা'চেলদেরকে নিয়ে আল্লা নামের ধ্বনি দিয়ে যাত্রা করে তাদের পবন কাঠের নৌকা। মাস্তুলের সাথে পত্‌ পত্‌ করে উড়তে থাকে তাদের নিজ নিজ প্রতীকধর্মী পতাকা। বা'চেলদের বৈঠার তালে তাল মিলিয়ে অবিরাম বাজতে থাকে তাদের একতালা টেকারা। সেই তালে তাল জুটিয়ে মাস্তুলের কাছে খঞ্জুরী হাতে বাবরী মাথায় অপরূপ নৃত্যের সাথে কথার পর কথা সুরের পর সুর গেঁথে যায় সারিদার। বা'চেলদের বৈঠা ফেলার তাল ঠিক করতে গিয়ে সারিদারের মুখ থেকে যে সমস্ত কথা সুর হয়ে বেরিয়ে আসে তাকেই আমরা সাধারণ অর্থে সারিগান বলবো। এগুলো তাদের আগে থেকে মুখস্থ করা বুলি নয়। চলার পথে চোখের সামনে যে দৃশ্য তারা দেখে, তাকেই সহজ-সরল ভাষায় ছন্দোময় করে তোলে অশিক্ষিত সারিদার। রবীন্দ্রনাথের 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে এদের উল্লেখ আছে। শ্রাবণের কোন এক সোনা ঝরা সন্ধ্যায় পদ্মার বুকে নৌকা নিয়ে ভ্রমণ করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পথ-ঘাট, মাঠ-প্রান্তর বন্যার জলে একেবারে ডুবে গেছে। বেলা প্রায় ডুবু ডুবু এমন সময় রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন প্রায় ১০।১২ জন লোক একটি নৌকা বেয়ে এগিয়ে আসছে। তাদের সবার হাতে একটা করে ছোট্ট বৈঠা। বৈঠা ফেলার তালে তালে তারা সবাই মিলে গান ধরেছে :

"যুবতী ক্যান বা কর মন ভারি
পাবনা থ্যাহে আন্তা দেব ট্যাহা দামের মোটরী।"

পূর্ব বাঙলার লোক-সাহিত্যে এই রচনাগুলোই সারি গানের পর্যায়ভুক্ত। এই গানের মধ্য দিয়ে সমগ্র গ্রাম-বাঙলা যেন কথা বলে উঠেছে। তাদের আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনার উজ্জ্বল নিদর্শন এই গানগুলো। সারি গান রচনার ধরা-বাধা কোন নিয়ম নেই। বৈঠা-মারার তালের সাথে মিলিয়ে সাধারণতঃ এই গানগুলো রচিত হয়ে থাকে। সারিগানগুলো চিত্রধর্মী। মুহূর্তের ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হলেও এর মধ্যে সার্বজনীন আবেদনের অভাব নেই। কিছু সংখ্যক সারিগান নিয়ে আলোচনা করলেই এর মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা এবং পারম্পর্য লক্ষ্য করা যাবে।

নব বিবাহিত তরুণ কৃষক মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে নৌকা বাইচের ডাকে, দেহের প্রতিটি রক্ত-বিন্দু টগবগ করে ফুটে উঠছে নৌকা বাইচের নেশায়। কাজেই দুপুর বেলা চারটে ভাত খেয়ে একটা পান মুখে দিয়ে বৈঠা হাতে সে যখন পা বাড়িয়েছে, তখন নব বধূ হয় তো মন ভার করে কৃষক স্বামীর যাত্রা পথে বাধ সেধেছে। কিন্তু এ মুহূর্তে নব বধূর আকুল মিনতি অথবা প্রেয়সীর গভীর ভালোবাসার চাইতে নৌকা বাইচের আকর্ষণ তার কাছে অনেক বেশি। কাজেই স্ত্রীর সমস্ত আবদার আবেদন দু' পায়ে মাড়িয়ে সে ছুটে এসেছে মণ্ডলের বাইচের নৌকায়, সারি ধরেছে :

"নৌকায় যাত্রা করিলাম সকালে
আল্লার নাম বল তোমরা চাঁদ বদনে॥

গ্রামের সীমা পার হতে না হতেই সারিদারের মনের মুকুরে ভেসে উঠেছে তার বধূর বেদনাভারাক্রান্ত মুখের ছবি। সঙ্গে সঙ্গে সারিদারের কথার সুর গেছে পাল্টে, প্রলোভনের সুরে গেয়ে উঠেছে :

"যুবতী ক্যান্ বা কর মন ভারি
পাবনা থ্যাহে আন্তে দেব ট্যাহা দামের মোটরী।"

এ প্রসঙ্গে আমার বিশ্লেষণ যদিও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে বেশ

খানিকটা আলাদা হয়ে গেল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ বক্তব্য : "দেখিলাম, এই গোয়াল ঘরের পাশে, এই কুল গাছের ছায়ায় এখানেও যুবতী মন ভারি করিয়া থাকেন এবং তাহার রোষারুণ কুটিল কটাক্ষ-পাতে গ্রাম্য কবির কবিতা ছন্দে-বন্দে, সুরে-তালে, মাঠে-ঘাটে, জলে-স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে," উক্তিটি বিশেষভাবে প্রনিধান-যোগ্য।

জোয়ান বা'চেলদের শক্ত টানে মণ্ডলের নৌকা তর তর বেগে ছুটে চলেছে। কিছুদুর এগুতেই দেখা গেল হানিফ, চাচার বাড়ির কাছে ঝোপের আড়ালে বুলবুল পাখীর একটা নির্জিব বাচ্চা অসহায় অবস্থায় তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। শত্রু পাখীরা ঘোরাফেরা করছে তার সন্ধানে, খোঁজ পেলেই বাচ্চাটির জীবন লীলার ঘটবে অবসান। এই করুণ দৃশ্যটি আর কারও চোখে না পড়লেও নৌকার সারিদারের দৃষ্টি এড়ায় নি। হানিফের মাকে বুলবুল পাখীর বাচ্চাটির দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য সহজ সরল ভাষায় গেয়ে উঠে সে—

"ওরে হানিফ চাচার মাও
তোমাগরে বাড়ির কাছে বুলবুলেরই ছাও।"

নৌকা তাদের ছুটে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। বাইচের সময় ঘনিয়ে আসছে ক্রমেই। লক্ষ্য স্থলে পৌছতে তাদের অনেক দেরি, বৈঠা ফেলতে হবে ঘন ঘন। এর মধ্যে তাদের নৌকা এসে গেছে এক ঘ্যাগ-বহুল গ্রামের পাশে। ঘ্যাগের কাহিনী বলার লোভ সামলাতে পারে নি সারিদার। ছোট ছোট কথার বাঁধুনীতে ঘনঘন বৈঠা ফেলার তালে তালে সে গেয়ে উঠেছে—

"দম্‌দমাদম রসুলপুর করম মতির কাছে
তিন শ ষাট ঘ্যাগ সেই গেরামে আছে
ঘ্যাগের জ্বালা মন্দ না
তিরিং তিরিং তাল বাজে না।

আর একটু এগুতেই হয়তো দেখা গেল একজন পল্লীবালা তার ভাঙ্গা কুটীরের পাশে দাঁড়িয়ে ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে ধরেছে বাইচের নৌকার দিকে। কিশোরী বালার সহজ-সরল-নিরাভরণ রূপের

মোহ কাটাতে পারেনি সারিদার, গেয়ে উঠেছে :

"ছুঁড়ীক দেখতে ভালো নয়ন কালো
মাথা ভরা চুল
ছুঁড়ীক দেখতে ভালো।"

এমন সময় হঠাৎ গভীর জঙ্গল থেকে ভেসে আসে ঘুঘু পাখীর করুণ মধুর সুর। কিশোরী বালার কালো হরিণ চোখের দৃষ্টি এমনিতেই বাচেল-দের চিত্ত-চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে তারপর আবার ঘুঘু পাখীর কান্না,—সারিদার নতুন সুরে গেয়ে উঠেছে :

"দারুণ ঘুঘুর ডাকেতে প্রাণ আর বাঁচে না।"

ঘন ঘন বৈঠা ফেলায় নৌকা তাদের, দ্রুত এগিয়ে চলে তীর বেয়ে। ওদিকে বেলা পড়ে আসছে। গ্রামের বধূরা জটলা করছে ঘাট থেকে জল নিতে। কেউ অবাক নেত্রে তাকিয়ে আছে নৌকার দিকে, কেউ কলসীতে ভরছে জল, একটু ঢেউ লাগলেই প্রতিবিম্বটি হয়ে যাবে অদৃশ্য। এই সুন্দর দৃশ্যটি বাদ পড়ে নি সারিদারের বর্ণনা থেকে। বধু-দের কাছে সারিদার মিনতি জানিয়েছে :

"জলে ঢেউ দিও না সখী
জলের মধ্যে কালো রূপ
নয়ন ভরে দেখি
জলে ঢেউ দিও না সখী।"

দীর্ঘ সময় বৈঠা টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে বা'চেলরা। অবশ হয়ে আসে তাদের হাত পা। কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। ক্লান্ত বা'চেলদেরকে উৎসাহ দেবার অভিপ্রায়ে প্রলোভনের সুরে সারিদার গেয়ে ওঠে :

"ব্যাছাল টান দিওরে জবাই করবো খাসী
বল্লামপুরের হাটে যাইয়া কিনবো দাঁতের মিশি।"

সারিদারের কথা শুনে বা'চেলদের উৎসাহ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। এক টানে চলে আসে তারা নৌকা বাইচের ঘাটিতে। হাজার হাজার দর্শক তাকিয়ে আছে নৌকার দিকে, গর্বে বুক ফুলে ওঠে। অন্যান্য নৌকার

দিকে কটাক্ষ করে সারিদার গাইতে থাকে :

"শিয়াল তুই বাঘ চিনিস না
বাঘের হাতে পড়লে পরে
কইয়া দিমু লৈটানা
শিয়াল তুই বাঘ চিনিস না।"

এমনিভাবে হাজার রকম কথায় গানে রেশারেশির পালা হয় শেষ। কর্তৃপক্ষের বাঁশী বেজে ওঠে, পাল্লা শুরু হয় দুটো নৌকার। দর্শকের হাত তালি বাজতে থাকে মুহুর্মুহু। দর্শকের অনুপ্রেরণায় পেছনে পড়া নৌকাটাই হয়তো শেষ পর্যন্ত আগে উঠে আসে। বিজয়ী নৌকার আনন্দোল্লাসে পানিতে ঢেউ খেলে, আকাশে বিজলী ছোটে, বিজিত নৌকাকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গস্বরে গেয়ে ওঠে :

"ইন্দুর পইরাছে ফাটকে বিলাই ডাক দে।"

আর গর্বের সাথে বিজয়ী ঘোষণা করে :

"কালভোমরা আমার নাম
শাল বসায়ে খাবো মধু
ছাড়বো না তোর কোমরবাম
কালভোমরা।"

বিজিত নৌকার বা'চেলদের মুখে আর রা নেই। কথা বলার শক্তি যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। ছোট্ট একটা নৌকার সাথে তাদের এত বড় নৌকোর পরাজয়ের গ্লানি কি করে ঢাকবে! কালের ধারা যেন উলটে গেছে। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকলে তো চলবে না। এত দুঃখের মধ্যেও বিজিত নৌকার সারিদার শ্লেষের সুরে গেয়ে ওঠে :

"আম গাছে সুপারী ধরে কাঁঠাল গাছে তাল
খঞ্জন পক্ষীর নাচ্ না দেখে হে
ওরে ব্যাঙে মারে ফাল রে
আম গাছে সুপারী ধরে।"

নৌকা বাইচের নেশায় বা'চেলরা এতক্ষণ বিভোর ছিল। বাইচ শেষে যখন তারা বেলার দিকে ফিরে তাকিয়েছে তখন শুধু দেখেছে অস্তগামী সূর্যের ফিক্ করে রেখে যাওয়া এক ঝলক হাসির রেখা। মনে পড়ে বাড়ি ফেরার কথা। বাড়িতে হয়তো এতক্ষণে তাদের বধূরা গরু দুটোর কাছে সাঁজাল দিয়ে ছোট্ট মেয়েটির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে গোয়াল

ঘরের পাশে বিজয়ী স্বামীকে সম্বর্ধনা জানাতে। এ দৃশ্য মনে পড়তেই সবগুলো নৌকার সারিদার এক সঙ্গে গেয়ে উঠেছে :

"বেলা গেল সন্ধ্যা হোল
আমার নীলমনি কোথায় র'ল।"

এমনি ভাবে আমরা যদি নৌকা বাইচের সারিগানগুলো বিশ্লেষণ করতে যাই তা হলে দেখবো পূর্ব বাঙলার কৃষক শ্রেণীর জীবনের প্রতিফলন সারি গানগুলোর মধ্যে রয়েছে। এর ফলে বাঙালী হৃদয়ের কাছে সারি গানগুলোর আবেদন এত বেশি।

নৌকা বাইচই যে সারি গানের একমাত্র উৎস এমন কথা বলা যায় না। সারি গান কর্মসংগীতের পর্যায়ভুক্ত। কোন কাজে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হলে সমবেত ভাবে সারি গানের সাহায্য নেওয়া হয়। যেমন দালানের ছাদ পিটানো অথবা কোন একটা ভারি বস্তুকে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিতে পূর্ব বাঙলার শ্রমিকশ্রেণী নানা রকম সারি গানের সাহায্য নিয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে একটা বিরাট গাছ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে হবে। ১০।১২ জন লোক মিলে ধরেছে সে গাছটি। এই কাজে তারা সবাই যাতে একই সঙ্গে সমস্ত বল প্রয়োগ করতে পারে এই উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে একজন উচ্চৈস্বরে বলবে "জোর আছে?" আর সবাই জবাব দেবে 'আছে।' তারপর সবাই সমবেতভাবে বলবে :

"যে জোর থাকতে জোর না করে
তার কান কাটা যাবে ভাদ্দর মাসে রে।"

পূর্ব বাঙলার রাজমিস্ত্রীরা যখন সমবেতভাবে দালানের ছাদ পিটতে শুরু করে তখনও তারা চুপচাপ বসে থাকতে পারে না। গানের তালে তালে তাদের হাতের মুগুর দরাম দরাম পড়তে থাকে ছাদের উপর। এই ছাদ পিটার গানগুলোকেও সারি গানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ছাদ পিটানোর গানগুলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অনেক সময় এতে ইতিহাসের টুকরো খবর পাওয়া যায়। যেমন :

"সাধের কল বসাইছেন নওয়াব বাহাদুর
পাতাল ফুইরা উঠে পানি
ও ভাই খাইতে সুমধুর।"

এই সমস্ত সারি গান থেকে বোঝা যায় পূর্ব বাঙলার মানুষের মনে গানের গুরুত্ব অপরিসীম। জীবন তার স্রোতের মতই চঞ্চল, আকাশের মতই উদার আর পাখীর মতই সংগীতপূর্ণ। এ সংগীত শুরু হয়েছে মানুষের কথা আরম্ভ হবার দিনটি থেকে। সংগীত সচেতন হবারও পূর্বে। এখনও এর গতি অব্যাহত, জনপ্রিয়তা অটুট। তাই আমরা এ গানের আলোচনাকে সময়ের গণ্ডি দিয়ে সীমাবদ্ধ করতে চাই না, পারিও না। সুতরাং স্বাধীনতা উত্তরকালের সারি গানের মধ্যে স্বাধীনতা পূর্বকালের সারিগানের কোন তফাৎ আছে বলে মনে করি না। অবশ্য সময়, কাল ও যুগ পরিবর্তনের ফলে মনন ও চিন্তার পরিবর্তন হেতু যে পরিবর্তন এসেছে, তা স্বীকার করে নেওয়া উচিত। কিন্তু রাতারাতি সে পরিবর্তনের বিচারে আমরা সুফল নাও পেতে পারি। তাই চিন্তার সূত্রটিকে পাঠক সমীপে তুলে ধরছি মাত্র।

সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্প চিন্তা

পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মনীষীবৃন্দ যে ইয়োরোপকে আহ্বান করেছিলেন, সেটা যে আমাদের প্রগতির সহায়ক হয়েছিল, একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য। এবং ইয়োরোপীয় চিন্তার সংস্পর্শে এসে আমরা যে অনেক লাভবান হয়েছি, একথাও নির্দ্বিধায় মান্য। শুধু তাই নয়, ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলন এই শতাব্দীতেও আমাদের কাব্যচিন্তাকে, সাহিত্যচিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যত, উনবিংশ শতাব্দী থেকেই আমরা ভ্রান্ত উপমায় ভুগছি। আমাদের ইংরেজ শাসিত নবজাগরণকে যেমন ইতালীয় রেনাসাঁসের বিরাট জাগরণের তুল্য ভেবেছি (কোন ঐতিহাসিক তার থেকেও গভীরতর ভেবেছেন), যেমন ফরাসী বিপ্লবোত্তর ইয়োরোপের তুলনা ইয়ং বেঙ্গলের চিন্তায় ভারতবর্ষে পাই, তেমনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনে বারবার ভারতবর্ষ-ইয়োরোপের ভ্রান্ত তুলনা আমাদের বিড়ম্বিত করেছে। উল্লেখযোগ্য, এই বিড়ম্বনা আজও অব্যাহত। যে ভ্রান্ত উপমায় মধুসূদনের মতো বিরাট ও মহৎ সাহিত্যপ্রতিভাও বিনষ্ট হয়, সেই তুলনাই বারবার আমরা করি—মধুসূদনের মহৎ শিক্ষাও আমাদের আলোকিত করেনা। কিংবা আরও অনেক পরে কল্লোলীয় উদ্দামতার ভস্মাবশেষ আমাদের সাবধান করে না। বোঝায় না, স্বকাল ও স্বদেশ বলতে একটা ব্যাপার আছে। আরও বিড়ম্বনার, আমরা আধুনিক বলে ইয়োরোপের যে সাহিত্য আন্দোলন ও কাব্যচিন্তাকে গ্রহণ করি, তা হয় ইয়োরোপে পরিত্যক্ত, নয় এক'শ বছরের পুরনো। এই উৎকট আধুনিকতা বোধ আমাদের পঙ্গু জাগরণেরই ফলশ্রুতি—এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মতো স্বয়ম্ভব মহত্তম প্রতিভাও আমাদের বাঁচাতে পারেনি। তিনি আজও আমাদের কাছে নক্ষত্রবিহারী, দূরলোকের অধিবাসী।

ইদানীং বাংলাসাহিত্যচিন্তায় এই ভ্রান্ত তুলনার রূপ প্রকট। উনবিংশ শতাব্দীতে এই ভ্রান্ত তুলনা সত্ত্বেও ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমন্বয়প্রচেষ্টা লক্ষণীয় ছিল, তা আজ অনিবার্য কারণেই অবসিত। বাংলার বর্তমান অবস্থা নিশ্চয়ই দায়ী—উনিশ শতকের ধ্যানের ভারতবর্ষে বেশী মাটি লাগেনি, কিন্তু বর্তমানের বাংলায় চতুর্দিকেই কর্দমের পঙ্কিলতা। উনিশ শতকের প্রচণ্ড আলোড়নে—রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে—যে নবীন মূল্যবোধ এসেছিল—তা সমাজে ছড়িয়ে যায়নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের আবেগ তবু জনসাধারণকে ধরে রেখেছিল একটা মূল্যবোধে। তারপর শুধু ভগ্নস্তূপের পাহাড়। যে সাহিত্যিক বা কবি ইতিহাসের অন্তঃশীলা টানের প্রতি নজর রাখবে না, দেশজ জীবনের ধারার সঙ্গে যার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন (নানা কার্য-কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা হয়েছে), তার পক্ষে এই ভগ্নস্তূপকেই চরম বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এবং এই ভগ্নস্তূপকেই কাজে লাগিয়ে কেচ্ছাকাহিনীর পসরা সাজিয়ে রুচিবোধকে আরও নিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে একদল সাহিত্যিক, অপরদিকে যারা এই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে চায়, তারা অধিকাংশই তরুণ, তারা স্বাভাবিক ভাবেই নিরুপায় হয়ে ইয়োরোপের বিদ্রোহী আন্দোলনের দ্বারপ্রার্থী হয়—তাই অস্তিত্ববাদ, চৈতন্যের স্রোত, কাফকার নাম বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও ভ্রান্ত উপমা ভ্রান্ত ইতিহাসবোধ তরুণ প্রতিশ্রুতিময় বিদ্রোহকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে। ভগ্নস্তূপের পাহাড় কেটে জীবনের নদীকে তাঁরা প্রায় ক্ষেত্রেই মুক্তি দিতে পারে না—আমার বিবেচনায় এটা আমাদের অশেষ দুর্ভাগ্য। কারণ এই তরুণদের হাতে বাংলা সাহিত্যের, ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ।

ইয়োরোপের চৈতন্যস্রোতমূলক উপন্যাসের প্রধান উৎসাহ এসেছিল উইলিয়ম জেমসের কাছ থেকে। চৈতন্য বা কনশাসনেস অর্থে জেমস বুঝতেন যা ইতিমধ্যেই আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ হয়েছে এবং যা হচ্ছে—তার সমাহার। আরও জানালেন যে, প্রতিটি চিন্তাই অনন্য ও পরিবর্তনশীল। এ এত দ্রুত পরিবর্তিত হয় যে, একে সঠিকভাবে ধরাই মুশকিল। এই স্রোতকে ধরার প্রচেষ্টা ঘুরন্ত লাটিম থামিয়ে তার গতি নির্ণয়েরই

সামিল। এর সঙ্গে এও স্মরণীয় যে, আমাদের দেশে স্ট্রীম অব কনশাসনেস বা চৈতন্যের স্রোত সম্পর্কে ধারণাও অস্পষ্ট। চৈতন্যের স্রোত বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা অবচেতনের স্তরকেই বুঝেছি; কিন্তু বস্তুতঃ মানবমনের সচেতন স্তরও এই ধরণের লেখায় বিবেচ্য। একটি বা একাধিক চরিত্রের সচেতন অবচেতন অচেতনমনের এই সর্বস্তরকেই চৈতন্য স্রোতের লেখক চিত্রিত করবেন। বাস্তবিক, চৈতন্যের স্রোত বা স্ট্রীম অব কনশাসনেস বলে কোন টেকনিক নেই। বর্ণনামূলক বা ন্যারাটিভ উপন্যাসের সঙ্গে এর পার্থক্য দুই ধরণের চিন্তার আকার পার্থক্যে।

উইলিয়ম জেমসের সতর্কীকরণ সত্ত্বেও ইয়োরোপে আধুনিক মন প্রধান উপন্যাসের ব্যাপক চর্চা সুরু হলো। অবশ্য চৈতন্যের আবিষ্কারে বের্গসঁ, হিউম ও লক, বার্কলে ও মিলের কথাও স্মরণীয়। উল্লেখযোগ্য, চৈতন্যের স্রোতের উপন্যাসচর্চার পিছনে ইয়োরোপীয় দার্শনিকদের অবদান স্মরণীয়, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের উৎসাহও স্মরণযোগ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইয়োরোপের প্রতীকবাদীদের ভূমিকা। তাঁরা বলেন, প্রতিটি অনুভূতি, চৈতন্যের প্রতিটি মুহূর্ত অনন্য এবং অন্যনিরপেক্ষ। ফলে সাধারণ সাহিত্যের প্রচলিত এবং সর্বজনীন ভাষায় তাদের প্রকাশ অসম্ভব। প্রত্যেক কবি ও লেখকই অনন্য ব্যক্তিত্বমণ্ডিত, তাঁর প্রতিটি মুহূর্তেরই, বিশেষ সুর, বিশেষ উপাদান আছে। কবির কাজ—তাঁর অনুভূতি ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশে সক্ষম কোন বিশেষ ভাষার আবিষ্কার। শুধু তাই নয়, ইয়োরোপীয় উপন্যাসের গতি প্রায় অনিবার্য রূপেই চৈতন্য স্রোতমূলক উপন্যাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। চৈতন্যস্রোতমূলক উপন্যাসের নানা প্রকার—কোনটি ইনটেরিয়র মনোলগ, কোনটি ইণ্টারনাল এ্যানালিসিস, কোনটি বা সেনসরি ইম্প্রেসন। দ্বিতীয় টেকনিকটির চর্চা কিন্তু আগে থেকেই আরম্ভ হয়েছে। এখানে লেখকের ভাষায় চরিত্রের মানসিকতা রূপ নেয়। ফ্রয়েড যাকে মনের প্রি-কনশাসস্তর বলেছেন তাকে নিয়েই এর কারবার। স্তাঁদাল বা ডষ্টয়েভস্কি বা হেনরি জেমসের উপন্যাস এই ধরণের। বস্তুতঃ হেনরী জেমস যে কাজ শুরু করেন তাই চূড়ান্ত রূপ নেয় জয়েসের উপন্যাসে—জয়েস ভাষার ক্ষেত্রেও বিদ্রোহ করেন।

অবশ্য চৈতন্যস্রোতমূলক উপন্যাসের ব্যাপক চর্চার পিছনে তৎকালীন সমাজও কাজ করছে প্রচুর পরিমাণে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রকরণের দিক থেকেই লেখকেরা সমস্যার সম্মুখীন হলেন। চৈতন্যের স্রোতের মতই দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগল সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে। উনিশ শতকের শেষেই গ্রাম্যজীবন অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতির ওপর চূড়ান্ত আঘাত এল। ব্যাপকভাবে সারা দেশ শিল্পাশ্রয়ী হয়ে উঠল। এই দ্রুত পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে তুলল। সুতরাং লেখকেরা তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতার রূপায়ণে নতুন প্রকাশভঙ্গীর সন্ধানী হলেন। হাতের কাছে যে প্রচলিত কর্ম বা টেকনিক ছিল তা মহৎ লেখকদের ব্যবহারে আপাততঃ সম্ভাবনা হারিয়েছে। এদিকে ঘটনার যুক্তিপরম্পরায় স্বকালকে ধরা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তাই তাঁরা তখন একটি বিশিষ্ট চরিত্র বেছে নিলেন এবং চরিত্রের মাধ্যমে একটি মানসিক আবহাওয়া রচনায় অগ্রসর হলেন। বোধ হয় তাঁরা ভাবলেন যে চিন্তাস্রোতকে রূপায়িত করতে পারলে বিশেষ চরিত্র ও তার অবস্থার অতীত ও বর্তমান—উভয় দিককেই ধরতে পারবেন। ভাবলেন ব্যক্তিগত চৈতন্যের মুকুরে দ্রুত পরিবর্তনশীল সময় বা কাল রূপ পাবে, বর্তমান যুগের দ্রুতি ও জটিলতা স্পষ্ট হবে।

সুতরাং একথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, প্রুস্ত, জয়েস বা ডরোথি রিচার্ডসনের প্রচেষ্টা সচেতন আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি। শুধু তাই নয়, ইয়োরোপে কি চিন্তার ক্ষেত্রে, কি সাহিত্যপ্রকরণের ক্ষেত্রে এক ধরণের অনিবার্যতাই চৈতন্যস্রোতের উপন্যাসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আমাদের তরুণতর সাহিত্যিকবৃন্দ যখন এই চৈতন্যের স্রোতে গা ভাসালেন তখন কিন্তু ইয়োরোপের উপন্যাস চৈতন্যের স্রোতে আর নেই। নিশ্চয়ই জয়েস বা প্রুস্ত বা ভার্জিনিয়া উলফ্-এর প্রচেষ্টা থেকে শেখা গেছে অনেক কিছু, কিন্তু এটাও বোঝা গেছে, যে এ পথে আর অগ্রসর হবার সম্ভাবনা নেই। আমাদের সাহিত্যে ঘটনার ঘনঘটা থেকে গল্প বা উপন্যাসকে প্রথম মুক্তি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তা ছাড়া মনপ্রধান উপন্যাসের নিষ্ঠার সঙ্গে চর্চা করেন ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর কোন কোন লেখায় কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু এর সঙ্গে স্মরণীয়

"অন্তঃশীলায় ধূর্জটিবাবুর আত্মনেপদের আভ্যন্তরিক আশ্রয়ে অর্ধনিশ্চিত অনেক বেশী। তা সত্ত্বেও যে তিনি আবর্তিতে বহিরাশ্রয়ী তীর্থযাত্রা করেছেন, সে জন্যে তাঁর শিল্পশ্রদ্ধা ও সাধনার নিষ্কামতা বিস্ময়কর।" এবং মাণিকবাবু খুব দ্রুতই বুঝেছিলেন কোথায় যেন একটা গোলমাল থেকে যাচ্ছে—তাই তিনি পরিচিত ভূমি ছেড়ে নতুন আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা কিন্তু অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। অধুনা সাহিত্যে এই মনচর্চায় ক্লান্তিহীন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও বিমল কর। কিন্তু প্রথমোক্তের শিল্পীর নিরাসক্তি থাকলেও সমগ্রতা-বোধ নেই। তাঁর কাছে, যেমন অধিকাংশ তরুণ লেখকদের কাছে, সব সমস্যাই হয়ে দাঁড়ায় যৌন সমস্যা। তাই আধুনিক ছোটগল্প আন্দোলনের মুখপত্রে তিনি যে গল্প লিখলেন, তা এই আন্দোলনের একটি দিকের, বৃহৎ দিকেরই চেহারা দেখিয়ে দেয়। "পরিমল এই গল্পের নায়ক, বিবাহিত জীবনে অসুখী। তার অসন্তোষ, বিরক্তি, স্ত্রীর প্রতি ঘৃণার যথাযথ কারণ অস্পষ্ট।......স্ত্রীর সান্নিধ্যের বাইরে তাই পরিমল যে মানসিক মুক্তি খোঁজে, সে মুক্তি একমাত্র স্বপ্নলোকেই সম্ভব অথচ স্বপ্নলোকে আকাঙ্ক্ষিত সুখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরিমল তার লোভ কামনা বাসনা অথবা শারীরিক পিপাসার নগ্নতার কাছে নিষ্ক্রিয়। অথচ এই পরিমল তার বন্ধুর মুখে যে নারীর বর্ণনা শোনে, তার সঙ্গে নিজের স্ত্রীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া মাত্র, তার আচরণে নিতান্ত সাধারণ স্বাভাবিক স্বামী সুলভ একটি ঈর্ষা এবং সংস্কার প্রকাশ পায়।" এই গল্পের তাৎপর্য কি? বর্তমান বাংলার যন্ত্রণাকে, অবক্ষয়কেও যদি নগ্নরূপে চিত্রিত করতে হয়, তাহলে কি এই পথ। এর তাৎপর্যগত প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও, এর প্রকাশের যে আয়োজন করা হয়েছে তা অসুস্থ—একটি মানুষের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশী কেমন করে আধুনিক মানুষের প্রতিচ্ছবি হয় বোঝা যায় না। (গল্পটির টীকায় এই দাবী করা হয়েছে) ডিমের সঙ্গে, কচি ফলের সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুলনা, নারীদেহের অকারণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এই গল্পে কোন কাজে এসেছে বোঝা মুশকিল। ওদিকে শ্রীযুক্ত বিমল কর অনেকদিন থেকেই মনপ্রধান গল্প লিখছেন—তিনি বাংলাদেশে যে ছোটগল্প : নতুন রীতি নামক আন্দোলনের সুরু হয়েছিল তার পৃষ্ঠপোষকও বটেন। কিন্তু মজার ব্যাপার তিনি তাঁর সবথেকে

উচ্চাভিলাষী গ্রন্থ দেওয়ালে—এই চৈতন্যের স্রোত বা মনপ্রাধান্যকে দূরে রাখলেন। সেখানে ঘটনা সংক্ষেপ, সময় সংক্ষেপ প্রভৃতি নতুন রীতির প্রাথমিক শর্তগুলিকেও মানলেন না। সন্দেহ জাগে, তিনি কি এই রীতির সংকট বুঝতে পেরেছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যে অসুস্থতার ছায়াপাত, তাই আরও গভীর ভাবে উপস্থিত তরুণ লেখক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়-এর গল্পে। শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় লেখক হিসাবে যে দুর্বল তা নয়। কিন্তু ভ্রান্ত সাহিত্যবোধ ও সামগ্রিক অসুস্থতা তাঁর গল্পকে তাৎপর্যপূর্ণ হতে দেয় নি। তাঁর দশ বছর পর একদিন, বিজনের রক্তমাংস, সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রমুখ গল্প এই অসুস্থতার স্বাক্ষর। প্রথম গল্পে—'বছর পাঁচেক আগে একদিন রবিবার বিকেলে প্রিয়রঞ্জন মেয়েটিকে দেখতে গিয়েছিল।' কয়েক বছর পরে সেই মেয়েটিকে সে দেখল তার বন্ধু দুলালের স্ত্রী হিসাবে। জানতে পারল মণিমালা গান জানে, কিন্তু আগে শুনেছিল, জানে না। তখন প্রিয়রঞ্জন ভাবল, 'মণিমালা আমাকে ভুলে গেছে, চিনতে পারেনি মোটে।' 'গায়িকা হয়ে একজন যুবককে সে বলতে পেরেছিল, জানে না, সেতার বাজায় তার বোন, কী ক্ষমাহীন প্রত্যাখ্যান মণিমালা তাকে করেছিল। পাশবিক অপমানের বোধ ভোঁতা ছুরির মতো উলটে পালটে মাংস কেটে ঢুকে যাচ্ছে তার বুকে।' বস্তুতঃ এ পর্যন্ত নতুন রীতিতে লেখা হলেও, গল্পটি সাধারণ ও তাৎপর্যহীন। কিন্তু সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় গল্প এখানে শেষ করতে পারেন না। তাই তার মনে হয় 'মণিমালার জন্য নয়, গানের জন্য তীক্ষ্ণ যন্ত্রণায় সে মূক হয়ে গেল।' শেষে সে তার একাকীত্ব বুঝল। কিন্তু এই যে একাকীত্ববোধ, এর সঙ্গে ইয়োরোপীয় গল্পের নায়কের একাকীত্বের কি তুলনা চলে। নিজের দেখা একটি মেয়েকে বন্ধুর স্ত্রী হতে দেখা এবং সে গান জানে না বলা—একাকীত্ববোধের মূলে এই ঘটনাটুকু। এর থেকে কোন তাৎপর্যপূর্ণ গল্পই লেখা যায়না—এমন কি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়-এর চমৎকার গদ্যও গল্পটিকে বাঁচাতে পারে নি। অন্য গল্প, বোধকরি শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়-এর সবথেকে বিখ্যাত গল্প 'বিজনের রক্তমাংস' একই তাৎপর্যহীনতায় ও অসুস্থতায় আক্রান্ত। "বর্তমান গল্প বিজনের রক্তমাংস একটি যুবকের ফলশ্রুতি। যে যুবক নিজেকে কোন শারীরিক কারণে অসুস্থ জেনেও তাকে

অস্বীকার ক'রে একদিনের জন্য মুক্তি খুঁজেছিল, অন্তত একবারের জন্য সে মুক্তি রেণু নামে এক বেশ্যার নগ্ন শরীরের সান্নিধ্যে তৃপ্ত হতে চেয়েছে। অথচ সমস্ত দিনের এই আকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত বিজনকে মুক্তি দিল না। রেণুর চোখে কান্নার জল আর কাজলের মাখামাখি দেখে সে কি যেন ভাবল। এ মুখ আমি দেখেছি, কিন্তু কোথায়? বাস্তবের পটভূমিতে উপজ সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হয় স্বপ্নে। বিজন স্বপ্ন দেখল। স্বপ্ন যেন তার চিন্তার স্বরূপকে পরিণত করে দিল। এবং বাধ্য হয়ে বিজন তার অসুস্থতাকে ডাক্তারের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বীকার ক'রে ভবিষ্যতের গর্তে নিশ্চেষ্ট হ'ল।" বাস্তবিক এই গল্পের অসীম সম্ভাবনা ছিল। শারীরিকভাবে অসুস্থ এক যুবক—তার অসুস্থতাকে অস্বীকার করছে ও মুক্তি খুঁজছে। জীবনাগ্রাহী গল্প হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু মুক্তি সম্পর্কে বোধ না থাকায়, বা ভ্রান্ত বোধ থাকায় গল্পটি অসুস্থতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত একজন যুবকের অচরিতার্থ যৌন ইচ্ছার গল্প হয়ে পড়ল।

বাস্তবিক এই অসুস্থতা কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে এসেছে অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা থেকেই। এই দর্শনের মূল নিশ্চয়ই কির্কেগাদের চিন্তায়। এবং এর ধারাও বিভিন্ন। কিন্তু যেহেতু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই দর্শন সার্ত্র ও কাম্যুর দ্বারাই জনপ্রিয় হয়েছে—সেহেতু তাঁদের ইহবাদী অস্তিত্ববাদই সবথেকে প্রভাবশালী। অনেকের ধারণা এই অস্তিত্ববাদ অসুস্থতারই নামান্তর। বাস্তবে কিন্তু সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদ সুতীব্র নৈতিকতার অধিকারী। বিশ শতকের সমাজব্যবস্থার যথেচ্ছাচারে, জর্মানীর ফ্রান্স আক্রমণে সার্ত্রের যে ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর, তার দায়িত্ববোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ তার অন্যতর নৈতিক-মূল্য রয়েছে। ইয়োরোপীয় সভ্যতার সামগ্রিক সঙ্কটের পটেই এই দর্শনচর্চা—বাস্তবিক সে সঙ্কট এখানে কোথায়? আমাদের পঙ্গু জাগরণ থেকেই যে ফাঁকি চলে আসছে তা গত মহাযুদ্ধে ও দেশবিভাগে তীব্রতর হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল চরিত্র হারায় নি। উনবিংশ শতাব্দীতেই যে বিষবৃক্ষ এই কলোনীয় জীবনে রোপণ করা হয়, তাই শেকড় ছড়ালো সমাজের গভীরে। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়া, তার পরিবর্তে শিল্প-বিপ্লব নয়, পঙ্গু চাকুরিজীবী মধ্যবিত্তের আগমন—সমস্ত ব্যাপারটাকেই

একটা কিম্ভূতকিমাকার রূপ দিল। সারা বাংলাদেশ কলকাতামুখী হয়ে পড়লো। এবং যে আকাশছোঁয়া সমৃদ্ধি সত্ত্বেও ইয়োরোপে ক্লান্তি আসে—সেই সমৃদ্ধিই বা এখানে এলো কোথায়? আমরা জীবনের নানা বিচিত্র দুঃসাহসিক রূপই দেখলাম না—কেরিয়ারমুখী বাঙালী মধ্যবিত্ত তার বিকাশের পথই পেল না। চাকুরিজীবী বাঙালী তাই যখন স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে, রাজনীতির খেলায় বিভক্ত বাংলা দেশে চাকুরীও জোটাতে পারল না—তখন স্বাভাবিক ভাবেই সমস্যা আরও জটিল হোলো। কিন্তু এর সঙ্গে কি তুলনীয় ইয়োরোপের সভ্যতার সঙ্কটের? ইয়োরোপে যাকে বুর্জোয়া ডেকাডেন্স বলা হয় তা এখানে জন্মাবে কেমন করে। তাই অবক্ষয়ের চিত্র আঁকাতে ইয়োরোপীয় লেখক যখন সিদ্ধিলাভ করেন, তখন, স্মরণীয়, তার পিছনে থাকে সমগ্র সভ্যতার চাপ।* এখানে সে তুলনায় অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কন প্রায়শঃই অসুস্থতাতেই পর্যবসিত হচ্ছে—অস্তিত্ববাদীরা, বিশেষতঃ সার্ত্র যে ছবি আঁকেন সে ছবিতে নিশ্চয়ই অবক্ষয় উপস্থিত, কিন্তু তার পিছনে কাজ করছে তাঁদের সুতীব্র নৈতিকতা। সার্ত্রের হোয়াট ইজ লিটরেচর পড়লেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। শুধু তাই নয়; সার্ত্রের মতানুযায়ী তাঁরা কঠোর আশাবাদীই। তিনি ইতিহাস মানেন, ইতিহাসের টানা-পোড়েনের সঙ্গেই লেখক জড়িত একথাও বলেন। আসলে বিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধের ভাঙনে সার্ত্র ন্যায্যতই মুক্তি খুঁজেছেন ব্যক্তির দায়িত্বে। ভোলা উচিত নয়, ফ্যাসিষ্ট বিভীষিকার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের যে সব বুদ্ধিজীবী এগিয়ে এসেছিলেন সার্ত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম—এবং তাঁর কাছে anguish, abandonment, condemned to be free—ইত্যাদিরও বিশেষ অর্থ আছে। কাম্যুর ক্ষেত্রেও তাই—তাঁর দি আউটসাইডার বা প্লেগের জীবনের নৈরাশ্যের উৎসমুখ কিন্তু জীবনাগ্রহই। এ কথা বোঝা যায় তাঁর মিথ অব সিসিফাস পড়লে। বাস্তবিক অস্তিত্ব-বাদের এই ধারায় জীবনাগ্রহ অন্যতম মূলকথা—কেবল যৌন যথেচ্ছাচার বা অসুস্থতা নয়।

---

* প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এখানে যাকে ব্যক্তির একাকীত্ব, হতাশা বলা হচ্ছে—তা মূলতঃ সামাজিক হতাশা। কারণ সমাজের বিচিত্র বিকাশ, সুষ্ঠু উন্নতি, বা সুস্থতা না থাকলে বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত হতাশা আসবে কোথা থেকে?

ইদানীং বাংলা সাহিত্যে বারবার উচ্চারিত হয়েছে কাফ্‌কার নাম। আধুনিক ইয়োরোপের গল্পেও কাফ্‌কার প্রভাব লক্ষণীয়। * কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কাফকাচর্চায় লাভ কতদূর? তাঁর পিছনেও তো জর্মানীর সুদীর্ঘ ঐতিহ্য। গোটে থেকে সুরু করে টমাসমান অবধি জর্মান সাহিত্যের অন্যতম থিমই ছিল—the artist as an exile from reality. শুধু তাই নয়, অস্তিত্ববাদের এক ধারার বিচারে কাফকা বোধ হয় সব থেকে অস্তিত্ববাদী লেখক—কির্কেগার্দ, ডষ্টয়েভস্কি, নীটসের ধারাতেই তাঁর স্থান। সদা বর্তমান অপরাধচেতনা বা পাপচেতনা কাফকার রচনায় অন্যতম থিম এবং এই অপরাধের প্রতিশোধ তাদের উপরেই নামে যারা নিজের নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে না। বাস্তবিক মধ্য-যুগীয় ঐক্য ভেঙ্গে পড়া, বেক্স:র্মসন, সতেরো শতক থেকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা রিয়্যালিটি বা বাস্তবতা সম্পর্কেই শিল্পীদের সন্দিহান করে তুললো। এই পটে, তার সঙ্গে বিশিষ্ট জর্মান ঐতিহ্য, কাফকাকে স্থাপন না করলে তাঁকে ভুল বোঝার ভয় সমধিক। শুধু তাই নয়, যদিচ কাফকার কাছে দেবদূতের সঙ্গীত নরকের সঙ্গীত বলে প্রতিভাত হয়েছে, তথাপি এডুইন মুর তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে দেখেছেন 'human life wherever it is touched by the powers which all religions have acknowledged by divine law and divine grace.' এবং তাঁর কাছে দি কাস্‌ল্‌, একটি রিলিজিয়স এ্যালিগরিইন মনে হয়েছে। হয়তে এ মতের সঙ্গে সকলে একমত হবেন না—তবু কাফকার পিছনে বিরাট খৃষ্টীয় ঐতিহ্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। বস্তুতঃ কাফকার উপন্যাস প্রতীকী—কিন্তু স্মরণীয়, তাঁর হাতে প্রতীক কখনই ব্যক্তিগত নয়। তাঁর কাছে কাস্‌ল্‌—পাওয়ার ও অথরিটিরই প্রতীক। আসলে কাফকার লেখায় তাঁর চতুর্দিকের বাস্তবেরই রূপায়ণ—কিন্তু কাফকার চিন্তায় এই জগৎ damned for ever. সেই সঙ্গে স্মরণীয় জয়েসের উপন্যাসেও যেমন একটা কেন্দ্রবিন্দু আছে, হোমরীয় গঠন প্রণালী আছে—তেমনি কাফকার প্রতীকেও, তাঁর ফ্যান্টাসিতেও (মেটামরফসিস গল্পে) একটা লজিক আছে—নিদারুণ নৈতিক চাপ আছে। (যদিও জয়েস ও কাফকার মধ্যে

* যেমন ফরাসী লেখক Noel Devaulx এর Madame Parpillon's Inn.

পার্থক্য প্রচুর) এই লজিক হোলো—রিয়্যালিটি অব কার্স। বস্তুতঃ কাফকার গুরুত্ব স্মরণে রাখলেও, এবং সম্প্রতি বাংলা গল্পকারদের গল্পে তাঁর প্রত্যক্ষ ছায়াপাত স্বপ্নদর্শনে প্রায় নকল দেখা গেলেও—কাফকা মহত্তম সাহিত্য কর্মের জন্য নিশ্চয়ই স্মরণীয় নন। তাঁর কাছে সবই মায়া—একমাত্র নিকটতম সত্য—I push my head against the wall of a cell without doors or windows. বর্তমান লেখকের ধারণা কাফকা থেকে যদি আমাদের মনযোগ টমাসমানে একটু ফেরাই তাহলে উপকৃত হবো বেশী।

এ যাবৎ আলোচনায় স্পষ্ট যে, কি সামাজিক, কি ধারণাগত, কি সাহিত্যগত কোন ঐতিহ্যই তরুণ লেখকদের গল্প প্রচেষ্টার পিছনে নেই। কিন্তু তবে এঁরা নতুন রীতিই বা গ্রহণ করলেন কেন? এঁদের বক্তব্য কী? প্রথমেই সন্দেহ জাগায় এঁদের আন্দোলনের নামে—'ছোট গল্প নূতন রীতি'। নামাকরণেই বোঝা যায় এঁরা জোর দিতে চান আঙ্গিক রীতির ওপর। কিন্তু শুধু রীতি চর্চা কতটা ফলপ্রদ—তাছাড়া চৈতন্যের স্রোত রীতি হিসাবেও বা কতটা সুবিধাজনক। এখানে চিন্তাগুলি নিজেরাই কথা বলবে। অতএব এখানে উপন্যাসের লেখকের ভূমিকা কি এবং লেখক-পাঠকের সম্পর্কই বা কি? জয়েস এর উত্তরে বলেন—লেখক হবেন ঈশ্বরের মতন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে লেখকের সৃষ্ট চরিত্র যে অনুভূতির বিবরণ বা ইঙ্গিত দেন, তা কি লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ নয়? এই সঙ্গে এটাও স্মরণীয়, নতুন আবেগ ও চিন্তার সমন্বয় সাধনের তাগিদেই নতুন প্রকাশরীতির প্রয়োজন। অন্যথা শুধুমাত্র আঙ্গিক বিলাসই লভ্য। এঁরা বলেছেন এঁদের লেখায় সামান্য গুণ হিসাবে থাকবে সময় সংক্ষেপ, প্রতীক ইত্যাদি। কিন্তু এঁদের এই প্রচেষ্টার মূল্য কার পটে। বিস্তৃত সময় নিয়ে বাংলায় মহৎ উপন্যাস কই, এমন কি মহৎ উপন্যাস গোরার সময়কালও ছ'মাস। তেমনি বিরাট পটভূমিকায় অপর্যাপ্ত ঘটনার সমাবেশই বা কই? নায়কত্বহীন নায়কচর্চার আগে ভাবা প্রয়োজন যথার্থ নায়ক চরিত্রই বা কোথায় এক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ছাড়া।

ছোট গল্প নূতন রীতি নামক এঁদের মুখপত্রে শ্রীযুক্ত বিমল কর

জানিয়েছেন—"কবিতা এবং উপন্যাসের মতো ছোট গল্পেরও হৃদয়গত পরিবর্তনের কারণ আমাদেরই জীবনের পরিবর্তন।" "নতুন ধারণা বা ভাবনা, নতুন ভাবে জানা অভিজ্ঞতা পুরণো রীতির বোতলে ঢোকানো যায় না।" "একে (এই আন্দোলনকে—লেখক) মুভমেন্ট না বলে ইমপ্রুভমেন্ট বলাই ভালো।" অন্যত্র শ্রীদেবেশ রায় বলেছেন, "এ আন্দোলনের লেখকদের মধ্যেও সর্ববিষয়ে মতৈক্য নেই।" "আমাদের বিষয়ের মধ্যে রাজনীতি, বিচিত্র কলকাতা শহরের মাঝখানে মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা, এই শতকের সময়ের দায়, পরিবার ব্যক্তিত্ব প্রেম—আসতে পারে। তার সঙ্গে আসতে পারে পাপবোধ, নিয়তিবোধ, আদর্শ ধ্বংস। এ সবই তো ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে। তবে নতুনত্ব কোথায়? নতুনত্ব—এ সকলের মধ্যে আত্মার সমস্যার সন্ধান।" "আত্মা সন্ধান যখন আমাদের বিষয়, তখনই আত্মচিন্তা, আত্মকথন ইত্যাদি ভঙ্গী গ্রহণ করতে হয়।" শুধু তাই নয় দেবেশ রায় আরও জানান "অনুভূতি যখন তখন তার ব্যক্তিভেদ আছে, ব্যক্তির শ্রেণীভেদ আছে, শ্রেণীর দেশভেদ আছে।"

বিমল করের প্রথম মন্তব্যটি সম্পর্কে প্রশ্ন এই হৃদয়গত পরিবর্তন কি? ইয়োরোপে এই প্রশ্ন কবে ঘটেছিল? বাংলা দেশের সঙ্গে এই পরিবর্তনের তুলনা কতদূর সঙ্গত? আরও উল্লেখযোগ্য আধুনিক ইয়োরোপীয় গল্পে আবার পুরনো রীতিও ফিরে এসেছে।* শ্রীযুক্ত করের দ্বিতীয় উক্তিও ভাসাভাসা—নতুন ভাবনা কি, পুরনো বোতলই বা কি? দেবেশ রায়ের দ্বিতীয় উক্তি ও শ্রীযুক্ত করের তৃতীয় উক্তি একই সূত্রে গাঁথা। বিমল কর যে ইমপ্রুভমেন্টের কথা বলেন—তা কীসের, রীতির না বিষয়ের—না উভয়েরই। তার চরিত্রই বা কী—বাস্তবিক সাহিত্য আন্দোলনে ইমপ্রুভমেন্টের প্রশ্ন হাস্যকর—বিশেষ করে যখন শুনি এটা কোন মুভমেন্টই নয়। শ্রীযুক্ত রায়ের দ্বিতীয় উক্তি—বিচিত্র কলকাতা শহরের মাঝখানে মানুষের অস্তিত্বের সমস্যার উল্লেখ—সেই কলকাতা-

* ইটালীর লেখক Ignazio Silone এর The Fox বা জর্মান লেখক Gertrud von le Fort এর The Innocent Child বা Hildesheimer এর A Major Purchase প্রভৃতি গল্পই প্রমাণ করে আধুনিক ইয়োরোপীয় গল্পের ধারা কি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চরম বিপর্যয়েও এরা জীবনাগ্রহী এবং চৈতন্যের স্রোত পরিত্যক্ত।

মুখীনতা, বাংলা দেশে থেকে কলকাতাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রবণতা প্রকট। শুধু তাই নয় যখন তাঁদের স্বাতন্ত্র্য শ্রীরায় নির্দেশ করেন মানুষের আত্মার সন্ধানে—তখন ব্যাপারটা গোলমেলেই হয়ে পড়ে। গোরা কিংবা যোগাযোগ বা চতুরঙ্গ, অন্নদাশঙ্কর, ধূর্জটিপ্রসাদ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রচেষ্টা তবে কি? সমাজপটে ব্যক্তিত্বের সমস্যাই বারবার সাহিত্যিকদের ভাবিয়েছে—যা অন্য ভাষায় আত্মার সমস্যা। সুতরাং আত্মার সন্ধান নতুন ব্যাপার নয়। প্রকাশ রীতির নতুনত্বের প্রশ্ন তখন ওঠেই না। শ্রীযুক্ত রায়ের তৃতীয় উক্তিতে বোঝা যায় এই আন্দোলনের সঙ্কটের দিকে তিনি নজর রাখেন—নির্বিশেষ অনুভূতি বলে কিছু নেই এটা বোঝেন। তা ছাড়া এঁরা যে প্রতীকী উপন্যাস লেখার দাবী করেন—সে সম্পর্কে স্মরণীয় সব মহৎ সাহিত্যই তো সমগ্রভাবে প্রতীক। তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের মহৎ উদাহরণই বা আমরা ভুলে গেলাম কি করে? ধূর্জটিপ্রসাদের অন্তঃশীলা বা বিভূতিভূষণের সরল কিন্তু সৎ প্রয়াসও কি ভুলে যাওয়া উচিত?

তবে শ্রীযুক্ত দেবেশ রায় যে বলেছেন "এ আন্দোলনের লেখকদের মধ্যেও সর্ববিষয়ে মতৈক্য নেই"—একথা সত্য। সাম্প্রতিক ছোটগল্পের এই অসুস্থ ধারার পাশাপাশি আর একটি সুস্থ ধারাও প্রবহমান। বস্তুতঃ সম্প্রতিক গল্পকারদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম অস্তিত্ববাদী তথা অসুস্থ গল্পের লেখকবৃন্দ (এদের কারুর কারুর লেখার শক্তি কিন্তু অনস্বীকার্য)। দ্বিতীয়, এঁরাই দলে ভারী—এঁরা নতুন ফ্যাশনের নকলনবীশ। নিজস্বতা বলতে কিছু নেই। আর তৃতীয় শ্রেণী—এই সুস্থতার ধারার লেখকবৃন্দ। মার্কসবাদে এঁদের দীক্ষা। এবং অন্ততঃ প্রথম দিকের রচনায় এঁদের মূলতঃ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেশ রায়-এর রচনাই প্রকৃত চৈতন্যের স্রোতে আক্রান্ত। দীপেন্দ্রনাথের চর্যাপদের হরিণী অথবা দেবেশ রায়-এর দুপুর এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চেতনা ও বাস্তবের বিষয় সম্বন্ধে মার্কস এঙ্গেলস-এর বক্তব্যের খোঁজ করা আশা করি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মার্গারেট হকিনেসকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বলেন, "বাস্তবতা বলতে আমি মনে করি, সূক্ষ্ম বিবরণগত যথার্থতা ছাড়াও, বিশেষ অবস্থার মধ্যের প্রতিভূস্থানীয় চরিত্রগুলির যথার্থ

সৃষ্টি।" দি জর্মান ইডিয়লজিতে পাই, "ধ্যানধারণা ও চেতনার উৎপাদন প্রথমত ও প্রত্যক্ষত বিজড়িত মানুষের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপ ও বৈষয়িক আদান প্রদানের তথা বাস্তবের জীবনের ভাষার সঙ্গে।" "সচেতন অস্তিত্ব ছাড়া চৈতন্য অন্য কিছু হতে পারে না, আর মানুষের চৈতন্যের অর্থই হোল তাদের জীবনের প্রক্রিয়া।" "আমরা যাত্রা করি বাস্তব মানুষ থেকে এবং তাদের বাস্তব জীবন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতেই এই জীবন প্রক্রিয়ার ভাবাদর্শগত প্রতিভাস ও প্রতিধ্বনির বিকাশ ধারার ব্যাখ্যা করি।" "চৈতন্য জীবনের নিয়ন্তা নয়, জীবনই চৈতন্যের নিয়ন্তা।" "প্রথম ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীতে যাত্রা করা হয় জীবন্ত ব্যক্তিরূপী চৈতন্য থেকে; দ্বিতীয় ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীতে যাত্রা করা হয় সরাসরি বাস্তব জীবন্ত ব্যক্তি থেকে বাস্তব জীবনে তাঁদের অবস্থিতি থেকে; চৈতন্যকে বিবেচনা করা হয় কেবল তাদেরই চৈতন্য হিসেবে।" বস্তুতঃ দীপেন্দ্রনাথ কি দেবেশ রায় প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাথমিক ভাবে অনুসরণ করেছিলেন। তবে সাহিত্যের দ্বান্দ্বিক অভিব্যক্তি জটিল ব্যাপার—এক্ষেত্রে সরলীকরণ অমার্জনীয়।

শুধু তাই নয়, সৎ আঙ্গিকের চর্চা করতে করতেও ক্রমশঃ লেখক জীবনের কূলে এসে ঠেকেন। প্রকাশরীতির মাধ্যম খুঁজতে খুঁজতে উল্টোদিক থেকে জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ানো যায়। এবং মার্কসবাদী লেখকও দ্বন্দ্বময় বিকাশের মধ্য দিয়েই চলবে। সুখের বিষয় এই বিকাশ ও পরিবর্তনের চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে দীপেন্দ্রনাথ ও দেবেশ রায় উভয়ের মধ্যেই। (শেষোক্তের প্রবন্ধের ভ্রান্তি সত্ত্বেও)। দীপেন্দ্রনাথ-এর ভাসান গল্পের সাফল্য নরকের প্রহরীতে পরিবর্তনের আভাস আবার চর্যাপদের হরিণী থেকে তাঁর পরবর্তী গল্পাবলীতে নিজেকে অতিক্রমণের চেষ্টা—তাঁর বিবেকী সৎসাহিত্য প্রয়াসেরই প্রমাণ। চর্যাপদের হরিণীতে যে নিরালম্ব শূন্যতায় দীপেন্দ্রনাথ আশ্রয় নিয়েছিলেন, জটায়ুতে এসে তার অবসান ঘটেছে। নিত্যচরণের ছিন্নবাহু নিয়ে আগুনের মধ্যে নৃত্যের মধ্যে আমাদের দেশবিভাগের আশ্চর্য প্রতীক। দুর্গার মানসিক বেদনা, তার অসহায়তাকে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর বিশিষ্ট প্রকাশরীতিতে স্পষ্ট করে তুলেছেন। কিন্তু দীপেন্দ্রনাথ এখানেও তাঁর জীবন দর্শনের প্রতি আস্থা রাখতে পারেন নি। গল্পের

শেষে তিনি বলেছেন—"তারপর দুর্গা স্পষ্ট দেখল আশ্রমের বেড়ার ভেতর তার নিয়তি এসে দাঁড়িয়েছে। যে শত্রুর চেহারা স্পষ্ট করে চিনত না আর প্রতি মুহূর্তে যে ভয়ে কাঁপত—সে নিত্যচরণের চেহারায় তার ভাঙা ডাঙাটা উঁচিয়ে দুর্গাকে দেখিয়ে বলছে এই যে, এই যে, এইখানে।" যে দুর্গা জানে তাকে বাঁচতে হয়, বাঁচতে হচ্ছে সে দুর্গার নিয়তির হাতে আত্মসমর্পণ কেন?

শ্রীযুক্ত দেবেশ রায় কিন্তু প্রথম দিকে রীতিচর্চার ঘূর্ণিপাকেই ঘুরছিলেন। গঠনগত ত্রুটি সত্ত্বেও পশ্চাৎভূমি নামক তাঁর আশ্চর্য জীবনাগ্রহী গল্পে তিনি স্বীকৃতি পাবেন। তিনি লিখেছেন দুপুর নামক গল্প—যে গল্প পুরোপুরি চৈতন্যের স্রোতমূলক, বিভিন্ন চরিত্রের, অবশ্যই সচেতন, মনোলোকের যে চিত্র—একটি দুপুরকে কেন্দ্র করে এঁকেছেন—তাতে মধ্যবিত্ত পরিবারের ক্লান্তি ফুটেছে—কিন্তু এই ক্লান্তির চিত্র শ্রীযুক্ত রায় তাঁর জীবনাগ্রহ থেকেই এঁকেছেন। তাঁর নিরস্ত্রীকরণ কেন নামক প্রতীকী গল্প প্রমাণ করেছে শ্রীযুক্ত রায়—রীতিচর্চা থেকে জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। এ গল্পে লেখকের সিচুয়েশন সৃষ্টি, সমগ্রভাবে গল্পটি প্রতীকী করে তোলা—বারবার লেখকের মুক্তির কথা স্মরণ করায়। বলা বাহুল্য, দীপেন্দ্রনাথ ও দেবেশ রায় যে ক্রমশঃ উক্তি ও উপলব্ধির হরগৌরী মিলনের দিক অগ্রসরমান তা স্পষ্ট। এঁদের পূর্বে "পুরনো রীতি"তেই গুণময় মান্না, অমিয়ভূষণ মজুমদার (গল্পে ইনিও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তবে তা এখনও সার্থক নয়) বা অসীম রায়—উপন্যাসের ক্ষেত্রে বর্তমানে জীবন ও তার যন্ত্রণার জীবনাগ্রহীরূপ আঁকছিলেন, শিল্পীর সততাকে মূলধন করে, এই দুজন তরুণ লেখক তাঁদেরই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছেন।

এঁদেরই পাশাপাশি, আর একজন গল্প লিখছেন—যাঁর স্থান কিন্তু একটু স্বতন্ত্র। তিনি কমলকুমার মজুমদার। তাঁর সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া বিচিত্র ধরণের—কারুর কাছে তাঁর লেখা বীভৎস, কারুর কাছে তিনি বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের একজন। কিন্তু একটু স্থির হয়ে দেখলে দেখা যায় যে, কমলকুমারের লেখার ভাষা সম্পর্কে উৎকেন্দ্রিকতা অস্বচ্ছতা (যে কারণে অন্তর্জলি যাত্রার মত গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় প্রচেষ্টার সার্থকতা তির্যক হয়ে রইল) যেমন বিস্ময়ানু, তেমনি সৎ সাহিত্য

প্রচেষ্টাও তাঁর মধ্যে লক্ষণীয়। শুধু তাই নয়, তাঁর বাংলার দেশজ জীবনের সঙ্গে পরিচয় গভীর—ফলে তাঁর গল্পের উৎসমুখ এই দেশেই। রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ সম্পর্কে উক্তি, কিংবা তাঁর উপন্যাসের ভূমিকায় বাবুবিলাসের ভানের কথা মনে রেখেও, এই কথা অনস্বীকার্য। যেখানে কমলকুমার অসুস্থতা ও অতিভাবামনস্কতা ত্যাগ করেন * সেখানে যে কি আশ্চর্য গল্পই না তিনি লেখেন তার প্রমাণ: মতিলাল পাদরী গল্পটি। এই গল্পের ভাষাও আমাদের মুগ্ধ করে। "মতিলালের চাইবার কিছুই ছিল না, শান্তি নয় কিছু নয়। বিচারের ভীতি তাঁর কোন ক্রমেই ছিল না। শুধু মাত্র একটি আশা, পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান।" এই পাদরীর গির্জায় ঘোর কৃষ্ণময়ী রজনীতে এক রমণী প্রসব করলো একটি শিশুকে। একে কেন্দ্র করে মতিলাল পাদরীর বিশ্বাস, জীবনবোধের যে চিত্র কমলকুমার এঁকেছেন তাতে পাঠকের চৈতন্যও বিস্তৃত হয়। গল্পের শেষ বাক্যে "আমি সত্যই ক্রিশ্চান নাই গো বাপ" বলে পাদ্রীর যে আর্তনাদ—তা পাঠান্তে মনে হয় একটি জীবন পরিক্রমা ঘটল। বাস্তবিক একটি ছোটগল্পের মধ্যে যে ব্যাপ্তি, আমাদের দেশজ জীবনের যে প্রতিচ্ছায়া পাই—তার তুলনা বাংলাদেশে সেরা গল্পের সঙ্গেই। শুধু তাই নয়, মতিলাল পাদরীর আন্তরিকতার মতোই এই গল্পের ভাষাও অনবদ্য। মিলিউ আঁকাতে কমলকুমার তাঁর ভাষার জোর প্রমাণ করেছেন—"ক্রমাগত বিদ্যুৎরেখা, ঘোর কৃষ্ণময়ী রাত্রি"—এই একটি ক্রিয়াবিহীন বাক্য চিত্রটি চকিতে স্পষ্ট করে—তাঁর গল্পের ব্যাপ্তির মতো, তাঁর ভাষার ব্যাপ্তিও, ক্রিয়ার স্বল্প ব্যবহারে লক্ষণীয় —বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি এতে প্রকাশ পায়। শুধু এই গল্প নয়, গঠনগত ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁর গল্পের জ্যোতির বাবা শিবনাথের পায়ে শিকল বাঁধতে বাধা দেওয়ায় ও শেষে তার সামনেই শিকল পড়ানোয়—যে রূপক কমলকুমার আঁকেন তাও উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কমলকুমার মজুমদার যখন সুস্থতা, ভাষা সম্পর্কে তার যুক্তিপূর্ণ পরীক্ষা ছেড়ে উৎকেন্দ্রিকতায় যান, যা তিনি মাঝে মাঝেই যান, তখন যে কি গল্প

---

* কমলকুমারের ভাষার প্রধান গুণ, বাংলা ক্রিয়ার যে দুর্বলতা তা তিনি দূর করায় প্রয়াসী এবং এক্ষেত্রে বাক্যের অন্বয়ে তিনি যতটা স্বদেশী, তার থেকে অনেক বেশী বিদেশী। ফলে মাঝে মাঝে তাঁর ভাষা দুরূহ হলেও মূল্যবান, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই, ভাষার ক্ষেত্রে, তিনি প্রায় উৎকেন্দ্রিক।

লেখেন তার প্রমাণ—নিম অন্নপূর্ণা গল্পটি। প্রথমতঃ ভাষার প্রতি অতি-মনস্কতার ফলে এ গল্পের অনেক অংশই অপ্রয়োজনীয় ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়তঃ এর সর্বাঙ্গ জুড়ে অসুস্থতা—যার প্রকট প্রকাশ গল্পের শেষ দিকে।

আলোচনার শেষে সাম্প্রতিক গল্প লেখকদের ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশ প্রয়োজন। বস্তুতঃ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, কমল কুমার মজুমদার, আপত্তি সত্ত্বেও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টার ভূমিকা সর্বদা স্মরণীয়। বেশ কিছুকাল ধরে বাংলা গল্পে কিছু বাজারী লেখক কখনও কেচ্ছায়, কখনও উদ্ভটত্বে, ভাবালুতায় এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। এই তরুণ সাহসী গল্প লেখকবৃন্দ এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হয়তো তাঁদের কারুর কারুর প্রতিবাদ লক্ষ্যভ্রষ্ট—তথাপি প্রচেষ্টার দিক থেকে তা স্মরণীয়। উজ্জ্বল ও তরুণ গল্পকারদের মধ্যে কয়েকটি নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, তাঁরা হলেন—সৌরী ঘটক, মানবেন্দ্র পাল, অজয় দাশগুপ্ত, বাণী রায়, কবিতা সিংহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, মিহির আচার্য, দিব্যেন্দু পালিত, প্রফুল্ল রায়, বরেণ গঙ্গোপাধ্যায় ও রতন ভট্টাচার্য। এবং এঁদের অগ্রজ গল্পকারবৃন্দ প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, দীপক চৌধুরী, নরেন্দ্রকুমার মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু-আদি সকলে মিলে, বাংলা গল্পের প্রতি সিরিয়স পাঠকের দৃষ্টি ফিরিয়ে এনেছিলেন—এঁদের গল্প সম্পর্কিত সুস্থ তর্ক-বিতর্কে বাংলার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকাও মুখর হয়ে উঠেছিল।

ছোটগল্প :
নতুন রীতি

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে একটা নতুন আন্দোলন নিয়ে এসেছেন বলে কয়েক-জন তরুণ লেখক দাবি তুলেছেন। তাঁদের 'নতুন রীতি'র কিছু কিছু গল্প নিয়ে বেশ উত্তেজিত তর্ক-বিতর্কও শোনা যাচ্ছে। উত্তাপ যাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরা যে উপেক্ষণীয় নন—এ সত্যও অনস্বীকার্য।

এ-কালের পাঠক হিসেবে নতুনের আবির্ভাব দেখলে আমার মন খুশি হয়। জীবিত সাহিত্যের ধর্মই তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিরচলিত অনুবর্তনকে অতিক্রম করে বেরিয়ে আসবার প্রয়াস। তার মধ্যে যা খাঁটি বস্তু—তার মার নেই। নিজের জোরেই তা জায়গা করে নেবে—অভিনন্দন তাকে বরণ করুক আর নিন্দা তাকে ধিক্কার দিক, কোনো-টাই আর গণনীয় নয়। আর যদি জীবনকে চেনা-জানার কোনো নতুন সত্য সে না নিয়ে আসে, তা হলে প্রচণ্ড চীৎকার তুলেও তাকে টেঁকানো যাবে না। এটা পুরোনো কথা, আর—অত্যন্ত খাঁটি কথা।

নতুন গল্প বললে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, কিন্তু নতুন রীতিটা কী? চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আমরা যখন কতগুলো ফর্মের আন্দোলন দেখেছি—এ কি তাই? এইটেই একটু বোঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

ছবি সম্পর্কে আলোচনার জায়গা এ নয়। কিন্তু এটুকু নিশ্চয় বলা যায় যে মাত্র আঙ্গিকের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটানোই একটা আন্দোলন সৃষ্টির পথে যথেষ্ট নয়। একথা ঠিক যে বহু ব্যবহৃত ভাষা, চিরাচরিত প্রয়োগনীতি বা মহাজন পন্থার অনুসরণ নতুন লেখক বা পাঠক উভয়তই ক্লান্তিকর। সুতরাং অভিনব আঙ্গিকের জন্যে কিছু সচেতন প্রয়াস সব সময়ে প্রয়োজন আছে। নতুন রীতি নতুন সাহিত্যের সঙ্গে অপরিহার্য-ভাবেই আসে। চিরদিনই আসছে।

কিন্তু 'নতুন সাহিত্য'—এই কথাটাই দরকারী। প্রশ্ন হল, বাংলা ছোটগল্পে কোনো নতুন কথা আসছে কি না; কোনো নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষাৎ মিলছে কিনা—যা এতদিন অনভ্যস্ত অনস্নুশীলিত ছিল; পাওয়া যাচ্ছে কিনা কোনো নতুন বক্তব্য—যা আমাদের চিন্তাকে আলোড়িত করছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ডে যে 'ব্লুমস্‌বেরি গোষ্ঠীর' বিকাশ ঘটেছিল, আমেরিকায় যে 'লস্ট্‌ জেনারেশন' আবির্ভূত হয়েছিল ডস-পাসোজ কিংবা হেমিংওয়ে প্রমুখ লেখকদের ভেতরে, সাম্প্রতিক কালের যে 'অ্যাংগ্রি ইয়ংম্যানের' দল সমগ্র মূল্যবোধের বিরোধী—মোটামুটি-ভাবে তাঁরা অবক্ষয়বাদী। হেমিংওয়ের কলমে জীবনবোধের দীপ্তি কখনো কখনো চমকে উঠলেও রক্ত ও মৃত্যুর প্রতি তাঁর একটা উদগ্র প্যাশান সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মানবতাবাদের ওপারেই নির্বাসিত করে রেখেছে। লক্ষ্য করবার মতো, সাম্যবাদী চিন্তা চেষ্টা এবং নতুন মানুষের প্রতি একটা উন্নাসিক উপেক্ষাই প্রায় ক্ষেত্রে এই সব নবীন আঙ্গিকবাদীদের প্রধান প্রেরণা। যুদ্ধ, অর্থ নৈতিক জীবন, মধ্যস্বত্ব-ভোগীর পরাভূত মননের নৈরাজ্যবাদ, ক্লান্তি এবং ক্ষোভ—এইগুলিই কতগুলি ছোটবড়ো আন্দোলনের আগ্নেয়-শিখর থেকে বারবার উদ্গীরিত হচ্ছে। ঐকান্তিক ব্যক্তিতান্ত্রিকতাই এর প্রধান উৎস।

আমাদের দেশে যাঁরা নতুন রীতির গল্প লেখক, তাঁদের প্রধান অংশই মার্কসবাদে বিশ্বাসী। যদি তাই হয়, তা হলে অন্তত এই ক'টি সূত্র তাঁরা নিশ্চয় মানেন: (১) ব্যক্তিতান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতার তাঁরা শিকার নন—তাঁরা সমাজের সামগ্রিকতায় বিশ্বাসী; (২) পরীক্ষা করবার অধিকার তাঁদের অবশ্যই আছে—কিন্তু পরীক্ষা-সর্বস্বতা (Experimentation) নিশ্চয় তাঁদের শেষ কথা নয়; (৩) তাঁরা বাস্তববাদী—জীবনগত পরিপার্শ্বের সত্যনিষ্ঠ উপস্থাপনা তাঁদের রচনায় থাকতেই হবে; (৪) তাঁদের রচনায় দেশের মাটি ও মন হবে আশ্রয়; (৫) এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নতুন সমাজবাদের বক্তব্যই হবে তাঁদের শেষ কথা।

দেখা যাচ্ছে, নতুন রীতির গল্পে মানুষের মনই হল প্রধান অবলম্বন। খুব ভালো কথা—আজকের শিল্পমাত্রেই কম-বেশি "Introvert" হতে বাধ্য। মোটা তুলির রং বুলিয়ে চোখ ভোলানো কিংবা মোটা কাঠামোর

নিছক কাহিনী শোনানো—এর কোনোটাই প্রীতিকর নয়। এই মনকে তাঁরা প্রকাশ করছেন, 'চৈতন্য-প্রবাহে'র আশ্রয়ে—যার সূচনা করেছিলেন প্রুস্ত, হেন্‌রি জেম্‌স্, অনেকটা বিকাশ ঘটিয়েছিলেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ—যার পূর্ণ মুক্তি জেম্‌স জয়েসে। এই চৈতন্য-প্রবাহ বাঁক নিচ্ছে কতগুলি প্রতীকের উপলে প্রহত হয়ে এবং শেষ পর্যন্ত একটা মানস-কুহেলির সমুদ্রে গিয়ে বিলয় লাভ করছে।

কিন্তু প্রুস্তের যুগ পার হয়েছি আমরা—হেন্‌রি জেম্‌স্ আর শেষ কথা নয়, সর্বাঙ্গীণ মানবতা সম্পর্কে ভার্জিনিয়া উল্‌ফের উন্নাসিকতার বৈদগ্ধ্য সমাজবাদী লেখকের আদর্শ হতে পারে না। যুদ্ধোত্তর ডাব্‌লিনের সূর্যহীন পথে জেম্‌স্ জয়েস্ একক যাত্রী—তাঁর সহগামী পথিক খুঁজে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। এক কথায়, মানুষের চেতনাপ্রবাহ আজ আর পাতাল-বাহিনী নয়, ঐক্য-বিষণ্ণতার দুর্গের তা পরিখা নয়—হেন্‌রি জেমসের টেস্ট্‌টিউবে তা নতুন করে পরীক্ষিত হচ্ছে না। পৃথিবী আজ বড়ো হয়েছে—দেশে দেশে মানুষে মানুষে নতুন যোগের জোয়ার এসেছে—চেতনা-প্রবাহ আজ বিশ্বচেতনার সঙ্গে মিলতে চলছে। আজকের পাঠক শুধু এইটুকুই দেখতে চাইবেন, নতুন রীতির গল্পের গতি সেই সম্মুখের অভিমুখে—না বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বুর্জোয়া মনোবিলাস এবং ব্যক্তিক নৈঃসঙ্গ্যের দিকেই ধাবমান? যদি সেই অগ্রাগামিতা না দেখি, তা হলে মনে হবে, নতুন গল্প আজ আবার পিছু হঠতে শুরু করেছে—প্রগতি সাহিত্য বহুকাল পূর্বে যাকে বর্জন করেছে তাকেই আবার গ্রহণ করতে চাইছে।

নতুন বাঙালি লেখকদের সম্পর্কে এ আশঙ্কা আমরা করতে চাই না। একটু আগেই যে সূত্রগুলির উল্লেখ করেছি—সেগুলি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সূত্র। নতুন লেখকেরা যে রীতিতেই গল্প লিখুন—তাঁদের লেখায় এই মৌল সূত্র ক'টির সাক্ষাৎ মিললেই আমরা আনন্দিত—তাঁদের সানন্দ অভিনন্দন জানাতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। প্রথম কথা—তাঁরা বুর্জোয়া পরাভববাদীদের অহংসর্বস্বতার শিকার হবেন না, দ্বিতীয়ত, তাঁরা ভাষা এবং শব্দের ভাঙচুর করে নিছক কতগুলো শৌখিন রূপচর্চা চালাবেন না, তৃতীয়ত, আজকের জীবনকে বাস্তবের প্রেক্ষিত থেকে নতুন ভাবে উপস্থিত করবেন, চতুর্থত, তাঁদের গল্পকে বাংলা দেশের

বলেই চেনা যাবে এবং সর্বশেষে তাঁরা যে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এইটি তাঁরা নিশ্চিতভাবে উপস্থিত করবেন।

মনে হচ্ছে, বাঙালি পাঠকদের মনে কিছু কিছু সংশয় তাঁরা এনেছেন। একটি চিঠি আমি পেয়েছি, সেটি অংশত উধৃত করছি এখানে। চব্বিশ পরগণার রাজপুর থেকে শ্রীযুক্ত বিকাশ বসু চিঠিটি লিখছেন:

"'ছোট গল্প—নতুন রীতি' সম্পর্কে আপনার মতামত কী? আঙ্গিকের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে পর্যাপ্ত মনোভঙ্গির বদল কি সত্যই হয়েছে? এ আন্দোলনের সঙ্গে কি আমাদের নাড়ীর যোগ আছে?"

এ চিঠির সত্যিকারের জবাব নতুন কালের গল্প লেখকেরাই দিতে পারেন।

নতুন রীতি কথাটা সম্পর্কেও কিছু প্রশ্নের অবকাশ আছে। কোনো একটা বিশেষ রীতিই যে আধুনিকতম—এ দাবি কে করতে পারেন? পৃথিবীর দেশে দেশে অসংখ্য আধুনিক লেখক অসংখ্য গল্প লিখছেন। তাঁদের নবীনত্ব বিষয়ের এবং বক্তব্যের নবীনতায়—কোনো একটি পদ্ধতিই আজ আধুনিকতার নিরিখ নয়। বরং অত্যন্ত সহজ ভাষায় অত্যন্ত গভীর করে বলাই এযুগের প্রধান চরিত্র বলে মনে হচ্ছে। ভাষাকে ভেঙেচুরে, আঁকিয়ে-বাঁকিয়ে চমকপ্রদ করার চেষ্টা একালের কথাশিল্পীর কাছে ইন্‌ফিরিয়র আর্ট বলেই গণিত হয়ে থাকে। একটু উদাহরণ দিই। গল্পটি ১৯৫৮ সালে লেখা—লেখকের বয়েস তেত্রিশ, নাম হ্যারী মার্কস্ পেট্রাকিস্। আধুনিক গল্পলেখক হিসেবে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন—

"A week passed. A week in which I saw the Widow Angela every night. Twice we ate in the little restaurant with the candles. Once we drove to an inn outside the city and ate beside a tree-shaded lake. Once we went to a movie and it was a sad love story and she cried. Several times after taking her home I stopped in for a little midnight coffee. She showed me an album of a family photographs. She had been a remarkably well-developed child—"

গল্পটি প্রেমের। অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ ভঙ্গিতে ভালোবাসার বিকাশ দেখানো হচ্ছে। আবেগ, আতিশয্য, কৃত্রিমতা কিছুরই প্রয়োজন হচ্ছে না—নিজের গতিতেই এগিয়ে যাচ্ছে। এবং যে, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ওপর দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে, তার সঙ্গে এই রীতির সম্পূর্ণ সহযোগ রয়েছে। আসলে, সাহিত্যের নতুনত্ব তার বিষয়ে—তার বিবর্ধনে—তাকে তাৎ করার ওপরেই নির্ভর করে। কোনো রীতিই তার পক্ষে একতম নয়—অন্যতম নিয়ন্তা মাত্র।

আরো একটি কথা। রীতি অর্থে কি স্টাইল? আর স্টাইল কি দল বেঁধে গড়া যায়? তা কি লেখকের শিল্প-ব্যক্তিত্বেরই বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে না?

নতুন গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আশা করি, আমাদের এই সমস্ত জিজ্ঞাসা এবং সংশয়ের উত্তর অনুচ্চারিত থাকবে না।

গ্রন্থবিহীন গ্রন্থাগার

পীযুষকান্তি মহাপাত্র

গ্রন্থাগার শব্দটি সাম্প্রতিক কালে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। সাধারণত গ্রন্থাগার অর্থে আমরা বুঝি যে কোন সংখ্যার বইয়ের সমষ্টি, যা বিশেষ কোনও পদ্ধতিতে বিষয় অনুযায়ী সাজানো আছে, তার একটি ক্যাটালগ আছে এবং পাঠকদের প্রয়োজন অনুসারে তা দেওয়া হয়। সুতরাং গ্রন্থাগার শব্দের সঙ্গে বইয়ের যোগাযোগ অচ্ছেদ্য। কিন্তু বর্তমান কালে বই ছাড়াও অনেক উপাদান গ্রন্থাগারে থাকে পাঠকদের অতিরিক্ত সাহায্য করবার জন্মে এবং গবেষণার সহায়তার জন্মে। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রে এবং পাঠকের বিশেষ প্রয়োজনে এই সব উপাদানের মূল্য অপরিসীম। উত্তরোত্তর এর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান কালে বড় লাইব্রেরীগুলোতে বই ছাড়া এই উপাদান থাকে, বিশেষ করে যেখানে গবেষণা চলে বিভিন্ন বিষয়ে। বিশেষ বিষয়ের লাইব্রেরীগুলোতে এই সব উপাদানের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়, এবং ক্রমশ তার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে।

বই ছাড়া এই সব লাইব্রেরী উপাদানের মূল্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বইয়ের থেকেও বেশী এবং বইয়ের থেকেও বেশী প্রয়োজনীয়। তার কারণ, বইয়ের দুটো অসুবিধে আছে। প্রথমত, বই কোন এক ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তির লেখা, ফলে তাতে লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তা, আদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। তা যে কোন বিষয়েই হোক না কেন। বইতে পাঠক লেখকের কথা পাঠ করেন, সে দিক দিয়ে বইতে পাই পরোক্ষ জ্ঞান; যা লেখকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশ্রিত। সৃষ্টিধর্মী রচনা বাদ দিলে কোন কোন বিষয়ে পরবর্তী কালের গবেষণায় পূর্বে প্রকাশিত বই মূল্যহীন এবং ভ্রান্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হয়। দ্বিতীয়ত, বইতে মুদ্রণকাল অবধি সংগৃহীত তথ্য

থাকে। মুদ্রণের পরে পরবর্তী সংস্করণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন তথ্য সংগৃহীত হলে বইতে তা থাকা সম্ভব নয়, ফলে বই কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ হতে পারে না। নতুন নতুন গবেষণার ক্ষেত্রে এবং যে যুগে প্রতি মুহূর্তেই নতুন বিস্ময় আমাদের চমক লাগায়, বইতে সেই 'শেষতম' তথ্য না থাকতেও পারে। বইয়ের এই দুটো অসুবিধের জন্য এবং কোন কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ উপাদানের উপর নির্ভর করা বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বীকৃত বলে লাইব্রেরীতে বই ছাড়া অন্যান্য উপাদানের মূল্য ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ করে এই সব উপাদান গবেষণার বিশেষ সহায়তা করে। জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূ-বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ভাস্কর্য, শিল্পকলা, সমাজ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, প্রাগৈতিহাসিক যুগ, লোকবৃত্ত প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বই ছাড়া অন্যান্য উপাদানের উপর বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নির্ভর করতে হয় অনেক বেশী। এই সব বিষয়ে প্রত্যক্ষ এবং সর্বাধুনিক জ্ঞান লাভের জন্যে মানচিত্র, চার্ট, মডেল, নমুনা, রিপোর্ট, বক্তৃতা-সংগ্রহ, ফিল্ম, টেপ রেকর্ড ও গ্রামোফোন রেকর্ড, সংবাদ পত্রের অংশ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতির উপর নির্ভর করতে হয় অনেক বেশী। প্রাচীন সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করতে হলে হাতে লেখা পুথির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। যে সব মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য বই কাছের লাইব্রেরীতে পাওয়া যা না সে সব বই বা পুথি মাইক্রোফিল্ম করতে হয় এবং লাইব্রেরীতে সেই সব মাইক্রোফিল্ম রাখতে হয়। সমাজ বিজ্ঞান এবং নৃবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণাকর্মীদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে আঞ্চলিক প্রত্যক্ষ তথ্য এবং পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হয়। গবেষণার ক্ষেত্রে এই সব উপাদানের মূল্য অপরিসীম।

বই ছাড়া এই সব অন্যান্য উপাদান অথবা পাঠ-সহায়ক বিভিন্ন শ্রেণীর লাইব্রেরীতে থাকতে পারে। লাইব্রেরীর শ্রেণীভেদে অথবা বিষয়ভেদে উপাদানগুলোরও পার্থক্য ঘটে। যে লাইব্রেরীতে যে বিষয়ের উপর বিশেষ চর্চা করা হয় সেই বিষয়ের বই ছাড়া এই সব উপাদানের গুরুত্ব বেশী দেওয়া হয়। বিভিন্ন লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ধরণের উপাদান থাকে। মোটামুটিভাবে এই সব উপাদানগুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) পুথি—প্রাচীন সাহিত্য গবেষণায় পুথির মূল্য অপরিসীম। আমাদের দেশে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে হাতে লেখা পুথি ছিল সাহিত্য প্রচারের মাধ্যম। প্রাচীন সাহিত্য উদ্ধার করতে হলে এবং প্রাচীন সাহিত্যের প্রকৃত পাঠ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে পুথির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহ, তিব্বতী, নেপালী, উর্দু, আরবী, ফারসী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার পুথি ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংগৃহীত আছে। শুধু সাহিত্য নয়, দর্শন; ধর্ম, গণিত, দর্শনের বিভিন্ন টীকা, ব্যাকরণ, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনেক পুথি সংগৃহীত হয়েছে। এই সব পুথি আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক। যন্ত্রের মাধ্যমে সৃষ্ট নয় বলে প্রত্যেকটি পুথি একক মহিমার মূল্য বহন করে।

পুথি ছাড়াও ঐতিহাসিক দলিলপত্র অনেক লাইব্রেরীতে আছে। ঐতিহাসিক চিঠি পত্র, সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল, দানপত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। ইতিহাসের গবেষণায় এই সব উপাদান অমূল্য। অনেক ক্ষেত্রে একটা দলিল প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ধারণার উপর নূতন আলোকপাত করতে পারে, এমন কি, পরিবর্তন করতেও পারে।

(২) অনুশাসন—প্রাচীনকালে অনেক নৃপতি পাহাড়ের গায়ে, স্তম্ভের গায়ে অনেক অনুশাসন লিখে রেখে গেছেন। ধাতুর পাতেও অনেক লেখা পাওয়া যায়। সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল অথবা দানপত্র হিসাবে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। ছোট পাথরের ফলকে, ধাতুর পাতে দানলেখ পাওয়া যায়। মন্দিরের গায়ে অনেক সময় মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ও নৃপতির নাম উৎকীর্ণ দেখা যায়। পোড়ামাটির ফলকে অনেক লেখার নমুনা পাওয়া গেছে। এই সব অনুশাসন, দানলেখ, উৎকীর্ণ ফলক অনেক লাইব্রেরীতে সংগৃহীত হয়েছে। ইতিহাসের গবেষণায় এই সব উপাদান অমূল্য।

(৩) সাময়িক পত্র—সাময়িক পত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকা। প্রথম শ্রেণীতে দৈনিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক সংবাদপত্রকে ধরা যেতে পারে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সংবাদপত্রের অংশগুলো কেটে রাখা যেতে পারে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের গবেষণায় এ ধরনের জিনিষ

প্রয়োজনীয়। সংবাদপত্রে অনেক সময় সংবাদ সমীক্ষা, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কোন বিষয়ে নতুন সংবাদ এবং বিভিন্ন বিষয়ে রচনা থাকে। বিষয় অনুযায়ী ভাগ করে রাখলে পাঠকের সুবিধে হতে পারে। এই সব সাময়িক সংবাদ বা আলোচনার উপর বই অনেক সময় প্রকাশিত হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে বিশেষ সময় অনুযায়ী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা। সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ বিশেষ মূল্যবান। কোন বই লেখার আগেই অনেক সময় সাময়িক পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়। সেদিক দিয়ে সাময়িক পত্রিকা বইয়ের চেয়ে বেশী আধুনিক।

(৪) ভাষণ, বক্তৃতা, সম্মেলন বিবরণী প্রভৃতি—কোন বিশেষ সম্মেলনে অথবা সভায় বক্তা যে ভাষণ দেন তা পুস্তিকাকারে ছাপা হয়। এগুলো অনেক সময় বইয়ের মধ্যে স্থান পায়। অনেক সময় সম্মেলন বিবরণীতে বিভিন্ন বক্তার ভাষণ মুদ্রিত হয়। এই ধরণের উপাদান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার সহায়তা করে। পত্রিকার 'অফ্‌প্রিন্ট' অথবা অতিরিক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত একক প্রবন্ধ এই বিভাগে থাকতে পারে।

(৫) পুস্তিকা—সাধারণত আমরা যাদের 'প্যামফ্লেট' এবং 'হ্যাণ্ড বুক' বলি, সে ধরণের পুস্তিকা এই শ্রেণীতে পড়ে। পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সমৃদ্ধ বই না হয়ে এই ধরণের পুস্তিকা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই সব পুস্তিকার মূল্য অনেক।

(৬) রিপোর্ট—নৃবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, লোকগননা এবং সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য কয়েকটি শাখায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে প্রত্যক্ষ আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহের উপর অধিকতর নির্ভর করতে হয়। সংস্কৃতির মিশ্রণ, সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক রীতিনীতি, লোকধর্মের পারস্পরিক প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে "ফিল্ড ওয়ার্ক'-এর উপর নির্ভর করতে হয়। এই ধরণের তথ্য সংগ্রহের মুদ্রিত অথবা টাইপ করা কপি লাইব্রেরীতে থাকতে পারে। এর উপর নির্ভর করে সমাজ বিজ্ঞানী এবং গবেষকেরা তাঁদের সিদ্ধান্ত স্থির করতে পারেন। এইসব উপাদান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান।

(৭) চিত্র—প্রবাদ আছে, আলো সম্পর্কে শত শত বক্তৃতার চেয়ে একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললেই আলো জিনিষটা অনেক সহজে বোঝা যায়। বইয়ের পরিপূরক হিসেবে তাই চিত্রের ব্যবহার স্বাভাবিক

কালে খুব বেড়ে গেছে এবং লাইব্রেরীতে এগুলো আজকাল যত্ন করে রাখা হচ্ছে। যেখানে সম্ভব; সেখানে চিত্রের মাধ্যম শিক্ষাদান অথবা গবেষণার পথ অনেক সুগম করেছে। ভূবিজ্ঞান, ইতিহাস, বিশেষ করে প্রাচীন ইতিহাস, শিল্পকলা, বাস্তুবিজ্ঞান প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে চিত্র বিশেষ মূল্যবান। ভূবিজ্ঞানে মাটির স্তর, জলের গভীরতা, মৌসুমী বায়ুর গতিপথ, হিমবাহ, ভৌগলিক প্রকৃতি, আবহাওয়ার পার্থক্য প্রভৃতি বিষয় বোঝাতে ছবি অনেক সাহায্য করতে পারে। প্রাচীন ইতিহাসে নগর বিন্যাস, অলঙ্কার, শীলমোহর, মুদ্রা প্রভৃতির গবেষণায় চিত্র বিশেষ মূল্যবান। শিল্পকলার গবেষণায় শিল্প এবং কলার বিভিন্ন নমুনা, ভাস্কর্য, মূর্তিশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে চিত্র প্রত্যক্ষ সাহায্য করে। বাস্তুবিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষয়ের স্কেচ অনুশীলনের সহায়তা করে। আরও অনেক বিষয়ে চিত্র বিশেষ সাহায্য করে।

সাম্প্রতিক কালে বাণিজ্যিক সংস্থা, শিল্প সংস্থা প্রভৃতি বিজ্ঞাপন এবং প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে চিত্রের ব্যবহার করছে। 'আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রী' এ যুগের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি। ইদানীং ভ্রমণ সহায়ক সংস্থাগুলি বিভিন্ন স্থানের রঙ্গিন চিত্র ব্যবহার করছে পর্যটক আকর্ষণের জন্য। বিভিন্ন স্থানের প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এগুলি বিশেষ মূল্যবান।

চিত্র সংগ্রহ করা যেতে পারে চিত্রিত সাময়িক পত্রিকা থেকে এবং শিল্পকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষ সংখ্যা থেকে। সম্মেলন স্মারক গ্রন্থেও অনেক সময় ছবি থাকে। সরকার এবং বিভিন্ন ভ্রমণ সহায়ক সংস্থা যে বিজ্ঞাপন দেয় তাতে খুব মূল্যবান ছবি থাকে। ঐতিহাসিক স্মারক, ঐতিহাসিক স্থান, প্রাচীন মন্দির প্রভৃতির ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে। আঞ্চলিক বিষয়ের চিত্রিত পোষ্টকার্ড এ ব্যাপারে ব্যবহার করা যায়। মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য চিত্রকলার নকল এ বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান।

(৮) ফিল্ম—বই পড়ার সহায়ক হিসেবে আজকাল ফিল্ম খুব ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেক ছোটখাট বিষয়ের উপর বই লেখা হয় না বা যে সব দৃশ্য বই পড়ে ভালভাবে বোঝা সম্ভব নয়, সেইসব বিষয়ে ফিল্ম তৈরী করে রাখলে লাইব্রেরীর খুব কাজে লাগতে পারে। ফিল্ম দু'রকমের হতে পারে, সাদা-কালো অথবা রঙীন। মুভি-ফিল্মের আর একটা সুবিধে যে এক বিশেষ ঘটনা বা দৃশ্য খুঁটিনাটি সহ দেখানো যেতে পারে, এবং

ছবির মধ্যে দৃশ্য পরম্পরা থাকে বলে সম্পূর্ণ বিষয় বুঝতে সুবিধে হয়। ভূবিজ্ঞানে প্রাকৃতিক বিচিত্র দৃশ্যের ফিল্ম, অগম্য স্থানের আকাশ থেকে তোলা ফিল্ম, দুর্গম পর্বতের ফিল্ম (যেগুলো আবার পর্বতারোহীদের কাজে লাগবে) প্রভৃতি বিশেষ মূল্যবান। ইতিহাসের গবেষণায় প্রাচীন মন্দিরের বা ঐতিহাসিক স্থানের ফিল্ম খুব কাজে লাগবে। সেই সব স্থানে না গিয়েও কাজ করা যেতে পারে। সমাজ বিজ্ঞান বা নৃবিজ্ঞানে বিভিন্ন জাতির বা অঞ্চলের জীবন যাত্রা অথবা অনুষ্ঠানের ফিল্ম থাকলে অনেক সাহায্যে আসবে। ফিল্মের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের সুবিধে হতে পারে।

ফিল্মকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ফিল্ম—কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ঐ বিষয় সম্পর্কে ফিল্ম।

(খ) ডকুমেন্টারী ফিল্ম—কোনও ঘটনা অথবা বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষ ঘটনার ফিল্ম।

(গ) সংবাদ পরিবেশনমূলক ফিল্ম—কোনও ঘটনা অথবা বিষয় সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পরিবেশনের জন্য ফিল্ম। বয়স্কদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ ধরণের ফিল্ম খুব প্রয়োজনীয়।

(ঘ) নিদর্শনমূলক ফিল্ম—সাহিত্য, চারুকলা, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ে ঐ বিশেষ বিষয়কে বোঝাবার জন্য ফিল্ম। লোকনৃত্যের ফিল্ম, কোন বিশেষ অঞ্চলের অলঙ্কার অথবা শিল্পকলা চিত্রিত হয়েছে এমন ফিল্ম এই ভাগে পড়তে পারে।

(ঙ) ঐতিহাসিক ফিল্ম—ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা স্মারক প্রভৃতির ফিল্ম এর মধ্যে পড়ে। আঁকা ছবি অথবা পুরোণো ফটো নিয়ে কোনও ঐতিহাসিক ঘটনার ফিল্ম হতে পারে। ইতিহাসের ঘটনা অথবা বিষয়কে বোঝাতে ফিল্ম অনেক সাহায্য করে।

(চ) ভ্রমণমূলক ফিল্ম—দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানের আকর্ষণীয় ফিল্ম রাখা যেতে পারে। এতে বিভিন্ন স্থান সম্পর্কে লোকের ঔৎসুক্য বাড়বে।

(ছ) নিউজ রিল—সমসাময়িক ঘটনার উপর তোলা ফিল্ম। প্রয়োজন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ছবি ৩৫ মিলিমিটার, ১৬ মিলিমিটার অথবা ৮ মিলিমিটার ফিল্মে তোলা যেতে পারে।

(৯) ফটোকপি—সাধারণত ফটোস্টাট ছবিগুলো এই ভাগে পড়ে। কোনও বিশেষ বস্তুর অবিকল নকল গবেষণার বিশেষ সহায়ক। কোনও দলিলের মূল্যবান অংশ, ঐতিহাসিক চিঠিপত্রের পৃষ্ঠা, পুথির কোনও মূল্যবান পৃষ্ঠা প্রভৃতি ফটোস্টাট করে নিলে অনেক সন্দেহ, তর্ক এবং ভ্রান্তির অবসান ঘটে। সেক্ষেত্রে ফটো কপি করে রাখাই সঙ্গত। মূল বস্তু একটিই হয়, কিন্তু ফটো কপি অনেক হতে পারে। ফলে অনেক লাইব্রেরীতেই থাকতে পারে। তাতে ঐ বিশেষ বস্তু পাবার জন্যে শ্রম এবং অর্থব্যয় করতে হয় না সহজেই কাজ হয়। এ ছাড়াও অনেক ঐতিহাসিক চিঠি বা দলিল বহু ব্যবহারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ফটো কপি ব্যবহার করাই সঙ্গত। তাতে প্রত্যক্ষ বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা হয় অথচ হাতের কাছে না পাওয়া গেলে অসুবিধে হয় না। আর একটা সুবিধে, মূল বস্তু দুষ্প্রাপ্য হলেও কাজের অসুবিধা হয় না। বিভিন্ন বিষয়ে তোলা ফটোগ্রাফও এই ভাগে পড়তে পারে। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, শিল্পকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য ফটোগ্রাফ রাখা যেতে পারে।

(১০) মাইক্রো কপি—বাইরের কোন ঘটনা অথবা অনুষ্ঠান ফিল্ম হতে পারে, কোনও ঐতিহাসিক দলিলের অবিকল ফটোস্টাট করা যেতে পারে কিন্তু যদি পুরো বই নকল করতে হয় তখন ফিল্মেও হবে না অথবা ফটোস্টাট করতে হলে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে। তা ছাড়া পুরো বইয়ের ফটোস্টাট লাইব্রেরীতে অনেক জায়গা দখল করবে। এইভাবে বেশী জিনিষ রাখা যাবে না আর ব্যবহারও অসুবিধে। সেইজন্য মাইক্রো কপি হচ্ছে সুবিধেজনক পদ্ধতি। তাতে জায়গা কম লাগে, কম খরচেও করা যায়। এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম নিগেটিভ ফিল্ম ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশী উপাদান রাখা যায়। যে সব বই দুষ্প্রাপ্য এবং যে সব বই অন্য দেশে আছে, হস্তান্তরিত হবে না, সেই সব বই, দলিল অথবা যত বড়ই চিঠিপত্র হোক না কেন, সম্পূর্ণ মাইক্রো ফিল্ম করে রাখা যায়। মাইক্রো কপি নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়।

(ক) মাইক্রো ফিল্ম—নিগেটিভ মাইক্রো ফিল্মে সম্পূর্ণ উপাদান রাখা যেতে পারে। তবে মাইক্রো ফিল্ম ব্যবহার করতে মাইক্রো ফিল্ম রীডার অথবা মাইক্রো ফিল্ম প্রোজেকটার লাগবে।

(খ) মাইক্রো কার্ড—কার্ডের আকারে পজিটিভ প্রিন্ট। বইয়ের মূল্যবান অংশ, পত্রিকার প্রবন্ধ প্রভৃতি কার্ডে সাজিয়ে রাখা যেতে পারে, তাতে কম জায়গা লাগে, দুষ্প্রাপ্য জিনিষও রাখা যায়। নিগেটিভ মাইক্রো কার্ড রাখা যেতে পারে, তাতে মাইক্রো ফিল্ম রীডার ব্যবহার করতে হবে।

(গ) মাইক্রো প্রিন্ট—মূল পৃষ্ঠা থেকে মাইক্রো ফিল্ম করে অফসেট-লিথো ছাপার জন্ত প্লেট করা হয়। কপি বেশী করতে হলে এই পদ্ধতি ভাল। প্লেট ছেপে নেওয়া যায়। সংখ্যায় বেশী করতে হলে মাইক্রো ফিল্মের থেকে এই পদ্ধতিতে খরচ অনেক কম পড়ে।

(১১) স্লাইড—সিনেমা ছাড়াও ছোট-খাট ব্যাপারে ম্যাজিক লণ্ঠন ব্যবহার করা হয়। ধারাবাহিক ঘটনা বর্ণনার দরকার হয় না যে সব ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র একক ঘটনাগুলোকে বোঝাতে হয়, সে ক্ষেত্রে ম্যাজিক লণ্ঠনে স্লাইড দেখান সুবিধেজনক। বয়স্কদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে, সরকারী প্রচারে, গ্রামে মহামারী নিবারণ, কোনও সামাজিক নির্দেশ দিতে হলে বক্তৃতার সঙ্গে স্লাইড দেখালে ফল খুব ভাল হয়। গ্রামের দিকে বিশেষ করে, অনগ্রসর এলাকাগুলোতে, কিংবা আদি-বাসী এলাকায় কোনও প্রচার করতে হলে এবং নির্দেশ দিতে হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্লাইড দেখালে লোকজনকে আকর্ষণ করা যায় সব চেয়ে বেশী এবং তার ফলাফলও সাফল্যজনক হয়। স্লাইড সাদা-কালো এবং রঙীন হতে পারে। এগুলো শিল্পীকে দিয়ে এঁকিয়ে নিতে হয়। কোনও শিক্ষামূলক বক্তৃতার ক্ষেত্রেও স্লাইড সহযোগে বক্তৃতার সাফল্য অসাধারণ। বয়স্কদের শিক্ষাদান, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা, গ্রামে প্রচার, দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়কে সহজ করে বোঝান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বক্তৃতার সহযোগী হিসেবে স্লাইড খুব মূল্যবান সহায়তা করে।

(১২) টেপ রেকর্ড এবং গ্রামোফোন রেকর্ড—দ্রষ্টব্য বিষয়গুলো ফিল্ম, স্লাইড প্রভৃতি দিয়ে বোঝান যায়, তেমনি শ্রোতব্য বিষয়গুলো বোঝাবার জন্তে রেকর্ড দরকার হয়। আজকাল লাইব্রেরীতে রেকর্ড রাখার প্রচলন বাড়ছে। আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্রে রেকর্ড একটা উপাদান সন্দেহ নেই, কিন্তু অন্যান্ত ক্ষেত্রেও রেকর্ড খুব প্রয়োজনীয়। পরলোকগত ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর আমরা রেকর্ডের মাধ্যমে শুনতে পারি। তাঁদের বক্তৃতার ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, ব্যক্তিগত উচ্চারণ রেকর্ডের মাধ্যমে পেতে পারি।

ফটোস্টাট করা যেমন মূল বস্তুর সঠিক প্রতিলিপি, রেকর্ডও তেমনি বক্তার প্রত্যক্ষ এবং সঠিক নিদর্শন। রেকর্ড ছাড়া পরলোকগত ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আমরা কোনও রকমে পেতে পারি না। তাঁদের মৃত্যুর পরেও পরবর্তী মানুষেরা কণ্ঠস্বরকে প্রত্যক্ষবৎ মনে করতে পারেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়ক-দের ঐতিহাসিক বক্তৃতা রেকর্ড করে রাখলে মূল দলিলের কাজ করে। ঐতিহাসিক গবেষণায় এর মূল্য অনেক।

সঙ্গীতের সুরকে সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারে রেকর্ড। একযুগে গায়কের ভঙ্গি বা রীতি পরবর্তীকালে রেকর্ডের মাধ্যমে শোনা যায়। তাতে সুরের ক্রমবিকাশ বুঝতে পারি। লোকসঙ্গীত অঞ্চলভেদে এবং সঙ্গীতের রীতিভেদে পৃথক। এ বিষয়ে রেকর্ড ছাড়া সঠিক এবং প্রামাণ্য সুর অন্য কোনও ভাবেই পাওয়া যেতে পারে না। সঙ্গীতের গবেষণায়, বিশেষ করে সুরবিচারে রেকর্ড প্রামাণ্য দলিল।

অজ্ঞাত ভাষা শিক্ষার কাজে আজকাল রেকর্ড ব্যবহৃত হচ্ছে। ভাষা কেবলমাত্র শব্দসমষ্টি নয়, উচ্চারণের প্রকৃত রীতিও ভাষাশিক্ষার অঙ্গ। সেজন্য ভাষা শিক্ষা নির্ভুল এবং উচ্চারণের বিশুদ্ধতার জন্য রেকর্ডের প্রচলন ক্রমশ বাড়ছে। লিঙ্গুয়াফোন এ ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

(১৩) মানচিত্র—ভূ বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠের সহায়তায় মানচিত্র অপরিহার্য। একস্থান থেকে অন্য স্থানের দূরত্ব, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, আবহাওয়া, মৌসুমী বায়ুর গতি, যোগাযোগের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে মানচিত্র প্রামাণ্য মাধ্যম। কেবলমাত্র ভূবিজ্ঞান নয়, ভূপ্রকৃতি বুঝতে হলেও মানচিত্র প্রয়োজনীয়। যদিও মানচিত্র ভূবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তবুও বিভিন্ন বিষয়ে এবং বিভিন্ন রীতিতে মানচিত্র তৈরী করা হয়। মানচিত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্কেলের অনুপাত, প্রকাশকের সুনাম ও নৈপুন্য, যতদূর সম্ভব বিস্তারিত উল্লেখ এবং প্রকাশকাল লক্ষ্য করা প্রয়োজনীয়। দেশ বিভাগ এবং সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্য মানচিত্রের প্রকাশ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

মানচিত্রকে বিষয় অনুসারে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যেতে পারে:

(ক) রাজনৈতিক—বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সীমানা নির্ধারক

মানচিত্র এই ভাগে পড়ে। সচরাচর এই ধরণের মানচিত্র বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়।

(খ) ভূবিদ্যা বিষয়ক (জিওলজি)—সাধারণত দেশের জিওলজিক্যাল সার্ভে এই মানচিত্র প্রকাশ করে। এতে ভূপ্রকৃতির বিন্যাস, ভূত্বকের প্রকৃতি, পার্বত্য অঞ্চলের সীমানা, সমুদ্রের গভীরতা প্রভৃতি বিষয় নির্দেশিত হয়।

(গ) আবহাওয়া সম্পর্কিত—তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বাতাসের গতিপথ, বৃষ্টিপাত, মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ, প্রাকৃতিক ঝড়ের এলাকা, গ্রীষ্মমণ্ডল, আর্দ্র অঞ্চল প্রভৃতি বিষয়ের মানচিত্র এই ভাগে পড়ে।

(ঘ) প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে—অরণ্য ও বৃক্ষলতার বিন্যাস, ফল, ফুল ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ উপাদানের বিন্যাস, জীবজন্তুর প্রাপ্তিস্থানের এলাকা, কৃষিজ, খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের বিন্যাস প্রভৃতির মানচিত্র এই ভাগে পড়ে।

(ঙ) ঐতিহাসিক—রাজনৈতিক অবস্থা ভূগোলকে প্রভাবিত করে এবং ভূগোলও রাজনৈতিক অবস্থাকে অনেক সময় প্রভাবিত করে। অতীতকাল থেকে সেইজন্য মানচিত্রের পরিবর্তন হয়েছে বারে বারে। অতীত ইতিহাসে বিভিন্ন রাজার রাজ্য বিস্তার, রাজ্য জয় এবং পরাজয়ের জন্য ভৌগোলিক সীমানা বারে বারে পুনর্বিন্যাস হয়েছে। ইতিহাসের পঠন পাঠন ও গবেষণায় সেই জন্য ঐতিহাসিক মানচিত্র খুবই প্রয়োজনীয়। রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্যও অনেক রাজা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন। শাসন বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যে ভূখণ্ড পূর্বে এক দেশ বলে মনে করা হত পরে তা একাধিক স্বয়ংশাসিত দেশে পরিণত হয়েছে। দেশ বিভাগের ফলেও সীমানা পরিবর্তিত হয়েছে। কোনও দেশের মধ্যে ভাষাগত বা অন্যান্য কারণে সীমানার পুনর্বিন্যাস হয়েছে। অতীত কাল থেকে এই পরিবর্তন নানাভাবে অব্যাহত আছে। ইতিহাসের উপাদানের সহায়ক হিসেবে ঐতিহাসিক মানচিত্র খুবই মূল্যবান।

(চ) জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কীয়—আকাশে বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান, বিভিন্ন ঋতুতে গ্রহ নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তন, সূর্য গ্রহণ, চন্দ্র গ্রহণ, সৌর

মণ্ডল, বিভিন্ন নক্ষত্র মণ্ডলী, ধূমকেতু, ছায়াপথ প্রভৃতি বিষয়ের মানচিত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ মূল্যবান।

(ছ) পুরাতত্ব—প্রাগৈতিহাসিক যুগে এবং অতীত ঐতিহাসিক যুগে সভ্যতা বিকাশ নির্দেশক মানচিত্র আছে। বিভিন্ন সময়ে মানব সমাজের বসতি স্থাপন ও সভ্যতা বিস্তারের এলাকা নির্দেশিত মানচিত্র পাওয়া যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের বিভিন্ন জাতির বসতি, প্রস্তর ব্যবহারকারী মানব সমাজ, ধাতু ব্যবহারকারী মানব সমাজ, কৃষিজীবী ও পশুপালক মানব সমাজ, সভ্যতা বিস্তারের গতিপথ, প্রভৃতি বিষয়ের মানচিত্র পাওয়া যায়। প্রাচীন মানব সমাজ, প্রাচীন সভ্যতা ও অতীত সংস্কৃতির গবেষণায় এই ধরণের মানচিত্র মূল্যবান।

(জ) নৃ-বিজ্ঞান বিষয়ক—মানব সমাজের বিভিন্ন শাখার ভৌগোলিক বিন্যাস, মানুষের বাহ্যিক আকৃতির বিচার, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বিন্যাস, মানব সমাজের বিভিন্ন শাখার নির্দেশ প্রভৃতি বিষয়ক মানচিত্র নৃ-বিজ্ঞান পাঠের সহায়ক।

(ঝ) লোকগণনা বিষয়ক—বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানব জাতির বিন্যাস, নগর ও গ্রাম ভিত্তিক মানব সমাজের বিন্যাস, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের বিন্যাস, জাতিগত ও বৃত্তিগত পার্থক্য নির্দেশ, উৎসব, আচার-আচরণ, সামাজিক রীতি প্রভৃতি বিষয়ে মানচিত্র বিভিন্ন সময়ের মানব সমাজ বিন্যাসের প্রমাণ। বৃত্তির পার্থক্য, জাতির পার্থক্য, অর্থ নৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন সমাজ ও ধর্মের পারস্পরিক প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে মানচিত্র সংশ্লিষ্ট বিষয় অনুশীলনের সহায়ক।

উপরোক্ত শ্রেণীগুলো ছাড়াও অন্যান্য নানা ধরণের মানচিত্র সাম্প্রতিক কালে প্রস্তুত হচ্ছে। কৃষিজাত দ্রব্যের বিন্যাস, খনিজ দ্রব্যের বিন্যাস, শিল্প নগরীগুলির অবস্থান, কলকারখানার অবস্থান এবং পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত তুলনামূলক বিষয়ের নানা ধরণের মানচিত্র ব্যবহৃত হয়। সমাজ বিজ্ঞান আলোচনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের মানচিত্রও তৈরী হচ্ছে। খনিজ দ্রব্য, কৃষিজ দ্রব্য, শিল্পজাত দ্রব্য, উৎপাদন, ভারী শিল্পের সহায়ক, যেমন কয়লা, বিদ্যুৎ, জল-বিদ্যুৎ প্রভৃতির বিন্যাস সম্পর্কেও বহু মানচিত্র তৈরী হচ্ছে।

এ্যাটলাস ও গ্লোব এই পর্যায়ে পড়তে পারে। এ্যাটলাসে অনেক ধরণের মানচিত্র এক সঙ্গে থাকে। গ্লোব গোলাকার পৃথিবীর নির্দেশক।

(১৪) চার্ট—একটা অঞ্চলকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে যেমনি মানচিত্র প্রয়োজন তেমনি কোনও বিশেষ বস্তু, জীব অথবা তার অংশ-বিশেষকে পর্যবেক্ষণ করতে চার্ট অত্যন্ত মূল্যবান'। পদার্থ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক চিত্রন, রসায়নের ব্যবহারিক চিত্রন, জীব-বিজ্ঞানের বিভিন্ন জীব ও তাদের বংশাবলী, জীবদেহের বিভিন্ন অংশের চিত্র, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদ্ভিদ, লতা, ফুল, ফল প্রভৃতির চিত্রন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানব দেহের বিভিন্ন অঙ্গের চিত্রন, রক্ত চলাচল, শিরা ও ধমনী বিন্যাস, হাড়ের বিভিন্ন চিত্র, নৃ-বিজ্ঞানে মানব দেহের অঞ্চল ও বংশ ভেদে পার্থক্য প্রভৃতি সম্পর্কীয় চার্ট বিষয়গুলোকে বিশদভাবে বুঝবার জন্য আঁকা হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সম্যক ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য চার্ট বিশেষ মূল্যবান।

(১৫) তথ্য সংগ্রহ—সাধারণ গ্রন্থাগারে দৈনিক নানা ধরণের প্রশ্ন আসে পাঠকের পক্ষ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নানা বিষয়ে গবেষণামূলক প্রশ্ন আসে। বিশেষ গ্রন্থাগারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা ধরণের প্রশ্ন আসে। লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে এ সবের উত্তর দিতে হয়। প্রশ্ন যেমন বিশেষ কোন জিজ্ঞাসা থেকে সুরু করে গবেষণার সমস্যা পর্যন্ত হতে পারে, উত্তরও তেমনি বিশেষ একটি খবর থেকে গবেষণার সহায়তা পর্যন্ত হতে পারে। এই সব অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর সংশ্লিষ্ট পাঠক পেলেও পরবর্তীকালে কোনও পাঠক ঠিক ঐ প্রশ্ন করতে পারেন অথবা অনুরূপ প্রশ্ন করতে পারেন। ফলে লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে আবার সেই উত্তরগুলো খুঁজে বার করতে হয়। এই অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় না যদি লাইব্রেরীতে সেই উত্তরগুলো বিষয় অনুযায়ী কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে রাখা যায়। যে সব প্রশ্নের উত্তর হাতের কাছেই পাওয়া যায় সেগুলো রাখার দরকার নেই, কিন্তু যে উত্তরগুলো খুঁজতে সময়, পরিশ্রম ও চিন্তা দরকার সেগুলো লাইব্রেরীতে তৈরী রাখা কাজের

সুবিধার পক্ষে ভাল। এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ বিষয় অনুযায়ী বর্ণানুক্রমিক রাখা যেতে পারে। 'ভার্টিক্যাল ফাইল' এই ধরণের কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়। একই প্রশ্ন বার বার এলেও লাইব্রেরীর লোকজনকে সে জন্য বিব্রত হতে হয় না, উত্তরও সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া যায়।

(১৬) তালিকা—লাইব্রেরীতে বিভিন্ন প্রকাশকের পুস্তক তালিকা রাখা অনেক সময় প্রয়োজন। সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বই সম্পর্কে খোঁজ খবর দিতে হলে সর্বাধুনিক তালিকা লাইব্রেরীতে রাখা উচিত। বিশেষ গ্রন্থাগারে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত তালিকা রাখা দরকার। টেক্‌নিক্যাল লাইব্রেরীতে উৎপাদিত পণ্য, পণ্যের মূল্য, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়েও তালিকা রাখা ভাল।

(১৭) গ্রন্থপঞ্জী—বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ ও গবেষণার জন্য পাঠকের পক্ষ থেকে গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত প্রশ্ন আসে। গ্রন্থপঞ্জী গবেষণার বহুল সহায়তা করে। গ্রন্থাগারে সর্বাধুনিক গ্রন্থসহ গ্রন্থপঞ্জী রাখলে পাঠকের প্রভূত সহায়তা করা হয়।

(১৮) ডকুমেণ্টেশান, এ্যাবষ্ট্রাক্ট ও ইন্‌ডেক্স—সাম্প্রতিক কালে এত পত্রিকা, পুস্তিকা, ভাষণ, সংবাদ সমীক্ষা, সংবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হচ্ছে যে সব দিকে লক্ষ্য রাখা লাইব্রেরীর পক্ষে অসুবিধেজনক হয়ে যাচ্ছে। এই সব উপাদানকে লাইব্রেরীতে ঠিকমত রাখাও একটা প্রকাণ্ড সমস্যা। অথচ এগুলোকে অবহেলাও করা যায় না, কারণ কোন পাঠকের কোন মূল্যবান তথ্য কোনখানে পাওয়া যাবে তা আগে থেকে অনুমান করা শক্ত। সেইজন্য বিভিন্ন বিষয়কে এবং প্রকাশিত রচনাকে বিশেষ পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত আকারে লাইব্রেরীতে বৈজ্ঞানিক ভাবে সাজিয়ে রাখতে হয়, যাতে অল্প জায়গাতে অনেক উপাদান থাকে এবং অল্প সময়ে ও পরিশ্রমে সেগুলো পাঠকের কাছে পরিবেশন করা যায়। বিজ্ঞান বিষয়ক ও টেক্‌নিক্যাল লাইব্রেরীগুলোতে এই পদ্ধতি সাম্প্রতিককালে ব্যাপক ভাবে অবলম্বন করা হচ্ছে। সর্বাধুনিক তথ্য, সংবাদ এবং তত্ত্ব এই

পদ্ধতিতে লাইব্রেরীতে রাখা যায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সর্বাধুনিক তথ্যের মূল্য অপরিসীম।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ব্যাপকতর গবেষণার ফলে গ্রন্থাগারে উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। গবেষণার রীতি যতই ব্যাপক, সংহত এবং তীক্ষ্ম হচ্ছে, ততই বইয়ের থেকে অন্যান্য উপাদানের উপর নজর পড়ছে বেশী। কারণ তাতে বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব এবং বিষয়ের সর্বাধিক অগ্রগতির সঙ্গে গবেষণাকে একই তালে নিয়ে যাওয়া যায়।

বঙ্গ-সংস্কৃতির এক দশক : কয়েকটি দিক

প্রণবরঞ্জন ঘোষ

"আত্মসংস্কৃতি র্বাব শিল্পানি, ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।" [ঐতরেয় ব্রাহ্মণ] "এই শিল্পসমূহ হইতেছে আত্মার সংস্কৃতি এগুলির দ্বারা যজমান (সাধারণ গৃহস্থ) নিজেকে ছন্দোময় করে।" [সাংস্কৃতিকী : আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়]

"সংস্কৃতি জীবনের সঙ্গে জড়িত—সেইজন্য এর চরম রূপ কোনও এক সময়ে চিরকালের জন্য ব'লে দেওয়া যেতে পারে না। জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা আর সংস্কৃতিও গতিশীল ব্যাপার।" [তদেব]

সম্প্রতি কয়েকবছর থেকে বিশ শতকের বাঙালী আমরা নানা মহাপুরুষের শতবার্ষিকী পালনে ব্যস্ত। উনিশ শতকের বরণীয় মহাপুরুষদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ এবং শিক্ষাগুরু আশুতোষ—এঁদের বাদ দিলেও আরো অগণিত জ্যোতিষ্কের ছোট বড় নানা আকারে শতবর্ষ পালিত হয়েছে এবং হ'বে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও অনেক জননায়কের আবির্ভাব ঘটেছে, তবু বাংলাদেশে এঁদের একত্র সমাবেশ সবচেয়ে বেশী। এজন্য সংগতভাবেই আমরা বাঙালীরা গৌরববোধ করতে পারি। আবার সংসারের সর্বত্র সুখদুঃখ আলোছায়ার মতো এ গৌরবের সঙ্গে অগৌরবও মিশিয়ে আছে। উনিশ শতকের মহাপুরুষদের শতবার্ষিকী পালনের সমারোহের আলোকেই আমাদের যুগের অন্ধকার যেন আরো স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। আমার পরমশ্রদ্ধেয় জনৈক অধ্যাপক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলুন তো আগামী শতাব্দীতে এই শতাব্দীর কয়জনের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হ'বে।

জানি, এ প্রশ্নের উত্তর চট্ করে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এও জানি, জাতি হিসাবে আমরা যদি লুপ্ত না হয়ে যাই, শতবর্ষ পালনের যথার্থ

মূল্যবোধ হারিয়ে না ফেলি, তাইলে আগামী শতকেও এই শতকের মহাপুরুষদের শতবর্ষ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হ'বে। তবে, উনিশ শতকের এক একটি ব্যক্তিত্বের বিশালতা আজকের সাধারণীকরণের যুগে আশা করা বাতুলতা। শ্রমিকযুগের সর্তই হ'ল সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার—যার ফলে হয়তো বিশেষ গোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হ'তে পারে—কিন্তু সংস্কৃতির জগতে ব্যক্তির একনায়কত্ব প্রায় অসম্ভব। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট হলের স্তম্ভ সমাপ্তির বিশাল রূপটি-এযুগে অপ্রয়োজনীয়বোধে বর্জিত। সংস্কৃতির রূপান্তর মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু রূপান্তর মাত্রেই বন্দনীয় নয়। বর্তমান বাংলাদেশে নানা কারণে হতাশাবোধ একান্ত স্বাভাবিক। দৈনিকে, সাপ্তাহিকে এ নিয়ে নানা গবেষণা নিত্যই চলেছে। কিন্তু জাতির আত্মা আপন ঋজুকুটিল বহুধাবিভক্ত পথে যাত্রা করে চলেছে, এও সত্য। সঙ্কট যত ঘনিয়ে আসে, আত্মজিজ্ঞাসাও তত প্রবল হয়। বিগত একটি দশক জুড়ে শতবর্ষপালনে বাঙালীর যে আগ্রহ ও আন্তরিকতার পরিচয় মেলে, তার দ্বারাই বাঙালী সংস্কৃতির সজীবতা সুপ্রমাণিত। সেই সঙ্গে সাহিত্যে শিল্পে, সঙ্গীতে, মঞ্চে, চলচ্চিত্রে, সাংবাদিকতায়—জীবনছন্দের বহুমুখী বিচিত্রতায় কলকাতার মত এত সজাগ নগরী এ দেশে ক'টি মেলে? হয়তো মিছিলের শহর ব'লেই এ শহর এত প্রাণবন্ত।

জানি, যাঁরা বাঙালী জীবনের বেদনাবোধের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের চোখে এই দশকের হতাশাটাই বড়ো হয়ে দেখা দেবে। তবু, একথাও তো সত্য যে মহাভিক্ষু শীলভদ্র, কবি চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যদেব, রাজা রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমিতে দুর্যোগের অন্ধকার এই প্রথম নয়। যদি আমাদেরই মধ্য থেকে ওই সাধক, সাহিত্যিক ও মহামানবদের আবির্ভাব হয়ে থাকে, তবে আমরা সবাই তাঁদের মহত্ত্বের অংশীদার। আমাদের মধ্যে তাঁরা নিহিত সম্ভাবনায় আজও বিরাজিত। 'হয়তো এই যুগে আমাদেরই কাছাকাছি, একান্ত চোখের সামনেই মহৎ মনুষ্যত্বের আবির্ভাব ঘটছে—শুধু যে দূরত্বে গেলে মানুষকে আমরা সম্পূর্ণ দেখতে পাই, সে দূরত্ব এখনো দেখা দেয় নি ব'লেই এ যুগের কারও শতবার্ষিকী হ'তে পারে কি না এ নিয়ে আমাদের মনে সংশয় জাগে।

সুলভ আশাবাদে আস্থা রাখা কখনোই বুদ্ধিমানের কর্তব্য নয়। কিন্তু আমাদের অন্তরের সেই ঐশ্বর্যসম্পদ সত্যিই আছে, যার বলে জাতীয় জীবনের সঙ্কট আমরা উত্তীর্ণ হ'তে পারব—এই আশা হারিয়ে ফেলার মতো নৈরাশ্যজনক আর কিছু নেই। নানা অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন থেকেও তাই এ প্রবন্ধে বিগত এক দশকের বাঙালীর মানস সংস্কৃতির কয়েকটি উজ্জ্বল প্রকাশের দিকেই আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। নেতিবাচক আলোচনার মূল্য আছে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য আরো মহত্তর 'অস্তিত্ব', পৃথিবীর কোন 'না'কেই যা চরম বলে মনে করে না।

বিগত দশকের গোড়ার দিকে, হয়তো আরো বছর খানেক আগে উত্তর কলকাতার একটি পার্কে বঙ্গ-সংস্কৃতি-সম্মেলনের অয়োজন হয়। যাঁরা এই সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। বিশ্বের সংস্কৃতি ভাণ্ডারে বাঙালীর নিজস্ব দানের বৈশিষ্ট্যের কথাই তাঁদের মনে ছিল। ফলে আগ্রহাকুল দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশে এই সংস্কৃতি সম্মেলন অচিরেই বিপুল আকারের উৎসবমণ্ডলে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক বৎসর বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিচিত্র সংগ্রহের সার্থক উদাহরণে মণ্ডিত এই সম্মেলনটির গোড়ার কয়েকবছরে দর্শক হিসাবে নিয়মিত উপস্থিত থাকতাম। সব শ্রোতারাই যে সমান সংস্কৃতির কদর বোঝেন, এ কথা সত্য না হ'লেও জাতির আত্মপরিচয়ের এই শুভ সুযোগ এনে দিয়ে যারা এক মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন, তাঁদের কাছে আজকের বাঙালীর ঋণ অপরিশোধনীয়। কেবল কলকাতায় নয়। বিভিন্ন জেলার প্রধান কেন্দ্রস্থলগুলিতে এ ধরণের সংস্কৃতিসম্মেলনের জাতীয় জীবনের স্বরূপ উপলব্ধির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। সরকারী ও বে-সরকারী মিলিত উদ্যোগে সে প্রচেষ্টা যত ত্বরান্বিত হয় ততই মঙ্গল।

শহরে যেমন সংস্কৃতি সম্মেলন, গ্রামে তেমনি মেলা। জাতীয় জীবনে এই মেলাগুলি আমাদের গ্রামজীবনের মিলনকেন্দ্র। গত সাত-আট বছর থেকে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মেলা সচেতন উদ্যোগের ফলে যথার্থ শিক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ করে এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

শিক্ষিত বাঙালী সমাজের দৃষ্টি আজ নগরকেন্দ্রিক। কিন্তু বাঙালী জীবনধারার মূল প্রেরণা আজও গ্রামীণ সভ্যতার ধারাবাহী। এটা

ভালো কি মন্দ সে বিষয়ে প্রশ্ন না তুলেই বলা যায়, বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রাম ও নগরের আত্যন্তিক ভেদ বিলুপ্ত করার চেষ্টা প্রশংসনীয় হ'লেও গ্রামজীবনের নিজস্ব ছন্দটুকু বজায় রাখারও প্রয়োজন আছে। শহরের লোকেরা গ্রাম্য মেলার টুকিটাকি বৈঠকখানায় সাজিয়ে রেখে জনদরদী ও লোকসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক সাজেন। আর গাঁয়ের লোকেরা শহরের নিকৃষ্টতম পোষাক পরিচ্ছদ ও বিলাসিতার অনুকরণ করেন। এ দুটোর কোনটাই সুস্থ জীবনবোধের পরিচায়ক নয়। কুটিরশিল্পের নিজস্ব সৌন্দর্যমহিমা যদি কুটিরবাসীরা না বোঝেন তাহলে শহুরে অনুরাগ তাকে বাঁচিয়ে রখেতে পারে না, বরং বিকৃতির পথেই নিয়ে যায়। আজ তাই নকল কুটিরশিল্পে দেশ ছেয়ে গেছে। গ্রামীণ ও নাগরিক সংস্কৃতির সুষ্ঠু সমন্বয়ের প্রশ্নটি আজও যথেষ্ট চিন্তা করে আমরা দেখি নি। এই দ্রুত যন্ত্রযুগের পরিবর্তনশীলতার সময়েই বোধ করি এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী মন দেওয়া প্রয়োজন।

শান্তিপুর, ফরাসডাঙা, ধনেখালির বস্ত্র শিল্প, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প, বাঁকুড়ার ঘোড়া, কালীঘাটের পট—এসব স্থানীয় শিল্প সম্বন্ধে স্থানীয় লোকেদের মূল্যবোধ এবং অর্থ নৈতিক সুযোগসুবিধা বিস্তৃত না হ'লে কেবলমাত্র সংস্কৃতিবিলাসী কিছু স্বদেশী বা বিদেশী রসিকদের দ্বারা এদের অবক্ষয় রোধ করা যাবে না। এ বিষয়ে একটি সার্থক দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে —উত্তর কলকাতার রামবাগান বস্তী অঞ্চলের বেতের কাজ প্রসঙ্গে। পাথুরিয়াঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ছাত্রাবাসে কয়েকটি উৎসাহী ছাত্র এই অঞ্চলে জনসেবামূলক কাজের সঙ্কল্প নিয়ে কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে আশ্রমটি নরেন্দ্রপুরে চলে এলেও রামবাগানের সেবামূলক কাজ এখনও সমান উৎসাহের সঙ্গেই উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই রামবাগানের অনেক অধিবাসীরাই বংশানুক্রমে শিল্পী। বিশেষ করে বেতের জিনিষ তৈরী চিত্রাঙ্কন, শানাই বাজানো—এসবে এঁদের সহজাত পটুত্ব। কিন্তু স্বাধীনতার পরে বেতের জিনিষের ক্রেতা পাওয়া দুর্ঘট হ'লো—বিদেশীরা এসব জিনিষের সমাদর করতেন, এদেশের লোকের এসব জিনিষের প্রতি বিশেষ মমতা নেই। সেজন্য সেবাব্রতীদের প্রথম কাজ হ'ল বেতের জিনিষের ক্রেতাগোষ্ঠী তৈরী করা। সে প্রচেষ্টার সুফল এখন রামবাগান-

বাসীদের অনেকেই সানন্দে স্বীকার করেন। আরো অন্যান্য দিকেও তাঁদের জীবনযাত্রা অগ্রসর হয়ে চলেছে।

*

বস্তির উন্নয়ন প্রসঙ্গে শহরের নতুন নতুন বাড়ীগুলির স্থাপত্যের কথা মনে আসে। দক্ষিণ কলকাতার গাঙ্গুলীবাগানে উদ্বাস্তুদের জন্য যে ব্যারাক-ধরণের বাড়ীগুলি তৈরী হয়েছে, তার পরিকল্পনায় বাঙালীর পরিবারজীবন সম্বন্ধে কোন সচেতনতার পরিচয় নেই। মাত্র একখানি ঘরে (অবশ্য এও পাওয়া অশেষ ভাগ্য) কোন ভাবেই কোন সাধারণ বাঙালীপরিবার সকলে মিলে থাকতে পারে না পিতামাতা পুত্র এবং পৌত্রাদিসহ। আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে আমেরিকান স্থাপত্যের অন্ধ অনুকরণে বিশাল সব অট্টালিকা দেখা দিচ্ছে—তারা পৃথিবীর যে কোন দেশের বাড়ীই হ'তে পারে, ভারতবর্ষ বা বাংলাদেশের কোন বাড়ী বলে মনে হয় না। কাঁচের জানালা কি এদেশে খুবই প্রয়োজনীয়? তাও শুধু কাঁচের জানালাই, অন্য কোন বিকল্প ছাড়া! সব বাড়ীই কি সযত্নে দক্ষিণ—বিমুখ ক'রেই তৈরী করতে হ'বে? কৃত্রিম শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণ ছাড়া বাড়ীগুলিতে ভগবানের দেওয়া আলোহাওয়া খেলবার প্রয়োজন নেই? বাসযোগ্য গৃহগুলির গঠনভঙ্গিমায় ভারতীয় মনের স্পর্শ আরো বেশী সঞ্চারিত হোক—একথা আজ অনেক বাঙালীরই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা।

*

গ্রাম ও নগরের যোগসূত্ররূপে সিনেমা, থিয়েটার এবং যাত্রা বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। আজকাল যাত্রা এবং melodrama অনেক শিক্ষিতের কাছে সমার্থক। কিন্তু যাত্রা আবহমান কাল থেকে জন-মানসের সঙ্গীতময় প্রকাশরূপে অভিনন্দিত। আধুনিক দৃশ্যপট নিয়ন্ত্রিত নাটকের তুলনায় যাত্রার ভাবধর্মী পরিবেশ রচনা অনেক বেশী মৌলিক। এ কথাটি উপলব্ধি ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটক রচনায় কৃত্রিম দৃশ্যপট একেবারে বর্জন করেছিলেন।

আজ অবধি এদেশের বেশীর ভাগ মানুষ কোনটির বেশী অনুরাগী?

কলকাতার আশে পাশে যে কোন গ্রামে গেলেই অনুভব করা যায় যাত্রার সঙ্গে সাধারণ মানুষের নাড়ীর যোগ কত গভীর। ভাবুক বাঙালীর-হৃদয়ের স্বধর্ম থেকেই যাত্রার প্রাণশক্তি আহরিত। ইয়োরোপ—আমেরিকায় অপেরাজাতীয় নাট্যাভিনয়ের যে সমাদর আজকের দিনেও রয়েছে, তার তুলনায় যাত্রার সমাদর এদেশে কম। তার কারণ যাত্রার প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ ঘটে নি। বার্ণার্ড শ'র Pygmalion নাটকের গীতিময় রূপ 'My Fair Lady' তো এখন বিশ্ব-সমাদৃত। বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে কিছু প্রচেষ্টা ছিল অবনীন্দ্রনাথের। কিন্তু তাঁর 'যাত্রা'গুলি বেশীর ভাগই খেয়ালরসের রচনা। শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবস্থায় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী যাত্রা লিখে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন। কিন্তু এ দিক থেকে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক প্রচেষ্টা আর তেমন হয় নি ব'লেই যাত্রা আজও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তুতেই সীমাবদ্ধ।

তাই আমার মনে হয়, আধুনিক কবি ও সাহিত্যিকেরা যদি যাত্রার গণসংযোগের দিকটি ভেবে এর সংস্কার সাধনে ব্রতী হ'ন তাহলে আমাদের জাতীয় হৃদয়বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয়। স্বদেশীযুগে মুকুন্দ দাস যা করেছিলেন, এ যুগে তার চেয়ে আরো সাহিত্য সচেতনতার সঙ্গে এ ব্রত উদযাপন করতে হবে। কিছুকাল আগে যে 'যাত্রা'-উৎসব উত্তর কলকাতার রবীন্দ্রকাননে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে তা গ্রাম-নগর-নির্বিশেষে বাঙালীর যাত্রাপ্রীতির উদাহরণ।

*

সিনেমা অবশ্য এ যুগের সবচেয়ে মোহময় শিল্প। কলকাতা শহরে থিয়েটার কিছুসংখ্যক থাকলেও চলচ্চিত্রের পাল্লা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ভালো থিয়েটার চলচ্চিত্রকে পরিপুষ্ট করে। কলকাতার রঙ্গমঞ্চ, আমেরিকার- ব্রডওয়ে বা লণ্ডনের থিয়েটারগুলি তার প্রমাণ।

কিছুকাল আগেও আমরা চলচ্চিত্রকে 'বই' বলতাম, কারণ এর সাহিত্যরসের দিকটিই তখন বড়ো করে দেখেছি। সত্যজিৎ রায়ের যুগ থেকে 'ছবি'র প্রাধান্য। বাংলা তথা বিশ্বের চলচ্চিত্র শিল্প গীতিকবিতার

অনুরণন এনে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। তাঁর আয়ত চোখের দৃষ্টিতে জীবনসৌন্দর্যের এক নতুন মহল খুলে গেছে আমাদের সামনে।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী এবং সত্যজিৎ রায়ের চিত্ররূপ—জগতে এমন মণিকাঞ্চনসংযোগ ক'টাই বা ঘটে? অথচ গত একদশকের মধ্যে সেই পরমাশ্চর্য ত্রয়ী কাহিনীর মাধ্যমে বারংবার রসরূপের এক চিরন্তন সত্য আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছে। তা ছাড়াও সত্যজিৎ রায়ের আরো কত শিল্পসৃষ্টিই প্রতি বৎসর আমাদের আগ্রহাকুল দৃষ্টির অনিবার্য আকর্ষণ।

'পথের পাঁচালী'-র বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তখন মন ভরপুর। একদিন এক গ্রামবাসিনীর কাছে এ প্রসঙ্গ করতেই তিনি বলে উঠলেন, 'ও আর কি দেখব বাছা, ও কাহিনী আমাদের ঘরে ঘরে।' 'পথের পাঁচালী' তাঁকে মুগ্ধ করে নি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যে সব কারণে 'পথের পাঁচালী' আমাদের নাড়া দিয়েছিল, তার একটি বড়ো দিক গ্রামবাঙলার প্রতি আমাদের নাগরিক জীবনের মমত্ববোধ। অপুর স্বপ্নময় দৃষ্টি 'পথের পাঁচালী'র পরিচালকের দৃষ্টিতে, অভিনেতা বালকটির চোখে সে সৌন্দর্য-চেতনার আভাস ছিল না। তাই 'পথের পাঁচালী'র প্রকৃতি সৌন্দর্য ছাপিয়ে বাংলার দারিদ্র্যদীর্ণ রূপটিই প্রাধান্য পেয়েছে এই চিত্রকাব্যে। অথচ বিভূতিভূষণের আবিষ্ট প্রকৃতি-চেতনায় দারিদ্র্য একটি তথ্য মাত্র, বক্তব্য নয়। তবু, জীবন ও প্রকৃতির যে প্রতীকধর্মী অন্তরঙ্গতা সত্যজিৎ রায় সৃষ্টি করেছিলেন, সেখানে তাঁর অনন্যতা অবশ্য স্বীকার্য।

কিন্তু প্রতীকধর্মিতাই কোন চলচ্চিত্রের একমাত্র সার্থকতা নয়। জীবনের সমতলে যে সমগ্রের সন্ধান তাঁর 'মহানগরে' দেখা দিয়েছে, তার নিরলঙ্কার ঋজু প্রকাশভঙ্গিও শিল্পকৃতিত্বের সার্থক উদাহরণ। 'চারুলতা'য় তাঁর শিল্পদৃষ্টি যতটা নয়নহারী, কাহিনীবিন্যাসে রসরুচির উৎকর্ষ ততখানি নয়। জানি, এ সব বিষয়ে তীব্র মতভেদের আশঙ্কা। তবু, সৃষ্টির মহিমা আছে বলেই সত্যজিৎ রায়ের রচনা আমাদের এতখানি আন্দোলিত করে।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন অনেক সময়েই মনে দেখা দেয়, চলচ্চিত্র কি কেবলই চিত্র? ওর জন্মকাহিনীতে আছে নাট্যকলার ইতিহাস। তাই কাহিনীবিন্যাসের নৈপুণ্যও চলচ্চিত্রে একেবারে উপেক্ষনীয় নয়।

সত্যজিৎ রায়ের 'ছবি'-তে চিত্রসৌন্দর্য অনেক সময় জীবনের জটিলতাকে উপেক্ষা করে যায় বা অতিরিক্ত প্রতীকধর্মী হতে গিয়ে কাহিনীকে বিপর্যস্ত করে। ঠিক তাঁর পর্যায়ের মহৎ শিল্পী এদেশের চিত্রজগতে আর কেউ তুলনামূলক বিচারের সুযোগে তাঁর 'ছবি'-র উৎকর্ষ আরো বাড়ত —এই আমার ধারণা।

*

চিত্রজগতের মতোই সংবাদ জগতেও বাংলাদেশের নেতৃত্ব অবিসংবাদিত। সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় বাংলাদেশে খুব বেশী পার্থক্য কোন দিনই নেই, যদিচ সাংবাদিকতার পক্ষে সেটি সুখকর বা শুভঙ্কর কি না বলা কঠিন। তবে গত দুশো বছরের বাংলাসাহিত্য যে অনেক পরিণামেই সাংবাদিকেরা অনেকেই আজও আগে সাহিত্যিক, পরে সাংবাদিক।

সংবাদপত্রের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের কথা কে না জানেন! স্বাধীনতা পরবর্তী যুগেও চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতার জন্য এ সংগ্রাম চলেছে সমানতালে। অনেক সময় নানা সাময়িক সিদ্ধান্তে ত্রুটি থাকলেও অধিকাংশ বাংলা সংবাদপত্রের নির্ভীক সত্যভাষণের প্রয়াস বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। স্বাধীনতার রাজনৈতিক অর্থ যাই হোক সামাজিক, অর্থনৈতিক এমন কি সময় সময় আদর্শগত দিক থেকেও পরাধীনতার সম্ভাবনা এদেশে এখনো বর্তমান। তাই সাংবাদিকের কলমের কাছে আমাদের সৈনিকের চেয়ে অনেক বেশী প্রত্যাশা। অন্যায় অবিচারে স্বার্থে লোভে পঙ্কিল সমাজের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামব্রতী সাংবাদিকদের মধ্যে আজকের দিনে যিনি সবচেয়ে আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন তিনি যুগান্তর পত্রিকার 'নেপথ্য দর্শনে'র লেখক 'শ্রী নিরপেক্ষ'—অমিতাভ চৌধুরী।

শ্রী নিরপেক্ষ তাঁর সাংবাদিক জীবনে কত জনের চোখের জল মুছিয়েছেন, কত অন্যায়ের নির্মম নিরসন ঘটিয়েছেন, অথবা ভারত বা পশ্চিম বঙ্গ-সরকারের কত অর্থনৈতিক সুবিধা করে দিয়েছেন, সে সব বিচারের প্রয়োজনীয় তথ্য আমার কাছে নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের হয়ে সমাজ ও রাজশক্তির সঙ্গে যে ন্যায়ের লড়াই তিনি করেছিলেন, যে

লড়াইয়ের তুলনা এদেশে জীবনের অন্যান্ত ক্ষেত্রে বিরলতম উদাহরণ-মাত্র। সেই সংগ্রামের কথা মনে রেখেই তাঁর 'ম্যাগসেসে' পুরস্কার-প্রাপ্তির গৌরব আমার কাছে বড় মনে হয় না। কোন পুরস্কারের সাধ্য নয় এই সত্যনিষ্ঠা ও সংগ্রামী সাহসিকতার যোগ্যমূল্য নিরূপণ। করে। হয়তো সাংবাদিক জীবনই শ্রীনিরপেক্ষর একমাত্র ব্রত, কিন্তু আমি মনে করি বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষই তাঁর ব্রত হওয়া প্রয়োজন শুধু সাংবাদিকতায় নয়, প্রয়োজনমত জীবনের সর্বক্ষেত্রে। আর ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যত্র এই সাংবাদিকেব কর্মভূমি হতে পারে না—কারণ, বৈশ্য-মনোবৃত্তিময় আজকের ভারতবর্ষে যথার্থ ক্ষত্রিয়েরা কত বিরল, সেকথা আমরা সবাই জানি।

'নেপথ্য দর্শন' লেখার পিছনের সাংবাদিকের তথ্যনিষ্ঠা এবং জাত-সাহিত্যিকের অনুভূতিরূপায়ণ—এ দুয়ের দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছে। সাম্প্রতিক বাংলাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্যতম রচনাবলীর উদাহরণের মধ্যে 'শ্রীনিরপেক্ষ'র অনেক রচনাই সমগ্র জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন।

*

আরো কত কথাই এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। কিন্তু সময়ান্তরেরর অপেক্ষায় থাকাই ভালো। খুব কাছে থেকে আর একজন বঙ্গ সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠ উদাহরণস্বরূপ ব্যক্তিত্বকে দেখবার সৌভাগ্য এবং হারাবার বেদনা—দুইই পেয়েছি।। বাংলা সাহিত্যের বিপুল ঐতিহ্যের পটভূমিকে তিনি বাঙালী ও বিশ্বের পাঠকের সামনে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। বিগত নয় বৎসর ধরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর নিরভিমান নির্মল মনুষ্যত্বের আলোয় দেশবাসীকে যেমন মুগ্ধ করেছেন, তেমনি তাঁর অক্লান্ত গবেষণায় উপনিষদ, বৌদ্ধযুগ, তন্ত্র, বৈষ্ণবসাধনা—এসব কিছুর পটভূমিতে বাঙালীর মানসগঠনের উপাদানরাশি সংগ্রহ করে চলেছিলেন। সে সংগ্রহশালা অসমাপ্ত রেখেই তাঁর অকালপ্রয়াণ ঘটেছে। কিন্তু মৃত্যু উপলক্ষ্যমাত্র, তাঁর জীবনসাধনায় বর্তমান বাংলাসাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের সুচিরাগত ঐতিহ্যের সার্থক সংযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গসংস্কৃতির এই সামগ্রিক পরিচয় লাভের প্রচেষ্টাই গত দশবৎসরের উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কীর্তি। উত্তরসূরীদের সাধনায় সে সংস্কৃতিগত মনন সাধনার পরিপূর্ণতা লাভ শুধু আমাদের প্রার্থনাই নয়, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

বঙ্গীয় গ্রাম্য শব্দকোষ

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সম্প্রতি ঢাকার বাঙলা একাডেমী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানী বাংলার আদর্শ অভিধানের প্রথম খণ্ড অর্থাৎ পূর্ব বাংলার গ্রাম্য শব্দকোষ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গভাষা-ভাষী বাঙালি মাত্রেরই পরম আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। ছয় সাত বছরের চেষ্টায় প্রায় পাঁচশত সংগ্রাহকের সাহায্যে বিভিন্ন জিলা হইতে বহু অর্থব্যয়ে এই কোষের শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই গ্রন্থের প্রধান সম্পাদক।

সমগ্র বাংলাদেশের গ্রাম্য শব্দ লইয়া এইরূপ একখানি অভিধান সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া বাঙালী দীর্ঘকাল যাবৎ উপকরণ সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত আছে। অবশ্য সুপরিকল্পিত নিয়ম অনুসারে কার্য পরিচালিত হয় নাই—এক একজনে নিজের খেয়ালমত এক এক অঞ্চলের শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং পরিচিত অপরিচিত বিভিন্ন পত্রিকায় এই সমস্ত সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। তবে মোটের উপর, সংগৃহীত উপকরণ উপেক্ষণীয় নয়। পূর্ণাঙ্গ বাংলা গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের কাজে এগুলি যথেষ্ট উপযোগী হইবে। ভাল হউক মন্দ হউক কোষসম্পাদনের সময় ইহাদের কথা বিস্মৃত হওয়া সঙ্গত হইবে না। অথচ কার্যতঃ ইহাদের সহিত আমাদের পরিচয় সামান্য। এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভাবে যে কাজ করা হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই পরিচয়ে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে এমন দাবি করা চলে না। ইহা দিগদর্শন মাত্র মনে করিতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত অনুল্লেখের ত্রুটি মার্জনীয়।

গ্রাম্য শব্দকোষ সংকলনের উপযোগিতা লইয়া আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক বা তাহার পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। বিক্ষিপ্ত-ভাবে শব্দ সংগ্রহের চেষ্টা তাহারও পূর্ববর্তী। ১৮৯৫ সালের জুন মাসে 'দাসী' পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'প্রাদেশিক কথিত

বাঙ্গলা' শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রাম্য শব্দের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন এবং ইহার একখানি অভিধান প্রস্তুত করার আবশ্যকতা উল্লেখ করেন। প্রবন্ধটি 'কল্যাণী' পত্রিকার গত আষাঢ় সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। ১৩১৫ সালে 'জাহ্নবী' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীচিত্তসুখ সান্যাল মহাশয় 'বঙ্গভাষার প্রাচীনত্ব ও প্রাদেশিকত্ব' প্রবন্ধে পুরাতন বাংলা গ্রন্থে গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারের নিদর্শনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং গ্রাম্যশব্দ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন নির্দেশ করেন। এই প্রসঙ্গে লেখক 'প্রাদেশিক শব্দ সন্ধানে' নামক তাঁহার আর একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। জাহ্নবী পত্রিকার ১৩১৫ সালের পৌষ সংখ্যায় সান্যাল মহাশয় রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ সংকলিত বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু নামক অভিধান গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষ্যে বাংলা গ্রাম্যশব্দকোষ সম্পর্কে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কৃত কার্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় ১৩১০ বঙ্গাব্দে পরিষদের এক সভায় রাজকুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রাম্য শব্দকোষ ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের অপভ্রংশ শব্দ তালিকা প্রদর্শিত হয়। পরিষদের শব্দসমিতি স্থির করেন—অন্যান্য প্রাদেশিক শব্দের তালিকা আসিলে এসম্বন্ধে আলোচনা হইবে। মনে হয়, ১৩১৫ সাল পর্যন্ত বিশেষ কোনও কাজ হয় নাই। কবে কি উদ্দেশ্যে পরিষদ্ এই শব্দসমিতি গঠন করেন তাহার সন্ধান পাই নাই। ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'সাহিত্য পরিষৎপঞ্জিকা ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ঊনবিংশ সাংবৎসরিক কার্য বিবরণী' পুস্তকের ১১৩ পৃষ্ঠায় [মনে হয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের] শব্দসমিতির সভ্যগণের নাম আছে। সমিতির সভাপতি ছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক হেমচন্দ্র দাস-গুপ্ত। সভ্যগণের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। এই সমিতির কোন কার্যের উল্লেখ কার্যবিবরণের মধ্যে নাই। কতদিন পর্যন্ত এই সমিতি চলিয়াছিল জানি না। তবে ১৩৩৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত উপকরণ অবলম্বনে একখানি কোষগ্রন্থ সংকলনের উদ্দেশ্যে নূতন করিয়া গ্রাম্য শব্দকোষ সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। দুই তিন বৎসর এই সমিতির অস্তিত্ব ছিল বটে কিন্তু কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

পরিষদের সংকল্পিত গ্রাম্য শব্দকোষ সংকলনের ভার এ বিষয়ে উৎসাহী কর্মী পণ্ডিত রাজকুমার কাব্যভূষণের উপর অর্পিত হইয়াছিল বলিয়া কাব্য-

ভূষণ মহাশয় সাহিত্যপরিষৎপত্রিকায় (১৩১৪ সনে ৪র্থ সংখ্যা পৃঃ ১১৪) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। এই রাজকুমার কাব্যভূষণ বোধ হয় বেদস্মৃতিতীর্থ উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন। তিনিই চিত্তসুখ সান্ন্যাল মহাশয়ের পুর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে রাজকুমার মুখোপাধ্যায় নামে অভিহিত হইয়া থাকিতে পারেন। প্রাচীন পণ্ডিতসমাজে এইরূপ পদবী ও উপাধির বিভ্রাট নূতন নয়।

১৩১৭ সালের স্যহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গীয় গ্রাম্যভাষাতত্ত্ব প্রবন্ধে [হুগলি কৈকালা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক] রাজকুমার বেদস্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি দশ বৎসরকাল গ্রাম্য শব্দকোষ রচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া কোষের কাঠাম সৃষ্টি প্রায় শেষ করিয়াছেন। বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে তিনি খুলনা, যশোহর, নদীয়া, বীরভূম, শ্রীহট্ট, রংপুর, মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম, পাবনা ও ঢাকা জেলার শব্দ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সংগ্রাহকদিগেব মধ্যে নদীযার যতীন্দ্রনাথ বাগচী, বীরভুমের শিবরতন মিত্র, শ্রীহট্টের অচ্যুতচরণ চৌধুরী, রংপুরেব সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, মেদিনীপুরের হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, চট্টগ্রামের আবদুল কবিম মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। রংপুর ও পাবনা জেলার সংগ্রহ পরিষৎপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই ব্যাপারে আর একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। ইনি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ইনি কতকগুলি শব্দ পুস্তিকাকারে লিখো মুদ্রিত করিয়া স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নির্দেশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলার লোকের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সম্ভবত ইহারই সংগৃহীত বরিশাল জেলার গ্রাম্য শব্দ সংগ্রহ ও চাকমাদিগের ভাষাতথ্য পরিষৎ পত্রিকায় (৯ ও ১৩ বর্ষ) প্রকাশিত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার বাঙলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় প্রবন্ধে অনেক গ্রাম্য শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। বিশ্বভারতার অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩৪৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে কবিবরের অন্তিম অভিলাষ অনুযায়ী একখানি গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে বাংলার গ্রাম্য শব্দকোষ প্রণয়নের ইচ্ছা ও প্রয়াস এখনও সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। তবে অনেকদিন হইতেই গ্রাম্য শব্দের বৈচিত্র্য সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—দেশের বিভিন্ন

অংশের শব্দ সংগৃহীত ও বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহার আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। এখানে এই সংগ্রহ ও আলোচনার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব হইতে এই কার্যের সূচনা হয়। ১২৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থে তৎকালে কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত অসংস্কৃত গ্রাম্য শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে লেউয়িন (Lewin) সাহেব চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দ সংকলন করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত পুস্তকের নাম Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein with comparative vocabularies of the hill dialects. ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জে. ডি. অ্যাণ্ডারসন্ (J. D. Anderson) সাহেব পার্বত্য ত্রিপুরার গ্রাম্য শব্দ সংকলন করিয়া A short list of words of the Hill Tippera Language পুস্তক প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত এক শব্দকোষ পরিষৎ পত্রিকার অষ্টম বর্ষে প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংগ্রহ ছাড়া পরিষৎপত্রিকায় এযাবৎ নিম্ন নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির শব্দ সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে :—বরিশাল (৯ম বর্ষ), ময়মনসিংহ (১২শ, ১৯শ বর্ষ), রংপুর (১২শ বর্ষ), মালদহ (১৪শ ও ১৮ শ বর্ষ), পাবনা (১৪শ বর্ষ), যশোহর (১৫শ বর্ষ), ঢাকা (১৬শ বর্ষ), নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা (১৬শ, ১৯শ ৫১শ বর্ষ), মানভূম (২১শ বর্ষ), মুরসিদাবাদ (২২শ, ৩৩শ ও ৩৪শ বর্ষ), বীরভূম (৩৪শ বর্ষ), কুচবিহার (১৫শ, ১৮শ বর্ষ), শ্রীহট্ট (৩৭শ বর্ষ), ব্রহ্মপুত্রোপত্যকা (১৯শ বর্ষ), দক্ষিণ বঙ্গ (৫০ বর্ষ), খুলনা (৬৪তম বর্ষ)। পরিষৎপত্রিকার ১৯শ বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ সংখ্যা নামে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাতে চারিটি অঞ্চলের গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল।

গ্রাম্য শব্দ সংকলন ও প্রকাশের কার্যে পরিষদ্ হস্তক্ষেপ করার পরেও বিক্ষিপ্তভাবে নানাস্থান হইতে গ্রাম্য শব্দসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'মেময়রস্ অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'এর সপ্তম খণ্ডে ১৯২৩ সালে প্রকাশিত পার্জিটর সাহেবের শব্দসংকলন ও ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত গৌরচন্দ্র গোপরচিত 'ত্রিপুরা জিলার কথ্যভাষা' উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রাম্য শব্দের

আলোচনা ও সংগ্রহের মধ্যে রাখালরাজ রায়ের মানভূম জেলার গ্রাম্যভাষা (ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩২১, পৃঃ ৬৯২-৪), প্রসন্ননাথ রায়ের মুর্শিদাবাদের ভাষাতত্ত্ব সমালোচনা (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২২, পৃঃ ৩২০, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর সম্পূর্ণ বিবরণী, সন ১৩১৪ সাল, কাশিমবাজার, পৃঃ ৫৶০—৭৷৵০), প্রকাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাঁকুড়ার কথোপকথনের বাঙ্গালা (সুপ্রভাত, চৈত্র ১৩১৮, পৃঃ ৩৯১—৪), নগেন্দ্রনাথ গুহরায়ের নোয়াখালীর ভাষাবৈচিত্র্য (বিজয়া, মাঘ ১৩২০, পৃঃ ৪০৮—১৫ [এই সম্বন্ধে আলোচনা] শ্রাবণ ১৩২১, পৃঃ ১১০২), শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যশোহরের গ্রাম্য শব্দ (পঞ্চপুষ্প, ফাল্গুন ১৩৩৮), অক্ষয়কুমার কয়ালের হিজলীর উপভাষা ।(প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৌষ ১৩৬০, মাঘ ১৩৬১), চন্দ্রকিশোর তরফদারের পূর্ব ময়মনসিংহের ভাষা (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন, চতুর্থ অধিবেশন, কার্যবিবরণ, ১৩১৮, পৃঃ ১৭২—৮৪), যতীমোহন চৌধুরীর 'রঙ্গপুর ভাষার ব্যাকরণ' (রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৫, পৃঃ ২০—৩১) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় কিছু কিছু গ্রাম্য শব্দ অর্থসহ প্রকাশিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে ঢাকার বাঙলা একাডেমী শ্রীহট্টের ভাষা সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসন্ন লাহিড়ী লিখিত 'সিলেটী ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন জেলার ভাষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ইংরেজি ভাষায়ও প্রকাশিত হইতেছে। নোয়াখালির ভাষা সম্বন্ধে শ্রীগোপাল হালদারের বিস্তৃত আলোচনা (Journal of the Department of Letters, ১৯ ও ২৩ খণ্ড) এই প্রসঙ্গে পথপ্রদর্শক। ইন্‌ডিয়ান্ লিঙ্গুইস্টিক্‌স্ পত্রিকায় ১৯৩৯ সালে কৃষ্ণপদ গোস্বামী ময়মনসিংহের ও শম্ভু চন্দ্র চৌধুরী রংপুরের ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীঅনিমেষকান্ত পালের ঢাকার নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলের ভাষার ধ্বনিতত্ত্বগত বিশ্লেষণ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। এই সমস্ত আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত শব্দসমূহ কোষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সন্দেহ নাই। এই সমস্ত প্রবন্ধ নিবন্ধে বিক্ষিপ্ত শব্দগুলি একত্র সংগৃহীত ও বর্ণানুক্রমে সজ্জিত হইলে অবশ্যই কোষের কাঠাম প্রস্তুত হইতে পারে।

উপরের বিবরণ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে অনেক ক্ষেত্রে একই অঞ্চলের ভাষা লইয়া একাধিক ব্যক্তি আলোচনা করিয়াছেন। এক জনের আলোচনা আর একজনের আলোচনার পরিপূরকরূপে পরিকল্পিত হয় নাই। আলোচনাগুলির মধ্যে প্রায়ই পরস্পরের কোনও যোগাযোগ নাই। অজ্ঞাত-

সারে একই কথা দুই জনে বলিয়াছেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে অনেক ত্রুটি ধরা পড়িবে। তবে ইহাদের ভিতর গ্রহণযোগ্য কিছুই নাই এমন কথাও বলা চলে না। আজ ধীরভাবে পর্যালোচনা করিয়া ইহাদের ভাল অংশ বাছিয়া বাহির করিতে হইবে—ইহাদের অভাব পূরণ করিতে হইবে—ইহাদের উপর ভিত্তি করিয়া গ্রাম্য শব্দকোষ সম্পাদনের কাজে মনে প্রাণে অগ্রসর হইতে হইবে। দুঃখের বিষয়, আজ বাংলার সুধীবৃন্দের এদিকে তেমন দৃষ্টি নাই। আজ অর্থের অভাব নাই—সুযোগের অভাব নাই—গুণগ্রাহী পণ্ডিত সমাজের অভাব নাই। বাংলার যে কোনও বিশ্ববিত্থালয় অনায়াসে এই কাজের ভার গ্রহণ কবিতে পারেন। বিশ্ববিত্থালয়ে লোকসাহিত্য চর্চার ব্যবস্থা হইয়াছে--সঙ্গে সঙ্গে লোকসাহিত্য ও তাহার প্রাণ লৌকিক শব্দ সংকলনের সুব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে পূর্বসূরিগণের কার্য প্রধান অবলম্বন হইবে। তাঁহাদের প্রারব্ধ কার্য সুসম্পন্ন করার দায়িত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে না। অবিলম্বে কর্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

বীরের স্বর্গলাভ

দীনেশচন্দ্র সরকার

প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবাসীর বিশ্বাস ছিল, রণক্ষেত্রে সম্মুখযুদ্ধে কাহারও মৃত্যু হইলে সে অবিলম্বে স্বর্গলাভ করে। এই প্রসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাতক যোদ্ধার পারলৌকিক দুর্গতির কথাও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। মনুস্মৃতিতে (৭।৯৪-৯৫) বলা হইয়াছে, "যে-যোদ্ধা ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিবার পর শত্রুকর্তৃক নিহত হয়, সে তাহার প্রভুর সমস্ত পাপের ভাগী হয় এবং তাহার সমুদয় পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য তাহার প্রভু লাভ করেন।" এইরূপ বিশ্বাস যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের যুদ্ধনীতির উপর খানিকটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে অগণিত বীরশিলা ও সতীশিলা দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলি শতসহস্র বীরগতিপ্রাপ্ত যোদ্ধা এবং মৃত পতির সহগামিনী সতীর স্মৃতিস্তম্ভ। ইহাতে কখনও কখনও লিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও যে এরূপ শিলা বা শিলালেখ পাওয়া যায় না, তাহা নহে। তবে নানা কারণে উহার সংখ্যা কম। ভারতীয় সাহিত্য ও শিলালিপিতে বীরযোদ্ধা এবং সতীর স্বর্গলাভের অসংখ্য উল্লেখ আছে। এস্থলে আমরা বীরগতিপ্রাপ্ত যোদ্ধার সম্পর্কে দুটি কথা বলিব।

সম্মুখযুদ্ধে পতিত বীর স্বর্গে গিয়া যে সকল সুখভোগের অধিকারী হইত, অপ্সরার সঙ্গসুখই তন্মধ্যে প্রধান ছিল। মহাভারতে (১২।৯৮।৪৪-৪৭) আছে—

আহবে তু হতং শূরং ন শোচেত কথঞ্চন।
অশোচ্যো হি হতঃ শূরঃ স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
বরাপ্সরঃসহস্রাণি শূরমায়োধনে হতম্।
ত্বরমাণানি ধাবন্তি মম ভর্তা ভবেদিতি॥

অর্থাৎ—যে-বীর যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নহে; কারণ সেই অশোচ্য বীর স্বর্গলাভ করেন এবং সহস্র সহস্র বরাপ্সরা তাঁহাকে পতিরূপে বরণের জন্য ধাবিতা হয়।

গয়া জেলার অফসড় নামক গ্রামে সপ্তম শতাব্দীর উত্তরকালীন গুপ্তবংশীয় নরপতি আদিত্যসেনের একখানি মূল্যবান্ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছিল। উহাতে আদিত্যসেনের বৃদ্ধ প্রপিতামহ কুমারগুপ্ত এবং প্রপিতামহ দামোদর গুপ্তের সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উক্তি দেখা যায়। কুমারগুপ্ত পূর্ব্ব মালবের অধিপতি ছিলেন এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশের মৌখরিবংশীয় ঈশানবর্ম্মার সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অফসড় লিপি হইতে বুঝা যায় যে, ঈশানবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া কুমারগুপ্ত প্রয়াগ বা বর্ত্তমান এলাহাবাদ অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। ত্রিবেণীর পুণ্যসলিলেই তিনি স্বেচ্ছায় তনুত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র দামোদরগুপ্ত সম্পর্কে অফসড় লিপিতে বলা হইয়াছে—

যো মৌখরেঃ সমিতিষূদ্ধতহূণসৈন্যা
বল্গদ্ঘটা বিঘটয়ন্নুরুবারণানাম্।
সংমূর্চ্ছিতঃ সুরবধূর্ব্বরয়ন্ মমেতি
তৎপাণিপঙ্কজসুখস্পরিশাদ্বিবুদ্ধঃ॥
গুণবদ্দ্বিজকন্যানাং নানালঙ্কারযৌবনবতীনাম্।
পরিণায়িতবান্ স নৃপঃ শতং নিসৃষ্টাগ্রহারাণাম্॥

অর্থাৎ—যে-দামোদরগুপ্ত মৌখরিরাজের সহিত যুদ্ধে শত্রুর হূণসেনা পরাভবকারিণী হস্তিঘটাকে বিঘট্টিত করিবার পর মূর্চ্ছিত হন এবং "এই এই অপ্সরা আমার ভাগে" এইরূপ নির্ব্বাচন করিতে করিতে সুরনারীর সুখস্পর্শে জাগিয়া উঠেন, সেই নরপতি একশত নানাভরণভূষিতা যুবতী ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ দিয়া দম্পতিসমূহকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। সেকালে অত্যধিক কন্যাপণের জন্য নির্দ্ধন ব্রাহ্মণযুবকের পক্ষে বিবাহ করিয়া সংসারী হওয়া কঠিন ছিল। তাই ব্রাহ্মণের বিবাহের খরচ বহন করা পুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হইত।

যাহা হউক, স্বর্গীয় পণ্ডিত John Faithful Fleet উপরে উদ্ধৃত প্রথম শ্লোকটির শেষার্দ্ধ হইতে স্থির করিয়াছিলেন যে, মৌখরিসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা দামোদরগুপ্ত রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু পণ্ডিত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি বলেন যে, শ্লোকটিতে দামোদরগুপ্তের মৃত্যুর কথা নাই; কেবল মূর্চ্ছিত হইবার

বর্ণনা মাত্র আছে। তাঁহার মতে, ভবভূতির 'উত্তরচরিতে' মূৰ্চ্ছিত রামচন্দ্র যেমন সীতার করস্পর্শে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, দামোদরগুপ্তের জাগরণও ঠিক সেইরূপ। তাঁহার যুক্তি এই যে, প্রথম শ্লোকে বর্ণিত ঘটনার পরেও রাজা বাঁচিয়া ছিলেন এবং তখন তিনি যে-পুণ্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, উহাই দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলিয়া মনে করি।

এ সম্বন্ধে যে কথাটি প্রথমেই মনে হয়, তাহা এই। কবি বলিতেছেন, মূর্চ্ছিত হইবার পর দামোদরগুপ্ত সংভোগের জন্য অপ্সরাদিগকে বাছিয়া লইতেছিলেন। ইহা রাজার জীবৎকালে সম্ভব ছিল কিনা, তাহা বিবেচ্য। আমাদের মনে হয, মৃত্যুর পর দেবলোকে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে উহা সম্ভব হইতে পারে না। এ বিষয়ে ভারতীয় সাহিত্যে এবং শিলালিপিতেও কিছু সাক্ষ্য আছে।

'রাজতরঙ্গিণী' সংজ্ঞক কাশ্মীরের ইতিহাস দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে (৮।৮৫৩) আছে—

> বিদদ্রৌ স তু তদ্যোধৈর্হতৈশ্চ পরিষস্বজে।
> অদিব্যৈর্মেদিনী দিব্যৈর্দেহৈস্ত্বপ্সরসাং গণঃ॥

অর্থাৎ—লক্কক নামক সেনাপতি যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ মৃত্যু বরণ করিয়া পার্থিব দেহদ্বারা ভূমিকে এবং স্বর্গীয় শরীরদ্বারা অপ্সরাকুলকে আলিঙ্গন করিল।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোপ্পম্ নামক যুদ্ধক্ষেত্রে চালুক্যবংশীয় নরপতি প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্ল এবং চোলরাজ রাজাধিরাজের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল। রাজাধিরাজ হস্তিপৃষ্ঠে স্বয়ং চোলসৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন। ফলে চালুক্য সেনানীরা তাঁহাকে বিশেষভাবে আক্রমণের সুযোগ পায় এবং চোলরাজ হস্তিপৃষ্ঠেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই ঘটনা প্রসঙ্গে লেখমালায় বলা হইয়াছে যে, রাজাধিরাজ "অন্তরিক্ষে প্রস্থান করিয়া ইন্দ্রলোকপ্রবাসী হইলেন এবং সেখানে দেবকন্যাগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল।"

ইহা হইতে সেকালের বিশ্বাসের ধারা স্পষ্ট বুঝা যায়। সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুর পর বীরগণ স্বর্গে যাইতেন এবং সেখানে তাঁহারা সুরনারীর সঙ্গসুখ উপভোগ

করিতেন। এই অবস্থায় দামোদরগুপ্তের পক্ষে মৃত্যুর পূর্ব্বে অপ্সরাগণের স্পর্শে মূর্চ্ছা হইতে জাগ্রত হওয়া সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে-ভাষায় অফসড় লিপিতে দামোদরগুপ্তের কথা বলা হইয়াছে, অনুরূপ ভাষাতেই এনামাদালা শিলালেখে কাকতীয় বংশের রাজা মাধব বা মহাদেবের মৃত্যু বর্ণিত দেখা যায়। এই কাকতীয় নরপতি ১১৯৫-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দেবগিরির যাদবরাজ্য আক্রমণ করিয়া শক্রসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়া ছিলেন। তাঁহার পৌত্রী গণপাম্বিকা তদীয় এনামাদালা লিপিতে ঘটনাটি এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।—

জাতো মাধবভূপতির্গুণগিরিস্তস্মান্মহীবল্লভাদ্
যঃ সুপ্ত্বা সুমহাহবে গজবধূকুম্ভদ্বয়স্যোপরি।
প্রখ্যাতাপ্সরসস্তনদ্বয়তটে প্রাবোধির্যোধাগ্রণী-
র্লোকে খ্যাতবিশাল নির্ম্মলযশা বীরশ্রিয়ামাশ্রয়ঃ॥

অর্থাৎ—রাজা মাধব (মহাদেব) দ্বিতীয় প্রোলরাজের পুত্র। তিনি পৃথিবীতে সুবিখ্যাত বিশাল নির্ম্মলযশের অধিকারী এবং বীরশ্রীর আধার ছিলেন। মহাযুদ্ধে সেই শ্রেষ্ঠযোদ্ধা হস্তিনীর কুম্ভদ্বয়ের উপর ঘুমাইয়া পড়েন এবং এক প্রসিদ্ধা অপ্সরার স্তনদ্বয়ের উপর জাগিয়া উঠেন।

দামোদরগুপ্ত এবং কাকতীয়রাজ মাধব-মহাদেবের বর্ণনা মূলক শ্লোক-দ্বয়ের তুলনাত্মক আলোচনায় দেখা যাইবে, যেমন দামোদরগুপ্ত সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি রণক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইবার পর অপ্সরাস্পর্শে জাগিয়া উঠিয়া ছিলেন, ঠিক সেইরূপ বলা হইয়াছে যে, মাধব-মহাদেব যুদ্ধ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়েন এবং অপ্সরার আলিঙ্গনে জাগিয়া উঠেন। স্পষ্টই বুঝা যায়, এই জাগিয়া উঠা দেবলোকের ঘটনা, মর্ত্ত্যের নহে। সুতরাং মাধব-মহাদেবের ন্যায় দামোদরগুপ্তও যে সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

পণ্ডিতমহাশয়ের মতে, দামোদরগুপ্ত মৌখরিযুদ্ধের পরবর্ত্তী কালে অনেক ব্রাহ্মণযুবকের বিবাহে সাহায্য এবং তাঁহাদিগকে অগ্রহার দান করিয়াছিলেন। কিন্তু কবি বলিতেছেন, যে-দামোদরগুপ্ত মৌখরিসমরে মৃত্যুবরণ করেন, সেই রাজা ব্রাহ্মণগণকে আপ্যায়ন দ্বারা পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। দামোদর-

গুপ্ত কর্তৃক অগ্রহারাদি দান মৌখরি যুদ্ধের পরবর্ত্তী ঘটনা বলিয়া মনে করা ঠিক নহে। আসল কথা এই যে, দামোদর গুপ্তের বেলায় প্রশস্তিকারের বিশেষ কিছু বলিবার ছিল না। তাই তিনি তাঁহার বীরগতি এবং দানধর্ম্মের উপর জোর দিয়াছেন। কুমারগুপ্তের সময় যুদ্ধে মৌখরিরা পরাজিত হয়, কিন্তু দামোদরগুপ্তের আমলে তাহারাই বিজয়ী হইয়াছিল। দামোদরের পুত্র মহাসেনগুপ্ত পুনরায় মৌখরিপ্রাধান্য খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন। তিনি গৌড়-রাজের মিত্ররূপে মৌখরিদিগের সুহৃদ্ কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মাকে ব্রহ্মপুত্রের তীরে পরাজিত করিয়াছিলেন। বিহার-উত্তরপ্রদেশব্যাপী মৌখরিরাজ্যের দক্ষিণাংশে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ না হইলে তাঁহার পক্ষে উহা সম্ভব হইত না।

রামমোহন রায় ও বৌদ্ধধর্ম

দিলীপকুমার বিশ্বাস

আধুনিক ভারতবর্ষে নবযুগের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা আছে, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় তাঁহার দৃষ্টি প্রধানত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টীয় ধর্মত্রয়ের ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল। অবশ্য উক্ত ধর্মগুলি সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান সুবিস্তীর্ণ ও গভীর ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবলমাত্র এই সকল ধর্মশাস্ত্রের মধ্যেই তিনি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নাই। বর্তমান নিবন্ধে আমরা তাঁহার বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আলোচনা সম্পর্কে কিছু বলিব।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত রামমোহনের তিরোধান-শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত ও শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত Rammohun from the Buddhist Standpoint শীর্ষক এক প্রবন্ধে স্বর্গীয় অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া অতি যত্নপূর্বক বুদ্ধের সহিত রামমোহনের চরিত্রগত ও সংস্কারকার্যপ্রণালীগত মিল দেখাইয়াছেন। কিন্তু রামমোহনের বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলন বিষয়ে উক্ত প্রবন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। তরুণ বয়সে রামমোহন একবার তিব্বত গমন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বর্তমানে কেহ কেহ এই অনুমানের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিয়াছেন। কিন্তু প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ আলোচনা করিয়া বর্তমান লেখকের ধারণা জন্মিয়াছে যে, এই প্রকার আপত্তির কোনও সঙ্গত কারণ নাই (দ্রষ্টব্য শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত Sophia Dobson Collet প্রণীত The Life and Letters of Raja Rammohun Roy পৃঃ ১২-১৩)। রেভারেণ্ড কে, এস্, ম্যাক্‌ডোনাল্ড, তৎপ্রণীত রামমোহন জীবনীতে (কলিকাতা, ১৮৭৯, পৃঃ ৩) বলিয়াছেন, ছাত্রাবস্থায় পাটনায় অবস্থানকালে রামমোহন বৌদ্ধধর্মসম্পর্কে নানা কথা শুনিয়াছিলেন ও তিব্বতে প্রচলিত উক্ত ধর্মের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া উহার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের আকাঙ্খা তাঁহার তিব্বতগমনের অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের লামাদিগকে দেবমর্যাদা প্রদান তাঁহার ভাল লাগে নাই, ইহাকে প্রকারান্তরে আপত্তিকর নরপূজা বলিয়া তাঁহার মনে

হইয়াছিল এবং ইহার প্রতিবাদ করিয়া তিনি বিপন্ন হইয়াছিলেন। কোন্ সূত্রে ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্ এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা অবশ্য তিনি বলেন নাই। তিব্বতে থাকিতে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের জ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল বলা যায় না। ইহার পর রংপুরে থাকিতে পরিণত বয়সে তাঁহাকে একবার ইংরেজ সরকারের দৌত্যকার্যে ভুটান যাইতে হইয়াছিল। ভুটানও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশ, সুতরাং এই উপলক্ষেও তিনি বৌদ্ধধর্মের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

কার্যোপলক্ষে রংপুরে অবস্থান কালে (১৮০৯-১৮১৫) রামমোহন রীতিমত বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র চর্চা করিয়াছিলেন। অনুমান করা যাইতে পারে এই সময়ে তাঁহার আলোচ্য নানা শাস্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রও ছিল, যদিও ইহার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নাই। উত্তরকালে কথাপ্রসঙ্গে তিনি পাদ্‌রী আলেক্‌সাণ্ডার ডাফ্‌কে একবার বলিয়াছিলেন, তিনি সমগ্র বৌদ্ধ ত্রিপিটক অধ্যয়ন করিয়াছেন। (জর্জ্ স্মিথ্ প্রণীত Life of Alexander Duff vol I, London 1879, p. 117 দ্রষ্টব্য)। রামমোহনের বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নের প্রথম স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কলিকাতা হইতে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'বেদান্তগ্রন্থ' শীর্ষক ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে। এই ভাষ্যগ্রন্থের 'অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা' (২।২।১৭) হইতে 'ক্ষণিকত্বাচ্চ' (২।২।৩১) পর্যন্ত পঞ্চদশটি সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রামমোহন ধারাবাহিকভাবে অতি তীক্ষ্ণ যুক্তির সাহায্যে বৈদান্তিক দৃষ্টিকোণ হইতে বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তত্ত্বগতভাবে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদীর পক্ষে বৌদ্ধ শূন্যবাদ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না এবং এ বিষয়ে রামমোহন তাঁহার খণ্ডনপ্রণালীর স্বাতন্ত্র্যসত্ত্বেও পূর্বগামী শংকর ও অপরাপর অদ্বৈতবাদিগণের প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বভাগকে গ্রহণ করিতে না পারিলেও ইহার অপর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বুদ্ধ প্রকাশ্যত ব্রাহ্মণ্য বর্ণভেদপ্রথার সমালোচনা করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সামাজিক শিক্ষার মূল কথা ছিল, মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাহার চরিত্র ও গুণের উপর নির্ভর করে—জন্মদ্বারা নির্ণীত জাতির উপর নহে। তথাকথিত নীচবংশের বহু লোক তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে উচ্চবংশীয়গণ অপেক্ষা ইঁহাদের মর্যাদা কিছুমাত্র কম ছিল না। এই উদার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী সুবিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ 'ধম্মপদ-এর 'বাহ্মণ বগগো' শীর্ষক সমগ্র অধ্যায়টিতে সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। উত্তরকালে

বুদ্ধকর্তৃক বর্ণভেদপ্রথার এই প্রচ্ছন্ন সমালোচনা কিছু কিছু বৌদ্ধশাস্ত্রকারকে স্পষ্টতরভাবে উক্ত প্রথার সমালোচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। সর্ববিধ জাতীয় কল্যাণের অগ্রদূত রামমোহন মনে প্রাণে জাতিভেদপ্রথার অনিষ্ট-কারিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশন-সমূহে জাতিভেদপ্রথার অবাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা হইত। ইহা ব্যতীত 'ব্রাহ্মণ সেবধি'র (১৮২১) ভূমিকায় ও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী কোনও বন্ধুর নিকট লিখিত এক ইংরেজী পত্রে তিনি জাতিভেদকে একটি সামাজিক কুপ্রথা ও হিন্দুদিগের অধঃপতনের অন্যতম কারণ বলিয়া স্পষ্টত অভিহিত করিয়াছেম (শিবনাথ শাস্ত্রী, 'জাতিভেদ': দিলীপকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩৭০, পৃঃ ৬০-৬১ দ্রষ্টব্য)। এই বিষয়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের উদার সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন এমন প্রমাণ আছে। উদাহরণস্বরূপ তৎকর্তৃক সম্পাদিত, বঙ্গভাষায় অনূদিত ও ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বজ্রসূচী' গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সংস্কৃত ভাষায় 'বজ্রসূচী' শীর্ষক দুইখানি গ্রন্থ আছে। ইহার প্রথমখানি ('বজ্রসূচী' বা 'বজ্রসূচিকা', অন্যতম উপনিষদ্‌রূপে পরিচিত, দ্বিতীয়টি সুপ্রসিদ্ধ মহাযান বৌদ্ধাচার্য কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষের রচনা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বজ্রসূচিকোপনিষদ্‌খানির রচয়িতা যে কে তাহা স্পষ্ট জানা যায় নাই, কিন্তু অশ্বঘোষের গ্রন্থ যে উক্ত উপনিষদ্‌খানিকে ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণ নিঃসন্দেহ (দ্রষ্টব্য বিমলাচরণ লাহা প্রণীত Asvaghosha এসিয়াটিক্ সোসাইটি অফ বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত পৃঃ ৯)। রামমোহন যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা 'বজ্রসূচিকোপনিষৎ', অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত দ্বিতীয় গ্রন্থ নহে। এই গ্রন্থের শেষে রচয়িতার নাম শ্রীমৃত্যুঞ্জয়াচার্য বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীমতী কলেট রচিত রামমোহনের অসমাপ্ত জীবন-চরিত গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার কালে রেভারেণ্ড হার্বাট্ স্টীড সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার জ্ঞানের অভাবহেতু গ্রন্থখানিকে 'বজ্রসূচী' ও ভ্রমক্রমে তাহার লেখককে বুদ্ধ-ঘোষ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত দ্বিতীয় 'বজ্রসূচী' গ্রন্থের লেখকরূপে পরিচিত অশ্বঘোষের নামটি স্মৃতিবিভ্রম ও শব্দসাদৃশ্যবশত 'বুদ্ধঘোষ'-এ পরিণত হইয়াছে। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য, কেহ কেহ দ্বিতীয় গ্রন্থের লেখককে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ হইতে ভিন্ন মনে করেন।

বজ্রসূচিকোপনিষৎখানিকে রামমোহন প্রচারযোগ্য কেন মনে করিয়া-

ছিলেন ? এ প্রশ্নের উত্তরে নিঃসংকোচে বলা যায়, এইখানিতে এবং ইহার ভিত্তিতে লিখিত ও অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত দ্বিতীয় গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্য বর্ণভেদ-প্রথার যে সুতীক্ষ্ণ ও সুনিপুণ সমালোচনা স্থান পাইয়াছে তাহাই রামমোহনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। রামমোহন অনূদিত গ্রন্থখানি দশটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদে বিভক্ত। সূচনা জ্ঞাপক শ্লোকে ইহাকে জ্ঞানহীনগণের দূষণ আর জ্ঞানিগণের ভূষণরূপে অভিহিত করা হইয়াছে (দূষণং জ্ঞানহীনানাং ভূষণং জ্ঞানচক্ষুসাম্)। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ব্রাহ্মণের স্বরূপবিচারের বিষয় উপস্থাপিত হইয়াছে এবং প্রশ্ন তোলা হইয়াছে 'ব্রাহ্মণ শব্দে কাহাকে কহি, কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি কর্ম, কি জ্ঞান।' পরবর্তী সাতটি অনুচ্ছেদে অতি নিপুণ তর্কের ও শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, ব্রাহ্মণত্ব জীবাত্মা, দেহ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, পাণ্ডিত্য বা কর্মের উপর নির্ভর করে না। সবশেষ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে : "..করতলস্থিত আমলকী ফলে যেমন নিশ্চয় হয়, তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শমদমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায, যেহেতু শাস্ত্রে কহে, 'জন্মপ্রাপ্ত হইলে সর্বসাধারণ শূদ্র হয়, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র, আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন'— অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অন্য নহে, ইহা নিশ্চয় হইল।" সুতরাং বর্ণভেদ শাস্ত্র বা যুক্তি কোনও কিছুর দ্বারাই সমর্থনীয় নহে। মনে রাখিতে হইবে রামমোহন উক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছিলেন ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে। এই বৎসরই কোনও বন্ধুকে লিখিত এক পত্রে তিনি জাতিভেদকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জাতিভেদপ্রথার অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে তিনি যে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ (আত্মীয়সভার প্রতিষ্ঠাকাল) হইতেই চিন্তা করিতেছিলেন তাহার প্রমাণ আছে। ক্রমে এই বিষয়ে তাঁহার চিন্তা পরিণত আকার ধারণ করিয়া ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধুকে লিখিত পত্র ও বজ্র-সূচিকোপনিষদের অনুবাদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বভাগকে পূর্বে খণ্ডন করিয়া থাকিলেও তাহার সামাজিক আদর্শ রামমোহনকে এবিষয়ে প্রেরণা দিয়াছিল এবং এই ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় সমর্থন তিনি বৌদ্ধ সাহিত্য হইতেই পাইয়াছিলেন। অপর একটি দিক দিয়াও এই ক্ষেত্রে বুদ্ধের

দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত রামমোহনের মনোভাবের মিল আছে। বুদ্ধ জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা না করিয়া নিপুণ তর্কশক্তির দ্বারা ইহার ভিত্তিকে শিথিল করিতে চাহিয়াছিলেন। রামমোহনের সংস্কার দৃষ্টিরও ইহাই বৈশিষ্ট্য ছিল। শিক্ষা, উপদেশ ও আদর্শস্থাপনের দ্বারা ভিতর হইতে ধীরে ধীরে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার অপসারিত করিয়া ভবিষ্যতে জাতিভেদপ্রথা বর্জনের নিমিত্ত জনমানসকে প্রস্তুত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রকাশ্যে জাতিভেদ বর্জনের আন্দোলন না করিয়া তিনি জাতিভেদের মূলে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে শাস্ত্র ও যুক্তির সমাবেশ ঘটাইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গী বহুলাংশে বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত।

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে 'বজ্রসূচিকোপনিষৎ' ও 'বজ্রসূচী' গ্রন্থদ্বয় শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই সংস্করণের ভূমিকায় রামমোহন-কৃত সংস্করণ ও অনুবাদের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বজ্রসূচী সম্পর্কে তাঁহাদের আলোচনা প্রকাশ করিবার পূর্বেই রামমোহন এই নামধেয় উপনিষৎ খানি বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করিয়া ভারতে বৌদ্ধশাস্ত্রচর্চ্চার ভিত্তি স্থাপন করেন। অপরাপর বহু ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও তিনিই পথিকৃৎ। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'বজ্রসূচী' নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধসাহিত্যের অন্তর্গত। এই গ্রন্থের সহিত রামমোহনের অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁহার তিব্বতের সহিত যোগাযোগের একটি সমর্থক প্রমাণরূপে গণ্য করা নিতান্ত অন্যায় হইবে না।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

সভ্যতা ও সংস্কৃতি শব্দ দু'টির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক না কেন, এখানে আমরা শব্দ দু'টিকে, সমাজ বিজ্ঞানীরা যে অর্থে শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন সেই অর্থে প্রয়োগ করছি। Civilization কথাটির প্রতিশব্দ হিসাবে 'সভ্যতা' এবং Culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করছি। বলা বাহুল্য, যিনি সভায় সাধু তিনি সভ্য এবং তাঁর যে গুণ তার নাম সভ্যতা, এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সভ্যতা শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে না ; অথবা 'সংস্কার' এবং 'সংস্কৃতি' শব্দটি শাস্ত্রে যে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই বিশেষ অর্থেও 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে আমরা ব্যবহার করছিনে। যদিও 'সংস্কৃতি' শব্দটির অর্থের সঙ্গে 'কালচার' কথাটির অর্থের একটা নিগূঢ় যোগ না দেখানো যায় এমন নয়। তারপর নৃতত্ত্ব শাস্ত্রে 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে যতখানি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে ততখানি ব্যাপক অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। একটা জাতি যতো কিছু সৃষ্টি করেছে—কারুকলা, চারুকলা, বিধিনিষেধ, প্রকৃতির সঙ্গে বুঝাপড়া করার কলাকৌশল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান—অনুষ্ঠান, কাজকর্ম করার যন্ত্রপাতি, উপাসনাপদ্ধতি সব কিছুকেই নৃতাত্ত্বিকরা 'সংস্কৃতি' নামে চিহ্নিত করে থাকেন। সংস্কৃতি বলতে তাঁরা বোঝেন—"total social heritage of Mankind" অর্থাৎ মানুষের সামগ্রিক সামাজিক ঐতিহ্য।

আর 'বিশেষ সংস্কৃতি' ব'লতে বোঝেন—কোন একটি বিশেষ জাতির সামাজিক ঐতিহ্য। সমাজবিজ্ঞানে শব্দটি এতো ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয় না। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে সমাজবিজ্ঞানীরা পৃথক ক্ষেত্র ব'লে মনে করেন এবং এই কথাই ব'লেন যে, সভ্যতায় এবং সংস্কৃতিতে মানুষের পুরুষার্থ সাধনার দু'টি স্বতন্ত্র ধারার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

এই পুরুষার্থ সাধনার স্বরূপ বুঝতে হ'লে সমাজবিজ্ঞানীরা

পুরুষার্থের (interests) যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন, প্রথমেই তা জেনে নেওয়া দরকার। 'পুরুষার্থ' কথাটা শুনলেই আমাদের ধর্ম-অর্থ কাম-মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের কথা মনে পড়ে। এই অর্থে আমি পুরুষার্থ কথাটা ব্যবহার করছিনে। সমাজবিজ্ঞানীদের "interests" শব্দটির অনুবাদ ক'রে নিয়েছি আমি—'পুরুষার্থ'। এখানে "ইণ্টারেস্ট" এবং পুরুষার্থ সমার্থক। সমাজবিজ্ঞানের গ্রন্থে দেখা যায়,— পুরুষার্থকে প্রথমে দু'টি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, একটিকে বলা হয়েছে—অনির্দিষ্ট (unspecified) অন্যটিকে বলা হয়েছে—নির্দিষ্ট (specified)। নির্দিষ্টকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(১) সেকেণ্ডারি (২) ইণ্টার-মিডিয়েট (৩) প্রাইমারি। 'সেকেণ্ডারিকে' ব্যাখ্যা ক'রে বলা হয়েছে—সভ্যতাসূচক (civilizational) এবং উপযোগিতা মূলক (utilitarian)। এই শ্রেণীর মধ্যে নিম্নলিখিত পুরুষার্থ অন্তর্ভুক্ত :

(ক) অর্থনৈতিক পুরুষার্থ (Economic Interests)

(খ) রাজনৈতিক পুরুষার্থ (Political Interests)

(গ) প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক পুরুষার্থ (Technological Interests)

ইণ্টারমিডিয়েট (মধ্যবর্তী ?) শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—শিক্ষানৈতিক পুরুষার্থ (educational interests)। এই পুরুষার্থের প্রেরণায় মানুষ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পাঠচক্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গঠন করে থাকে।

প্রাইমারি শ্রেণীকে 'কালচারাল' ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। এই শ্রেণীর মধ্যে নিম্নলিখিত পুরুষার্থ অন্তর্ভুক্ত :

(ক) সামাজিক ভাব বিনিময় (Social Intercourse)। এই পুরুষার্থের প্রেরণায় মানুষ ক্লাব, মজলিস্, আড্ডাখানা, বৈঠক বা আসর প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে।

(খ) স্বাস্থ্য ও আমোদ প্রমোদ (Health & Recreation)। ক্রীড়া-সমিতি, নৃত্যগোষ্ঠী, ব্যায়াম সমিতি, প্রভৃতি সমিতি এই পুরুষার্থেরই তাগিদে সৃষ্ট হয়।

(গ) নারী পুরুষের যৌন প্রবৃত্তি এবং প্রজনন (Sex and Reproduction)। এই পুরুষার্থের প্রেরণায় মানুষ পরিবার গঠন করে।

(ঘ) ধর্ম (Religion)। মঠ, মন্দির, আশ্রম, গীর্জা, মসজিদ, ধর্ম-

সমিতি, ধর্মপ্রচারিণী সভা ইত্যাদি ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠান এই পুরুষার্থের প্রেরণায় গঠিত।

(ঙ) শৈল্পিক পুরুষার্থ। শিল্পকলা, গান, সাহিত্য ইত্যাদি (Aesthetic Interests :—art, music, literature etc.)

(চ) বিজ্ঞান ও দর্শন (Science & Philosophy)। নানা রকম বিদ্বদগোষ্ঠী, বিদ্যানুশীলন সমিতি প্রভৃতি এই পুরুষার্থের প্রেরণায় গঠিত।

আমরা দেখি, সমাজ-বিজ্ঞানীরা 'প্রাইমারি ইণ্টারেষ্ট' সমূহকে সাংস্কৃতিক আখ্যা দিয়েছেন এবং ঐ সমস্ত পুরুষার্থের প্রেরণায় যা-কিছু (বস্তু+সংগঠন) সৃষ্টি হয়েছে তাদের 'সাংস্কৃতিক' পদবাচ্য করেছেন। আর আপাতদৃষ্টিতে যে বিষয়টি ধরা পড়ে তা এই যে সমাজবিজ্ঞানীরা পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেণী-বিভাগ করতে গিয়ে—উপযোগিতার সদ্ভাবকে এবং অভাবকেই বিভাজক হিসাবে গণ্য করেছেন। সভ্যতাসূচক বলছেন তাকেই যা উপযোগিতামূলক এবং সাংস্কৃতিক বলছেন তাকেই যা'র সঙ্গে উপযোগিতার প্রশ্ন জড়িয়ে নেই।

আর, এম, ম্যাকাইভার এবং সি, এইচ, পেজ-লিখিত "সোসাইটি" নামক গ্রন্থে সাংস্কৃতিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করার প্রসঙ্গে, প্রথমেই প্রশ্ন তোলা হয়েছে—কি বৈশিষ্ট্য থাকলে একটি সংগঠনকে আমরা 'সাংস্কৃতিক' বলে গণ্য করতে পারি? উত্তরে লেখা হয়েছে—সমস্ত সংগঠনকে সাংস্কৃতিক এবং উপযোগিতামূলক এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, তাতে অনেকের মনে প্রশ্ন বা সন্দেহ জাগতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে—সব সংগঠনই কি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য, উপায়গুলিকে সংযোজিত করে না? যখন কোন সংগঠন উপায়ের উপর (means) বেশী জোর দেয় তখন কি তা উপযোগিতামূলক নয়? আর যখন উদ্দেশ্য (ends) সিদ্ধ করে তখন কি তা সাংস্কৃতিক নয়? রাষ্ট্র কি নিরাপত্তা এবং সামাজিক শ্রীবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে না,—ঐগুলি কি সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য নয়? অন্যপক্ষে মানুষ যদি কোন শিল্পের উন্নতির জন্য, ধর্মবিশ্বাসের জন্য, অথবা পরস্পর ভাববিনিময়ের জন্য মিলিত হয়, তবে সেই সমিতি বা সংগঠন কি উপযোগিতামূলক নয়? বিশেষ একটি লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপলক্ষ্য নয়? সংস্কৃতি ও উপযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানাদির মধ্যে পার্থক্য আছে এ কথা স্বীকার করে নিয়েও আমরা কি কোন সংগঠনকে সাংস্কৃতিক

এবং উপযোগিতামূলক এই দুই শ্রেণীর কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করতে পারি? গ্রন্থকারদ্বয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, কোন্ সংগঠন সাংস্কৃতিক, আর কোন্‌টি উপযোগিতামূলক তা নির্ভর করবে সংগঠনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য কি, তার উপরে। তাঁরা বলেছেন—আমরা গীর্জাকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করে একই পংক্তিতে স্থান দেবো—আড্ডাখানা, পাঠচক্র, গীত-রসিক সমিতি, অপেশাদার নৃত্যগোষ্ঠী, বিদ্বজ্জন সভা এবং অন্যান্য সব সমিতিকে, যার মধ্যে মানুষ ব্যক্তিগত বাসনার প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্তি লাভ করে অথবা যাকে অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মুখ্য লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে তাঁরা লিখেছেন, কোন প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক কিনা, দুটি বৈশিষ্ট্য থেকে তা বুঝা যায়। প্রথম বৈশিষ্ট্যটি হ'চ্ছে—যা'কে ইংরেজিতে বলা হয় "mode of participation" এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—"liberty of alternatives"। প্রথম বৈশিষ্ট্যকে বাংলায় বলা চলে—সংযুক্ত থাকার রীতি; দ্বিতীয়টিকে বলা যায়—একটির বদলে অন্যটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা। "Mode of participation"—সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—সাংস্কৃতিক সংগঠন আসলে একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী (গ্রুপ) অথবা একাধিক প্রাথমিক গোষ্ঠীর সমবায়—কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি যাদের যোগসূত্র ধারণ করে থাকে। সভ্যরা যদি প্রাথমিক গোষ্ঠী হিসাবে মিলিত না হন তা' হ'লে সেই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্যই হারিয়ে যায়। গীর্জায় যদি মানুষ উপাসনার উদ্দেশ্যে মিলিত না হ'ত, তা' হ'লে আমরা গীর্জাকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বলতে পারতাম কি? সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি প্রধানত থাকবে তার প্রাথমিক লক্ষ্যের দিকে। ঐ লক্ষ্যই তার জীবনীশক্তির উৎস এবং ঐ লক্ষ্যই তাকে সার্থক ক'রে তোলে। আসল কথা এই যে, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক উপাদান অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত হয়ে থাকে। উপযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানে তা' থাকে না। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি অংশ গ্রহণ না করেও ফলভাগী হতে পারে, কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে তা'কে অংশ গ্রহণ করতেই হয়। ঘরে বসে লোকে ব্যাঙ্কের সুদ পেতে পারে, বিধান-সভায় যোগদান না করেও বিধি-বিধানের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে, অন্যপক্ষে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি সক্রিয় অংশ গ্রহণ

করতে বাধ্য। এই দিক থেকে দেখলে বলা চলে সভ্যতাসূচক প্রতিষ্ঠান যেখানে নৈর্ব্যক্তিক ; সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সেখানে ব্যক্তিসম্পর্কনির্ভর।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য—Liberty of Alternatives। মানুষ নিজের রুচি অনুসারে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছেড়ে অন্য একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সভ্য হ'তে পারে। দৃষ্টান্ত দিলে বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। সভ্যতাসূচক প্রতিষ্ঠান—রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান—ধর্মগোষ্ঠী। মানুষ একটিমাত্র রাষ্ট্রের অধীনে থাকতে বাধ্য—কিন্তু এক ধর্মগোষ্ঠী ছেড়ে সে অন্য ধর্মগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এখানে রুচিই তার নিয়ামক। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষ ব্যাপার। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ নিরপেক্ষ স্বাধীন ব্যাপার। সভ্যতাসূচক প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিরুচির স্বাধীনতা থাকে না, সব রুচিকে এক ছাঁচে ঢালাই করার চেষ্টা থাকে, কিন্তু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিরুচি নিরঙ্কুশ।

এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে আমরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণ করবার জন্য সমাজ বিজ্ঞানীরা যে চেষ্টা করেছেন তার সামান্য পরিচয় দিয়ে নিতে চাই।

আগেই বলা হয়েছে—সমাজবিজ্ঞানীরা পুরুষার্থের শ্রেণী-বিভাগের ভিত্তি আশ্রয় করেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন ; সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেই সব বস্তু সামগ্রীকে এবং সংগঠনকে যেগুলি উপযোগিতামূলক অর্থাৎ যেগুলি অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় বিশেষ (means to ends) এবং সংস্কৃতি বলেছে সেইগুলিকেই যেগুলি কোন উদ্দেশ্যের উপায় নয়, নিজেরাই উদ্দেশ্য অর্থাৎ যেগুলি উপযোগিতামূলক নয়।

সভ্যতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাঁরা লিখছেন—"By civilization, then, we mean the whole mechanism and organisation which man has devised in his endeavour to control the conditions of his life. It would include not only our systems of social organisation, but also our techniques and our material instruments. It would include alike the ballot-box and the telephone the Interstate Commerce Commission and the railroads, our

laws as well as our schools and our banking systems as well as our banks." (Society—Page 498) অর্থাৎ মানুষ তার পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত বা বশীভূত করবার জন্য, জীবনযাত্রা নির্বাহ করার জন্য যতো যন্ত্রকৌশল এবং প্রতিষ্ঠানাদি উদ্ভাবন করেছে, সভ্যতা বলতে তাদের সব কিছুকেই বুঝায়। তার মধ্যে শুধু আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহই অন্তর্ভুক্ত নয়, আমাদের ক্রিয়াকৌশল এবং বাস্তব যন্ত্রপাতিও অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে, ভোট-বাক্স, টেলিফোন, আন্তরাজ্য বাণিজ্য কমিশন, রেলপথ, আমাদের বিধিবিধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্ভুক্ত।

সভ্যতার মধ্যে দুটি পর্যায় বা স্তর আছে। প্রথম পর্যায়ে রয়েছে—মৌলিক ক্রিয়াকৌশল বা কর্মপদ্ধতি (Basic technology) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সামাজিক ক্রিয়াপদ্ধতি (Social technology)। 'বেসিক টেকনোলজি' বলতে বুঝায়—প্রকৃতিকে বশীভূত করার ক্রিয়াকৌশল—সেইসব বস্তু যা "directed to man's control over natural phenomena। এই ক্ষেত্রটি হল—যন্ত্রবিদদের ক্ষেত্র। পদার্থ বিদ্যার, রসায়ন বিদ্যার এবং জীববিদ্যার সূত্রকে এ মানুষের প্রয়োজনে প্রয়োগ করে। শিল্প-কারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে এবং খনিতে উৎপাদন-প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে, জাহাজ, বিমান, কামানবন্দুক, কলের লাঙ্গল ইত্যাদি নানাপ্রকার দ্রব্য নির্মাণ করে। আর, 'সোসাল টেকনোলজি' বলতে বুঝায় সেই সব ক্রিয়াকৌশল যা "directed to the regulation of the behavior of human beings"—মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযুক্ত হয়। 'সোসাল টেকনোলজি' আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত: এক অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতি, দুই রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি বা টেকনোলজি। অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে পড়ছে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাগুলি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি এবং রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে পড়ছে—সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে মানুষের মধ্যে যে সব সম্পর্ক গড়ে উঠে সেই সব সম্পর্কেরই অনেকগুলি।

সংস্কৃতি সভ্যতার বিপরীত বা প্রতিস্থিতি (antithesis)। সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সেই সব বস্তু যেগুলি আমাদের বিশেষ কোন লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় বিশেষ নয়, যেগুলি নিজেরাই লক্ষ্য।

এই বস্তুগুলি আমাদের আত্মপ্রকাশেরই উপায় "It is the expression of our nature in our modes of living and thinking, in our everyday intercourse, in art, in literature, in religion, in recreation and enjoyment" সংস্কৃতি হচ্ছে—জীবনযাপন রীতিতে, চিন্তায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের আচার আচরণে, শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে, আমোদ-প্রমোদে আমাদের স্বভাবের প্রকাশ। আমাদের ভিতরকার তাগিদে এই সববস্তুর সৃষ্টি, কোন বাহ্যিক প্রয়োজনের তাগিদে নয়। সংস্কৃতি মূল্যের জগৎ, রীতির জগৎ, আবেগ আসক্তির জগৎ, বৌদ্ধিক অভিযানের জগৎ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, একটি উপন্যাস, চিত্র, কাব্য, নাটক, চলচ্চিত্র, খেলা, দর্শন, ধর্মমত, গীর্জা প্রভৃতি বস্তুগুলি আমরা সৃষ্টি করেছি—"because we want them as such, because it is their function to give us directly, not merely as intermediaries, something that we crave after or we think we need," আমরা শুধু তাদেরই চাই কারণ তাদের কাজ প্রত্যক্ষ ভাবে মধ্যস্থ হয়ে নয়, এমন কিছু দেওয়া যা আমরা কাম্য ব'লে কামনা করি অথবা মনে করি আমাদের চাই-ই। আমরা কত ভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে চাই, এই সব বস্তু তারই নিদর্শন। বস্তু সভ্যতার অথবা সংস্কৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে তা' নির্ণয় করার উপায় হচ্ছে—প্রশ্ন করা—এই বস্তুগুলি কি আমরা শুধু ঐ বস্তুটিকে চাওয়ার জন্যই চাইছি, অথবা অন্য কোন কাম্য বস্তুকে পাওয়ার জন্য বস্তুটিকে ব্যবহার করছি? বস্তুটি কি বাহ্যিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সৃষ্ট, অথবা বস্তুটির জন্যই বস্তুটিকে চাওয়া হচ্ছে? যদি এমন হয় যে বস্তুটির জন্যই বস্তুটিকে আমরা চাইছি, তা হ'লে বস্তুটি সংস্কৃতির শ্রেণীভুক্ত হবে; আর যদি এমন হয় যে বস্তুটিকে চাওয়া হচ্ছে অন্য কোন বস্তু লাভের উপায় হিসাবে—বাহ্যিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য—বস্তুটি সৃষ্টি হয়েছে, তখন বস্তুটিকে সভ্যতা শ্রেণীভুক্ত করতে হবে। যেখানে বস্তুর মধ্যে সভ্যতা লক্ষণ এবং সংস্কৃতি লক্ষণ দু'টোই থাকে—অনেক বস্তুতেই এমনটি দেখা যায়—বিশেষতঃ আমাদের পোষাক পরিচ্ছদে এবং ঘর বাড়ীতে—সেখানে ঐ দু'টি লক্ষণ উল্লেখ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

সভ্যতার এবং সংস্কৃতির যে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হ'ল, তা' থেকে

উভয়ের তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ বেশ পাওয়া যায়। সমাজ বিজ্ঞানীরা সে অবকাশের অসদ্ব্যবহার করেননি।

তুলনামূলক আলোচনা করে তাঁরা দেখিয়েছেন:

(ক) সভ্যতাকে পরিমাপ করার নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে, সংস্কৃতির তা নেই। সভ্যতার অন্তর্গত বস্তুগুলি যেহেতু লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায়, সেইহেতু,—অবশ্য লক্ষ্য ঠিকভাবে নির্ধারিত থাকলে—বস্তুগুলির উৎকর্ষ-অপকর্ষ পরিমাপ করা সম্ভব। হাতে-ঠেলা লাঙ্গলের চেয়ে কলের-লাঙ্গল যে ভালো, এ কথা সকলেই স্বীকার করবে, বিনিময় ব্যবস্থা থেকে আজকের মুদ্রা-ব্যবস্থা যে বেশী সুবিধাজনক, এ কথাতেও কেউ আপত্তি করবে না, কিন্তু সংস্কৃতিকে পবিমাপ করবার কোন সার্বজনিক মানদণ্ড নেই। বানার্ড শ' যদি মনে করেন তিনি শেক্সপীয়রের চেয়েও বড়ো নাট্যকার, তা' হ'লে কেউ তাঁর দাবীকে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত করতে পারেন না, আমরা শুধু ঐ মত মানতে বা না-মানতে পারি এই মাত্র। এর কারণ এই যে সংস্কৃতির মূল্য-বিচারে এক এক যুগের এক এক সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর এক এক রকম মত। এবং এক এক রকম মতের কারণ এই যে, যে মূল্যকে মানদণ্ড হিসাবে ধরা হবে সেই মূল্য সর্বজন স্বীকৃত নয, ব্যক্তির বিশ্বাসেব উপর তার স্থিতি, ব্যক্তিগত রুচির উপরে ঐ মূল্যের মূল্য নির্ভরশীল।

(খ) সভ্যতা সর্বদাই অগ্রগতিশীল কিন্তু সংস্কৃতি সর্বদা প্রগতিশীল নয়।

সভ্যতা সর্বদাই এগিয়ে চলে, এবং এগিয়ে চলে একটি বিশেষ লক্ষ্যের অভিমুখে। কোন আকস্মিক উৎপাতে সমাজের গতি ব্যাহত বা স্তব্ধ না হ'লে—সভ্যতার এগিয়ে চলার বিরাম থাকে না। সভ্যতার সামগ্রী শুধু যে এক যুগ থেকে অন্য যুগ উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে তাই নয়, সেগুলিকে সেইযুগ আরো উপযোগী করে তোলে, নতুন নতুন আবিষ্কারে সমৃদ্ধতর করে তোলে। একবার যা আবিস্কৃত হ'চ্ছে, আবিষ্কারের পর তাকে নিত্য পরিবর্তন পরিবর্ধন ক'রে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যানবাহনের দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। মানুষ যান-বাহন উদ্ভাবন করেছে যাতায়াতকে দ্রুততর এবং আরামদায়ক করবার উদ্দেশ্যে। আদিম ব্যবস্থা থেকে যানবাহনের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করলেই

দেখা যাবে—যানবাহনকে মানুষ অধিকতর দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং আরাম-দায়ক করবার চেষ্টা ক'রে চলেছে। অন্যপক্ষে সংস্কৃতি সর্বদা উন্নতির লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে চলে না। সংস্কৃতির গতিতে জোঁয়ার ভাঁটা খেলে। গ্রীক নাটকের পরে রোমান নাটক, নাটকের প্রগতি নয়, তেমনি শেক্সপীয়রের পরে যে সব নাটক রচিত হযেছে তা' শেক্সপীয়র থেকে আরো ভালো বা বড় নাটক নয়। সংস্কৃতির প্রগতির সঙ্গে সভ্যতার প্রগতির এখানেই মস্ত বড় পার্থক্য। সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত, সংস্কৃতির অগ্রগতি অবধারিত নয়।

(গ) সভ্যতাকে অনায়াসেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে এবং সমাজের সর্বাংশে ছড়িযে দেওয়া চলে, কিন্তু সংস্কৃতিকে সেভাবে সঞ্চারিত করা যায় না। সংস্কৃতি সঞ্চারিত হয় সহৃদয়ের কাছে। শিল্পী ছাড়া আর কেউ শিল্প আস্বাদন করতে পারে না; সংগীতজ্ঞের কান না থাকলে সংগীত সম্ভোগ করা যায় না। সভ্যতার দানকে আমরা, যে বৃত্তি ঐ দানগুলি সৃষ্টি করেছে, সেই বৃত্তির সাহায্য না নিয়েই ভোগ করতে পারি, কিন্তু সংস্কৃতির দানকে সম্ভোগ করতে হ'লে, যে বৃত্তি থেকে বস্তুটির জন্ম সেই বৃত্তি দিয়েই তা' করতে হবে। অধিকন্তু দুয়ের সৃষ্টি প্রক্রিয়াও ভিন্ন। বড় বড় আবিষ্কর্তার আবিষ্কারকে ছোট ছোট বৈজ্ঞানিকরা মেজেঘসে উন্নত করতে পারে, কিন্তু কোন অল্পশক্তি নাট্যকার শেক্সপীয়রকে পরিমার্জনা করতে পারেন না। শিল্পীর সৃষ্টি শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে যত বেশী করে প্রকাশ করে থাকে, যন্ত্রবিদের যন্ত্র ততখানি যন্ত্রবিদের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে না। কোন জাতির বৈশিষ্ট্য তার সভ্যতার চেয়ে সংস্কৃতির মধ্যেই বেশী করে ধরা পড়ে। অতীতের বা বর্তমানের সংস্কৃতি থেকে আমরা কত কি গ্রহণ করতে পারি বা না পারি তা নিভর করে আমরা কি তার উপরে। আমরা গ্রহণ করি সেইটুকুই যেটুকু গ্রহণ করতে আমরা উপযুক্ত। নিজে মহৎ না হয়ে মহত্তর সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা যায় না।

কিন্তু সভ্যতার দানকে আমরা অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারি, যোগ্যতা না থাকলেও পারি। ইলেকট্রিক বাতি ব্যবহার করতে আমাদের বৈজ্ঞানিক হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, রেলগাড়ীতে চড়তে যন্ত্রবিদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সংস্কৃতি যেহেতু "immediate

expression of the human spirit"—মানবাত্মার প্রত্যক্ষ প্রকাশ—ঐ প্রকাশে অংশ গ্রহণ না করা পর্যন্ত সাংস্কৃতিক সৃষ্টিকে সম্ভোগ করা যায় না। তারপর, সংস্কৃতি যেহেতু মানবাত্মার প্রত্যক্ষ প্রকাশ সেহেতু সংস্কৃতির অগ্রগতি তখনই সম্ভব যখন আত্মা সূক্ষ্মতর কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম, যখন আত্মার প্রকাশযোগ্য আরো কিছু থাকে। সভ্যতা সংস্কৃতির বাহন বটে, কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতিতে সংস্কৃতির অগ্রগতি ঘটবেই এমন কোন নিয়ম নেই। রেডিও আমাদের কথাকে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে; কিন্তু তাই বলে রেডিও যে কথাগুলি প্রচার করবে তারা যে আগের কথার চেয়ে উচ্চতার চিন্তা হবে এমন কোন কথা নেই।

(ঘ) সভ্যতাকে অক্ষত এবং অপরিবর্তিত রূপে ধার করা যায়, সংস্কৃতিকে তা' করা যায় না। আধুনিক যুগে যানবাহন ব্যবস্থার অগ্রগতির ফলে, সব দেশেই সভ্যতার উপকরণগুলি ছড়িয়ে পড়ছে—এবং সভ্যতার রূপ এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অসভ্য জাতিরা পর্যন্ত তীর ধনুক ত্যাগ ক'রে বন্দুক ব্যবহার করছে। আর্থিক সামর্থ্যে সমর্থ হ'লে, প্রত্যেক সমাজই হস্তচালিত যন্ত্রের জায়গায় শক্তি-চালিত যন্ত্র চালু করতে ইচ্ছুক। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপ বদলে যেতে বাধ্য। কিন্তু সারা পৃথিবীতে এক রকম সভ্যতা চালু হওয়া সত্ত্বেও, সাংস্কৃতিক পার্থক্য লুপ্ত হবে না। শিল্পোন্নত দেশগুলির দিকে তাকালেই তা' বুঝা যেতে পারে। তবে এ কথা যেমন সত্য যে সাংস্কৃতিক ঋণ গ্রহণ (Cultural borrowing) অসম্ভব ঘটনা নয়, তেমনি এ কথা আরো সত্য যে—পুরো-পুরিভাবে ঋণ গ্রহণ সম্ভব নয়, এই গ্রহণ বাছ-বিচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রুচি-সাম্যের দ্বারা প্রভাবিত এবং গ্রহীতার ব্যক্তিত্বের দ্বারা সর্বদাই অনুরঞ্জিত, এমন কি বিকৃতও বটে। এই কারণে সভ্যতার প্রসার যত দ্রুতগতিতে ঘটে, সংস্কৃতির প্রসার তত দ্রুতগতিতে ঘটতে পারে না। সংস্কৃতির প্রসার নির্বাচনী প্রক্রিয়া (selective process) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য আরো স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যখন আমরা সংস্কৃতির সঙ্গে "বেসিক টেকনোলজি"র তুলনা করতে যাই। "সোসাল টেকনোলজি"—মূল্যের (Values) উপর নির্ভরশীল বলে পার্থক্যটি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে না।

কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের

সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কি ভাবে বিন্যস্ত হবে, মানুষেরগড়া সংগঠনকে নিয়ন্ত্রিত করতে কি ধরণের বিধি ব্যবস্থা করতে হবে, তা নির্ধারিত হয় প্রধানত সমাজের সাংস্কৃতিক মান বা অবস্থার দ্বারা। ঐ সমস্ত বিধি-বিধান অন্যের কাছ থেকে ধার করে আনা না যায় এমন নয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক মান সমান না হ'লে, বিধি বিধান ঠিক খাটে না। যেমন উপযুক্ত সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি না থাকলে, গণতান্ত্রিক সংবিধান, যাকে বলে 'যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়া' তা হ'তে পারে না।

এবার সভ্যতা ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সংযোগের দিকটি নিয়ে দু'একটি কথা বলেই প্রবন্ধটি শেষ করছি। সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরস্পর সম্পর্কিত বা সাপেক্ষ। কোন বস্তু বা প্রক্রিয়া প্রধানত সভ্যতা-সূচক অর্থাৎ প্রয়োগ-বৈজ্ঞানিক অথবা সাংস্কৃতিক হ'তে পারে, কিন্তু তার মধ্যে প্রয়োগ-নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দু'টো লক্ষণই থাকতে পারে। এ বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত এই—"The object that fall mainly in the category of civilization have generally and in different degrees a cultural aspect"—এবং "The objects that fall mainly in the category of culture have invariably a technological or utilitarian medium." অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তু প্রধানত সভ্যতার অন্তর্গত তাদেরও কম বেশী সাংস্কৃতিক দিক থাকে এবং যে বস্তুগুলি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত তাদেরও একটি প্রয়োগ-বৈজ্ঞানিক বা ঔপযোগিক মাধ্যম থাকে। প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক উৎপন্ন দ্রব্যের সাংস্কৃতিক দিক যে থাকে তার দৃষ্টান্ত খুঁজতে বেশীদূর যেতে হবে না। প্রয়োজনীয় দ্রব্যকে আমরা সব সময়েই সুন্দর করতে চাই—গ্লাস হোক, ঘটি হোক, থালা হোক, বাটি হোক, টেবিল হোক, চেয়ার হোক, মোটর হোক, বাড়ী হোক, সব কিছুকেই আমরা সুদৃশ্য করবার চেষ্টা করে থাকি—এক কথায় সৌন্দর্যমূল্যে মূল্যবান করতে চাই। বস্তু সম্বন্ধে যে কথা সত্য প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন সম্বন্ধে সে কথা আরো প্রযোজ্য। একটি সংবিধান বা বিধি-বিধান শুধু শাসন ব্যবস্থারই উপায় মাত্র নয়; সঙ্গে সঙ্গে তা একটা জাতির আত্মাকেও প্রকাশ করে এবং করে বলেই সেগুলি ঐতিহ্যের বিগ্রহ হিসাবে নিরপেক্ষ মূল্যের অধিকারী হয়ে উঠে।

দ্বিতীয়ত সাংস্কৃতিক দ্রব্যসম্ভারের প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক মাধ্যম থাকে এটা প্রমাণ করাও খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। যে সমস্ত ঘটনাকে আমরা সংস্কৃতির প্রকাশ বলে মনে করে থাকি তাদের অস্তিত্বও বাস্তব মাধ্যম এবং প্রয়োগ-বিজ্ঞানের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

প্রকাশের মাধ্যম ভাষা হোক, বা বর্ণ হোক, বা পাথর হোক অথবা ইংগিত বা অন্য বাহ্যিক সংকেতই হোক, সব ক্ষেত্রেই প্রকাশ, প্রযোজ্য উপকরণের সামর্থ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সীমাবদ্ধ। এ বিষয়ে এই সিদ্ধান্তই সমীচীন—যে (ক) প্রত্যেক স্তরেই "টেকনোলজি" (প্রয়োগ-বিজ্ঞান) সংস্কৃতির বাহন (খ) সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ কি পরিমাণে সীমাবদ্ধ বা কি পরিমাণে মুক্ত তার নিয়ামক (গ) সংস্কৃতির পরিবেশ, যার সঙ্গে সংস্কৃতি সর্বদাই কিছু পরিমাণে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করে। সভ্যতা সংস্কৃতির বাহন—তার ভাল দৃষ্টান্ত—সাহিত্যের আধুনিক রূপ-রীতির এবং প্রসারের সঙ্গে মুদ্রাযন্ত্রের সম্পর্কটি। আজ সাহিত্যে যে বড় বড় নভেল দেখা যাচ্ছে এবং সাহিত্য-রসিকের সংখ্যা যে এতো পরিমাণে বেড়েছে, তার মূলে রয়েছে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও উন্নতি। দ্বিতীয়ত সভ্যতা তার প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক উন্নতির দ্বারা সহজে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করায়, মানুষ অনেকখানি শক্তি সঞ্চয় করতে পারে এবং সেই শক্তিকে সাংস্কৃতিক সামগ্রী তৈরির কাজে নিয়োগ করতে পারে। এই ভাবে সভ্যতা সংস্কৃতির পরিপোষণে সহায়ক হ'য়ে থাকে। তৃতীয়ত, সভ্যতা শুধু যে সংস্কৃতির মুক্তির পথই প্রশস্ত করে তা' নয়, মন ও পরিবেশের সম্পর্ককে ঐ ভাবে এক কথায় ব্যক্ত করা চলে না। আমরা যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি তারা আমাদের বাসনারই সৃষ্টি বটে, কিন্তু তারা উলটে আমাদের বাসনাকে জাগ্রত করে, পরিবর্তিত করে এবং ভিন্নখাতে পরিচালিত করে। আমরা প্রয়োজন সিদ্ধ করতে যে যন্ত্র উদ্ভাবন করি, তা আমাদের জীবনযাত্রা, চিন্তা, আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয় প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে সভ্যতা যেন আমাদের উপরে প্রতিশোধ নেয়। যন্ত্রযুগ আসার পরে, আমাদের মধ্যে নতুন অভ্যাস, নতুন আমোদ-প্রমোদ, নতুন দর্শন, নতুন নীতিবোধ, নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা, নতুন যান-বাহনের ব্যবস্থা এসেছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আমাদের বিশ্বের ধারণা, অণুবীক্ষণ যন্ত্র

আমাদের জীবনের প্রকৃতির ধারণা বদলে দিয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে আমাদের ধর্মীয় সংস্কার ও নীতিবোধকে প্রভাবিত তথা পরিবর্তিত করেছে।

এ যেমন একদিকের কথা, তেমনি অন্যদিকের কথা এই যে সংস্কৃতিও সভ্যতাকে প্রভাবিত করে থাকে। সংস্কৃতি হচ্ছে "realm of final valuation" 'পরম মূল্যের রাজ্য' এবং মানুষ সমগ্র জগতকে—তৎসহ তাদের সমস্ত ক্রিয়াকৌশল, যন্ত্রপাতি ও শক্তিকেও, ঐ মূল্যের আলোকেই ব্যাখ্যা করতে বাধ্য। প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক যুগের, বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে, নিজস্ব চিন্তা এবং দর্শন আছে; এক কথায় বিশেষ ধরণের মূল্যবোধ আছে।

ঐ জাতি বা যুগ যে শক্তি ব্যবহার করে এবং যে-ভাবে ব্যবহার করে, যে বস্তু আবিষ্কার করার জন্য আগ্রহী হয়, এবং যে কাজে সেই আবিষ্কারকে নিয়োগ করে, যা যা সঞ্চয় করে এবং সঞ্চয়কে যে ভাবে ব্যবহার করে,—এ সমস্ত ঐ বিশেষ জাতির বা যুগের জ্ঞান, বিশ্বাস, সংস্কার এবং মূল্যবোধ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। ভারতবর্ষ আণবিক গবেষণার জন্য অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত না হলেও আণবিক বোমা তৈরি করতে অনিচ্ছুক। এই অনিচ্ছার কারণ আর্থিক অভাব নয়; অনিচ্ছার কারণ এই যে, ভারতবর্ষ অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী, অহিংসাকে ভারতবর্ষ বড একটি মূল্য বলে স্বীকার করেছে।

এখানেই উপসংহার করা যাক। সমাজ বিজ্ঞানীরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংজ্ঞা, স্বরূপ এবং সম্পর্ক সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, সেই আলোচনার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টাই এখানে করেছি। তাঁদের মত সমালোচনার কোন চেষ্টা আমি করিনি। এই প্রবন্ধ রচনায় আমার কৃতিত্ব এই টুকুই যে আমি তাঁদের কথাকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি এবং সে চেষ্টা পারিভাষিক শব্দের সার্থক অনুবাদের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য

(প্রাক চৈতন্য যুগ পর্যন্ত)

দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সাহিত্যের সৃষ্টি মুখ্যত জয়দেবের গীতগোবিন্দ নিয়ে। এর পূর্বে সাহিত্যাকারে বৈষ্ণব রচনা না পাওয়া গেলেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লেখা বাংলাদেশে যে না মেলে তা নয়।

রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার সর্বপ্রথম আভাস পাওয়া যায় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কামরূপরাজ বনমাল বর্মদেবের একটি লিপিতে। ভোজবর্মার বেলাবলিপিতেও এর স্বীকৃতি আছে। আর বাঙালী কবি রচিত সর্বপ্রথম কৃষ্ণলীলার চিত্র পাওয়া যায় 'কবীন্দ্র সমুচ্চয়' গ্রন্থে। কবীন্দ্র সমুচ্চয় ও সদুক্তিকর্ণামৃত নামে সুপ্রাচীন দুটি সংগ্রহ গ্রন্থই সংকলিত ও সম্পাদিত হয় বাঙালী মনীষী দ্বারা।

কবীন্দ্র সমুচ্চয় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে নেপালে। গ্রন্থটি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর আদি বঙ্গাক্ষরে লেখা। সংকলয়িতার নাম জানা যায় নি; তবে তিনি যে বাঙালী ছিলেন তা অনুমান করা যায় কবিদের নাম প্রামাণ্যে। গ্রন্থে ৫২৫টি শ্লোক ও ১১১ জন কবির নাম আছে। তন্মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী। বৈদেশিক আক্রমণ পর্যুদস্ত বাংলা দেশ থেকে গ্রন্থখানি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল নেপালে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ চর্যাপদও এই কারণে নেপালে চলে গিয়েছিল।

প্রায় হাজার বছর পূর্বে যে কবিতা সংগ্রহ বা কবিতাচয়ন-ধারার প্রবর্তন হয় বাংলা দেশে তার প্রমাণ হল কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয় গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে কৃষ্ণের ব্রজলীলার কতকগুলি মনোজ্ঞ শ্লোক আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি উদ্‌ধৃত হল,—

কোঽয়ং দ্বারি হরিঃ প্রযাহ্যুপবনং শাখামৃগেণাত্র কিং
কৃষ্ণোঽহং দয়িতে বিভেমি সুতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানরঃ।

মুগ্ধেঽহং মধুসূদনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাম্
ইত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া হ্রীণো হরিঃ পাতু বঃ॥

আমার কুঞ্জদ্বারে কে? আমি হরি। তুমি যদি হরি অর্থাৎ বানর, তবে উপবনে যাও; বানরের এখানে কি প্রয়োজন? অয়ি প্রিয়ে রাধিকে, আমি কৃষ্ণ। তুমি যদি কালো বানর হও তাহলে তো আমি অত্যন্ত ভয় পাব; বানর কি কখনও কালো হয়? অয়ি মুগ্ধে রাধিকে, আমি মধুসূদন। তুমি যদি মধুসূদন তবে পুষ্পিত লতার কাছে যাও। প্রিয়া কর্তৃক এইরূপে নিরুত্তরীকৃত লজ্জিত হরি তোমাদের রক্ষা করুন। (হরি =কৃষ্ণ, অন্য অর্থে বানর, মধুসূদন=কৃষ্ণ, অন্য অর্থে মধুকর।)

উক্ত শ্লোকটির মধ্যে রয়েছে খণ্ডিতা রাধিকার অভিমান উক্তি। রাসে কৃষ্ণ অন্য নায়িকাসক্ত হলে সখীমুখে সেই সংবাদ শুনে রাধিকা রাসস্থল থেকে দূরে এক নিভৃত কুঞ্জে চলে যান। পরে কৃষ্ণ রাধাকে না দেখতে পেয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং সকলকে ছেড়ে তাঁর অন্বেষণে নিরত হন। শেষে এক পিকবরের সাহায্যে রাধাকুঞ্জে গিয়ে কৃষ্ণ উপস্থিত হলে রাধিকা এমন ভাব করেন যেন কৃষ্ণকে চেনেনই না। সুতরাং নিষ্প্রয়োজনবোধে তাঁকে চলে যেতে বলেন। কৃষ্ণের উপর রাধিকার দারুণ অভিমানের কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে রূপকের মধ্য দিয়ে।

ময়াম্বিষ্টো ধূর্তঃ স সখি নিখিলামেব রজনীম্
ইহ স্যাদত্র স্যাদিতি নিপুণমন্যাভিসৃতঃ।
ন দৃষ্টো ভাণ্ডীরে তটভুবি ন গোবর্ধনগিরে
ন কালিন্দ্যাঃ [কূলে] ন চ নিচুলকুঞ্জে মুররিপুঃ॥

সখি রাধিকে, আমি সমস্ত রাত্রি ধরে সেই ধূর্তকে অন্বেষণ করেছি। কৃষ্ণ এখানে থাকতে পারে, সেখানেও থাকতে পারে এই ভেবে তন্ন তন্ন করে তার খোঁজ করেছি। কিন্তু সেই কৃষ্ণকে আমি ভাণ্ডীরবনে গোবর্ধন পর্বতের পাদদেশে, যমুনাকূলে বা বেতসকুঞ্জে কোথাও পেলাম না।

উক্ত শ্লোকে কৃষ্ণের ব্রজলীলার চিত্রই অঙ্কিত। কৃষ্ণ রাধিকাকে কুঞ্জ গমনের সংকেত করেছেন; তদনুসারে রাধিকা কুঞ্জে সারারাত্রি কৃষ্ণের অপেক্ষায় আছেন; কিন্তু কৃষ্ণের দেখা নেই। রাধিকা ব্যাকুল

হয়ে সখীকে পাঠিয়েছেন কৃষ্ণের অন্বেষণে। সখী বৃন্দাবনের সমস্ত স্থানে খুঁজেও কৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে বিষণ্ণ মনে ফিরে এসেছে রাধিকার কাছে।

[শীঘ্রং গচ্ছত] ধেনুদুগ্ধকলসানাদায় গোপ্যো গৃহং
দুগ্ধে বস্কয়িনীকুলে পুনরিয়ং রাধা শনৈর্যাস্যতি।
ইত্যন্যব্যপদেশগুপ্তহৃদয়ঃ কুর্বন্ বিবিক্তং ব্রজং
দেবঃ কারণনন্দসূনুরশিবং কৃষ্ণঃ স মুষ্ণাতু বঃ॥

গোপীগণ! তোমরা দোহা দুধের কলসী নিয়ে গৃহে যাও। অন্যান্য গাভীর দোহন শেষ হলে রাধা পরে ধীরে ধীরে যাবে। এই ছলে মনের কথা গোপন রেখে যে কৃষ্ণ ব্রজ অর্থাৎ বাথান নির্জন করলেন, সেই নন্দপুত্র কৃষ্ণ তোমাদের অমঙ্গল দূর করুন।

উক্ত শ্লোকটি গুরুত্বপূর্ণ; কারণ গীতগোবিন্দের প্রারম্ভ শ্লোকটির সঙ্গে এই শ্লোকটির মর্মার্থের সাদৃশ্য আছে। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে রাধাকৃষ্ণের মিলনের জন্য যে প্রয়াস দেখা যায়, আলোচ্য শ্লোকটিতেও সেই চেষ্টাই বিদ্যমান; প্রার্থনা বিষয়েও প্রায় ঐক্যই রয়েছে। এতে মনে হয়, 'কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়'-এ যেটুকু অস্পষ্ট ছিল, তাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রথম শ্লোকে। কৃষ্ণ যোগমায়া—অবলম্বনে লীলা প্রকাশ করেছিলেন বৃন্দাবনে। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির রচনায় উক্ত লীলামাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে অপূর্ব সুরে, ছন্দে, অলংকারে; কিন্তু সেই লীলার অরুণোদয় দেখা যায় কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয় গ্রন্থের আলোচিত শ্লোকসমূহে। গ্রন্থটিও বাঙালী কবির দ্বারা সংকলিত। সেইজন্য বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনায় কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয় গ্রন্থটি সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, কৃষ্ণের ব্রজলীলার আভাস বাংলাদেশে সংস্কৃতে প্রকীর্ণ শ্লোকে পাওয়া গেলেও প্রাকৃত অপভ্রংশ যুগেও যে ঐ লীলা অবিদ্যমান ছিল না এদেশে তারও প্রমাণ দুর্লভ নয়। বস্তুতঃ কাহ্ন, রাই, নান্দ, আইহন প্রভৃতি নাম বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণলীলা লোকমুখে বহুকাল আগে থেকেই চলে আসছিল। শেষে এই লীলাকথা সাহিত্যের আকার ধারণ করে প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে।

বাংলাদেশে রচিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা ও বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার বর্ণনার কথা পাওয়া যায় 'মানসোল্লাস বা অভিলষিতার্থ চিন্তামণি' নামে একটি কোষগ্রন্থে। এই গ্রন্থে উদধৃত গানগুলি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় রচিত। বাংলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গানগুলি কৃষ্ণের ব্রজলীলা-অবলম্বনে। বলা বাহুল্য, ঐ গানগুলি এত লোকপ্রিয় যে সুদূর মহারাষ্ট্রের প্রান্তে রচিত কোষগ্রন্থটিতে গানগুলি উদধৃত হয়েছে। এই কোষগ্রন্থটি চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় ১১২৯ খৃষ্টাব্দে লেখা।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে রচিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে প্রায় আশি জনের উপরে বাঙালী কবির রচনা পাওয়া যায়। নামের পূর্বে 'গাঁই' উল্লেখ থাকায় কতকগুলি কবিতা যে বাঙালী ব্রাহ্মণ কবির তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। যেমন ভট্টশালীয় পীতাম্বর, বন্দ্যঘটীয় পুণ্ড্রোক ইত্যাদি। ইহা ছাড়া দিবাকর দত্ত, নারায়ণ দত্ত, বসন্ত দেব, বিনয় দেব, পশুপতি ধর, শংকর ধর, কালিদাস নন্দী, ত্রিপুরারি পাল প্রভৃতি নিশ্চিত বাঙালী কবি। সদুক্তিকর্ণামৃতের সংকলয়িতা শ্রীধর দাসের পিতা বটু দাস ছিলেন লক্ষ্মণ সেন দেবের অন্তরঙ্গ সখা। সুতরাং বাঙালী সংকলয়িতার গ্রন্থে বাঙালী কবিই বেশির ভাগ স্থান অধিকার করেছেন বলে নিশ্চিত অনুমান করা যায়। এই সদুক্তিকর্ণামৃতে লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন, শরণ প্রভৃতির রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদ পাওয়া যায়।

'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ' নামে সাগর নন্দীর রচিত একখানি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে বহু বাঙালী লেখকের নাম আছে। 'রাধা', 'সত্যভামা', 'কেলি রৈবতক', রেবতীপরিণয়' ইত্যাদি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নাট্যনিবন্ধগুলি বাঙালী কবির রচিত। 'নাটক লক্ষণ রত্নকোষ' ঠিক কখন রচিত তা বলা যেতে না পারলেও এই পর্বে যে রচিত তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের আসরে সুদীপ্ত আলোকবর্তিকা হাতে করে উপস্থিত হলেন কবি জয়দেব। ইনি লক্ষ্মণসেন দেবের সভার অন্যতম কবি। সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজ রাজসভাকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। কবি ধোয়ী লক্ষ্মণসেনকে বাংলার বিক্রমাদিত্য বলেছেন। সেন রাজারা সকলেই ছিলেন বিদ্যোৎসাহী; তা ছাড়া তাঁরা নিজেরাও কবি ছিলেন। বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন,

কেশবসেন প্রভৃতি যে কবি ছিলেন তা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় ছিলেন পাঁচজন স্বষ্টিধর কবি—গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি ধর ও ধোয়ী। গীতগোবিন্দের প্রথম সর্গান্তর্গত চতুর্থ শ্লোকে এই পাঁচজন প্রখ্যাত কবির উল্লেখ রয়েছে,—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্ধর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবর্ধন।
স্পর্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥

বাক্যকে পল্লবিত করে তোলেন উমাপতি ধর; শরণ প্রশংসা অর্জন করেছেন দুরূহপদের দ্রুত রচনায়; শৃঙ্গাররসের সৎ ও পরিমিত রচনায় আচার্য গোবর্ধনের সঙ্গে কেউ যে স্পর্ধা করতে পারে এমন শোনা যায় না; কবিরাজ ধোয়ী শ্রুতিধর বলে প্রসিদ্ধ; আর কবি জয়দেব শুদ্ধ সন্দর্ভ রচনায় সমর্থ।

এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব; তার প্রমাণ গীতগোবিন্দ গ্রন্থ। বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে ইনি চিরদিন বিরাজিত। এক কথায় বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠেছে জয়দেবকে নিয়ে। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্যের যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা আজও সেইরূপ প্রাণবন্তই আছে। জয়দেব শুধু বাংলার কবি বলেই পরিচিত নন; তিনি সর্বভারতীয় কবিদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শুধু কবিই নন, একজন ভক্ত সাধকও। গীতগোবিন্দে রয়েছে রাধাকৃষ্ণলীলার মাধ্যমে প্রেমমধুর ভক্তিরসময় সাধনার উপায়। রাধাকৃষ্ণপ্রেমলীলায় শ্রুতিমাধুর্য ও শৃঙ্গারভাবৈশ্বর্য থাকায় রসিক বৈষ্ণব সমাজে তথা জনমণ্ডলীমধ্যে জয়দেব যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভের অধিকারী হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের পর গীতগোবিন্দ শুধু সাহিত্যই রইল না, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম মূল প্রেরণাদায়ক ধর্মগ্রন্থরূপে পরিণত হল এবং জয়দেবকে সকলে দিব্যোন্মাদ সাধকরূপে দেখতে লাগলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, গীতগোবিন্দের প্রায় সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তী কালে রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও ঘন কামনাবাসনাময় আবহের মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলা-আশ্রয়ে একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়কামনা-চরিতার্থতা ও প্রেমভক্তির জয় ঘোষণা করা হয়েছে।

শ্রীরূপগোস্বামীর রসব্যাখ্যায় প্রভাবিত গীতগোবিন্দের যে মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হল তার ফলে সমগ্র উত্তর ভারতে বহু শত বৎসর ধরে গীতগোবিন্দ সমাদৃত হয়ে আসছে। বৈষ্ণব সমাজ ছাড়াও যে-সব সমাজের প্রধান আশ্রয় ভক্তি ও প্রেম, তারাও গীতগোবিন্দকে ধর্মগ্রন্থরূপে দেখতে লাগল। এর ফলে জয়দেব সহজিয়া সম্প্রদায়ের আদি গুরু এবং নব রসিকের অন্যতম বলে পরিগণিত হলেন। দক্ষিণের বল্লভাচারী সম্প্রদায় ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করে নিলেন গীতগোবিন্দকে; শৃঙ্গার-ভাবাত্মক গ্রন্থও রচিত হতে লাগল গীতগোবিন্দের অনুকরণে। স্বয়ং বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্ঠলেশ্বর গীতগোবিন্দের অনুকরণেই শৃঙ্গাররসমণ্ডিত একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। গীতগোবিন্দ এতই লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে গ্রন্থটির চল্লিশখানা টীকাও রচিত হয়েছে। আর গ্রন্থের অনুকরণে প্রায় দশ বার খানা কাব্য লেখা হয়েছে; সেগুলিতে গীত-গোবিন্দের শ্লোকও উদধৃত দেখতে পাওযা যায়। 'রসিকপ্রিয়া' নামে গীতগোবিন্দের অন্যতম টীকা মেবারের রাণা কুম্ভের নামে পরিচিত। ওড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের আদেশে গীতগোবিন্দের গান ছাড়া অন্য কোনো গান গাওয়া হত না—একথা জানা যায় জগন্নাথমন্দিরের একটি শিলালেখ থেকে।

গীতগোবিন্দের এই জনপ্রিয়তার কতকগুলি কারণ ছিল। এর ভাষা সংস্কৃত হলেও প্রায় নূতন ধরণের—যেন চিরাচরিত সেই সংস্কৃত নয়। গীতগোবিন্দ যে সময়ে লেখা, সে সময় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শেষাবস্থা; এই কালটি হল অপভ্রংশ বা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অভ্যুদয়কাল। এই কারণে এক শ্রেণীর রচনা এ যুগে দেখা যায় যা প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত নয়, অথচ নূতন দেশীয় সাহিত্যের পূর্ণ স্বাধীনতাও সে পায়নি। সংস্কৃতের উপর দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবই এর মূল কারণ। কাজেই গীতগোবিন্দে যেন সরল সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষার মিলন হয়েছে। ভাবে ও ভাষায় বর্ণনামূলক সংস্কৃত কাব্যের ধারা গ্রন্থে অনুসৃত হলেও পদ বা গীতগুলিতে অপভ্রংশ ও ভাষাকাব্যের ছায়া পড়েছে। এক কথায় বলা চলে গীতগোবিন্দের ভাষা সংস্কৃত, ছন্দ প্রাকৃত, ভাব বাংলা। ছন্দও সংস্কৃত কাব্যের মতো অক্ষরবৃত্তমূলক নয়, শুধু মাত্রাবৃত্ত। মিলের দিক থেকে সর্বত্র অপভ্রংশ

ও ভাষাকাব্যের রীতিই অনুসৃত হয়েছে। অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে শ্লোকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকটি গীতের একটি সামগ্রিক রূপ লক্ষিত হয় অন্ত্য মিল ও ধুয়ার সহায়তায়। ভাষাকাব্যের রীতিই এ বিষয়ে অনুসরণ করা হয়েছে। জয়দেব গ্রন্থটিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য করার জন্য লোকায়ত চলিত ভাষা-সাহিত্য থেকে এই রূপটি নিয়েছিলেন। জয়দেবের প্রধান কৃতিত্ব এইখানে যে চলিত সাহিত্যের গান ও গীতিনাট্যের ভাব নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যকে একটা নূতন রূপ দিলেন। সেই সময়ে এক ধরণের যাত্রাও অভিনীত হত ; তার প্রভাবও পড়েছে গীতগোবিন্দে। সুতরাং ভাষার অভিনবত্ব ও আঙ্গিক গঠনকুশলতায় সম্পূর্ণ নূতনত্ব গীতগোবিন্দের লোকপ্রিয়তার অন্যতম বিশেষ কারণ। গীতগোবিন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য, এতে অলৌকিক দেবকাহিনী ও লৌকিক প্রেমগাথার মধ্যে যেন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হয়েছে। ভারতীয় সাহিত্যে এর আগে এমন রূপ আর মেলে না। জয়দেব যে সমন্বয়ের সৃষ্টি করলেন তাই হল পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধানতম অবলম্বন। মানবিক ভাবের মধ্য দিয়ে দেবলীলার বর্ণনা জয়দেবই প্রথম দেখালেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে নাট্যধর্মও গীতগোবিন্দে দুর্লভ নয়। রাধাকৃষ্ণের কথোপকথন, রাধা-সখীর মধ্যে উক্তি-প্রত্যুক্তি নাটকীয়তারই লক্ষণ। সংস্কৃতে এ ধরণের রচনা সম্পূর্ণ নূতন। সাধারণ নর-নারীর প্রেমের ছায়ায় ভক্তিরসের পরিবেশনে গীতগোবিন্দ যেন একটি বিপ্লব এনেছে এবং এই বিপ্লবজাত প্রাণধারাই মুখ্যত বহমান বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীর অমিয়স্রোতে। জয়দেব যে তাঁর গ্রন্থটিকে মধুর কোমল কান্ত পদাবলী বলেছেন তা যথার্থ। এ কথাও সর্ববাদিসম্মত যে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যথার্থ প্রস্তাবনা গীতিকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ নিয়ে।

জয়দেব সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে তাঁর পিতার নাম ভোজদেব, মাতা বামাদেবী এবং জন্মস্থান বীরভূমের অজয় নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে। পত্নীর নাম পদ্মাবতী বলে প্রায় সকলে অনুমান করেন ; কারণ গীতগোবিন্দের দুটি স্থানে আছে 'পদ্মাবতীরমণ জয়দেব কবি' এবং 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী'। পদ্মাবতী নৃত্যগীতনিপুণা ছিলেন। জয়দেব গীতগোবিন্দের পদ গান করতেন, আর পত্নী পদ্মাবতী তালে তালে

নাচতেন। তবে এইগুলি সবই জনশ্রুতি মাত্র। নাভাজী দাসের ভক্তমাল গ্রন্থ ও চন্দ্রদত্তের ভক্তমালায় এই সব কাহিনীর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যায়।

একটা প্রশ্ন উঠেছে, জয়দেব সত্যই বাঙালী ছিলেন কিনা। এর উত্তরে বলা যায়, বীরভূমের কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রামে বহু প্রাচীন কাল থেকে পৌষ সংক্রান্তিতে জয়দেবের স্মরণে বিরাট উৎসব ও মেলা হয়ে আসছে। এ বিষয়ে কোনো কৃত্রিমতার নামগন্ধ নেই। দ্বিতীয়ত, গীতগোবিন্দে উল্লিখিত ধোয়ী, উমাপতি, শরণ, গোবর্ধন আচার্য—এই কবিমুখ্য চারজনই বাঙালী এবং তাঁরা বাংলার মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের সভায় বর্তমান ছিলেন। তৃতীয়, মনীষী অক্ষয়কুমার সরকার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সকলেই জয়দেবকে বাঙালী বলেই জানতেন। তাঁরাও জেনেছিলেন পূর্বসূরিদের কাছে থেকে। সুতরাং পরম্পরাগত এ সত্যের বিভ্রান্তি কখনই হতে পারে না। বাঙালী চর্যাকারদের অবাঙালী করার অপচেষ্টার মতো মিথ্যা প্রয়াস দেখা যায় বীরভূমবাসী জয়দেবের ক্ষেত্রেও। অবশ্য সংস্কৃত সাহিত্যে একাধিক জয়দেবের নাম আছে। একজন ছন্দসূত্রের রচয়িতা এবং অপরজন 'প্রসন্ন রাঘব' নাটক ও 'চন্দ্রালোক' অলংকার গ্রন্থের প্রণেতা। টীকাকার হর্ষট (৯ম শতাব্দী) ও আলংকারিক অভিনব গুপ্ত (১০ম শতাব্দী) ছন্দ-সূত্রকার জয়দেবের উল্লেখ করেছেন। ইনি গীতগোবিন্দকার জয়দেবের পূর্ববর্তী। দ্বিতীয় জয়দেবের পিতার নাম মহাদেব এবং মাতার নাম সুমিত্রা। কাশ্মীরের কবি জহ্লন সূক্তিমুক্তাবলীতে (১৩শ শতাব্দী) 'প্রসন্ন রাঘব'-এর শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এই জয়দেব বাঙালী জয়দেবের সমসাময়িক মনে করা যেতে পারে।

এইবার মূল গ্রন্থ গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকটিতে রয়েছে রাধামাধবের নিত্যলীলা-সম্বলিত জয়গান,—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥

মেঘে গগন আচ্ছন্ন, তমালবৃক্ষে বনভূমিসমূহ শ্যামল আকার ধারণ

করেছে ; তার উপর এখন রাত্রিকাল। হে রাধিকে! কৃষ্ণ ভীত হয়ে পড়েছে ; অতএব তুমি একে ঘরে নিয়ে পৌছিয়ে দাও। এই প্রকারে নন্দের নির্দেশক্রমে যমুনাকুলে প্রতিপথ-তরুকুঞ্জে সঞ্চরণকারী রাধামাধবের নির্জনকেলি জয়যুক্ত হোক।

'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ এবং রূপগোস্বামীর 'পদ্যাবলী'-তে অনুরূপ শ্লোক পাওয়া যায়—একটি লক্ষ্ণণসেনের এবং অপরটি কেশবসেনের নামে। প্রত্যেক শ্লোকেই রাধামাধবের জয়গান রয়েছে ; তবে লক্ষ্ণণসেন-রচিত শ্লোকে নন্দের কোনো প্রসঙ্গ নেই ; কিন্তু কেশবসেনের শ্লোকে নন্দের পরিবর্তে যশোদার উল্লেখ রয়েছে। জয়দেব, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন ধৃত তিনটি শ্লোকেরই মর্মার্থ এক। এই লক্ষ্য করে অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় বলেন, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি জয়দেবের রচিত নয়, লক্ষ্মণসেন দেবের ; কারণ এরূপ কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক একাধিক শ্লোক রচনা করেছেন লক্ষ্মণসেন শার্দুলবিক্রীড়িত ছন্দে এবং 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি' কথাটিও রয়েছে নমস্কারসূত্র হিসেবে ; কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে হয় মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের অনুসরণেই জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক রচনা করেছিলেন, হয়ত এতে মহারাজের প্রীতির উদ্রেক হবে মনে করে, অথবা হয়ত তিনজনই একই কল্পনা নিয়ে পৃথক পৃথক শ্লোক রচনা করেছিলেন হাল্‌কা প্রতিযোগিতার মন নিয়ে। সেকালে রাজা ও কবি বাহ্যত বিভিন্ন হলেও মনের দিক দিয়ে ছিলেন এক ; ঠাট্টা, রঙ্গ-রসিকতাও চলত উভয়ের মধ্যে। সুতরাং হাস্যরসোচ্ছল আনন্দ-পরিবেশে প্রায় এক রকম রচনা বিভিন্ন লেখনীতে সৃষ্ট হওয়া এ-কবারে অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটির প্রভাব পড়েছে 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' এবং 'গর্গসংহিতা'য়। (পুরাণের 'শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডে'র পঞ্চদশ অধ্যায় এবং সংহিতায় 'গোলোকখণ্ডে'র ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এতে গীতগোবিন্দের বিপুল লোকপ্রিয়তাই সপ্রমাণ করে।

গীতগোবিন্দ দ্বাদশ সর্গে সম্পূর্ণ এবং প্রত্যেকটি সর্গের নাম পৃথক পৃথক। প্রত্যেক সর্গের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে প্রদত্ত হল,—

প্রথম সর্গ—কন্দর্পজ্বরাতুরা রাধিকা বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে খুঁজছেন ; কিন্তু সখী তাঁকে দেখিয়ে দিলেন যে কৃষ্ণ অন্য নায়িকার প্রতি আসক্ত হয়ে অন্যত্র আছেন।

দ্বিতীয় সর্গ—কৃষ্ণকে অন্যাসক্ত জেনে রাধিকা এক লতাকুঞ্জ আশ্রয় করে সখীর নিকট বিলাপ করতে লাগলেন।

তৃতীয় সর্গ—কৃষ্ণ যথাস্থানে রাধিকাকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হৃদয়ে রাধিকার অন্বেষণে নিরত এবং মুগ্ধচিত্তে তাঁরই কথা স্মরণ করছেন।

চতুর্থ সর্গ—রাধিকার সখী কৃষ্ণের নিকট এসে রাধিকার অবস্থা বর্ণনা করে কৃষ্ণের দর্শন স্পর্শনরূপ অমৃতরসায়ণের প্রার্থনা জানাল।

পঞ্চম সর্গ—রাধিকা অভিসারে আসবেন মনে করে কৃষ্ণ সাগ্রহনেত্রে পথপানে চেয়ে আছেন।

ষষ্ঠ সর্গ—রাধিকার সখী কৃষ্ণের নিকট এসে রাধিকার বিরহাবস্থার কথা জানিয়ে বলল যে কৃষ্ণের কৃতকর্মের জন্যই রাধিকার আজ এই দশা; অথচ রাধিকা অনবরত কৃষ্ণের কথাই বলছেন, আর সর্বত্র কৃষ্ণময় দেখছেন; এমন কি তিনিই স্বয়ং কৃষ্ণ, এই ভেবে তন্ময় হয়ে পড়েছেন।

সপ্তম সর্গ—এই সর্গে রাধিকার বিপ্রলব্ধা অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বাসকসজ্জা ব্যর্থ, কারণ কৃষ্ণ আসলেন না। তিনি নিশ্চয়ই অন্য নায়িকা-সক্ত হয়ে রাধিকাকে ভুলে গেছেন, এই চিন্তায় শ্রীমতীর নির্বেদ উপস্থিত। শেষে যমুনায় দেহ বিসর্জনে রাধিকা সংকল্প করলেন।

অষ্টম সর্গ—খণ্ডিতা নায়িকার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এই সর্গে। রাধিকা কৃষ্ণের দেহে অন্য নায়িকা কর্তৃক ভোগচিহ্ন দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছেন এবং কপটবাক্য না বলে কৃষ্ণকে সেই নায়িকার নিকট পুনর্গমন করতে বললেন।

নবম সর্গ—রাধিকার মান প্রশমনের জন্য কৃষ্ণ আকুল। সখী রাধিকাকে জানাল যে কৃষ্ণ স্বয়ং অভিসারে আসছেন; কাজেই এখন আর মান করা উচিত নয়; রাধিকার এই অবস্থা দেখে অন্য যুবতীরা হাসছে।

দশম সর্গ—কৃষ্ণ রাধিকার নিকট এসেছেন মান ভাঙাতে। এ-সময় রাধিকার ক্রোধ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলেও দীর্ঘ নিঃশ্বাস বইতে লাগল। কৃষ্ণ রাধিকার নিকট এসে নানা কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন; শেষে কৃষ্ণ রাধিকার পদপল্লব স্বীয় মস্তকে ধারণ করে রাধিকার মান ভাঙিয়ে সন্তুষ্ট করতে চাইলেন।

একাদশ সর্গ—বহুক্ষণ রাধিকাকে অনুনয়ের পর কৃষ্ণ তাঁকে প্রসন্ন করে কুঞ্জশয্যায় গমন করলেন। এদিকে সখীও রাধিকাকে তাড়া দিতে

লাগল সময়োচিত বেশধারণপূর্বক কৃষ্ণকুঞ্জে গমন করতে। সখীর কথায় আশঙ্কা ও আনন্দে কৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্বক রাধিকা কৃষ্ণের কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করলেন।

দ্বাদশ সর্গ—রাধাকৃষ্ণের মিলন; কৃষ্ণ রাধিকার প্রেমলাভে ও তাঁর সৌন্দর্যোপভোগে ধন্য হলেন।

গীতগোবিন্দের বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে শৃঙ্গাররসাত্মক ভাব বিদ্যমান। কেউ কেউ এই কারণে গীতগোবিন্দের উপর বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, শ্রীচৈতন্যদেব এর মধ্যে প্রেমভক্তি-রসেরই সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তদ্‌গতচিত্ত হয়ে এর রসাস্বাদন করতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জানা যায় যে চৈতন্যদেব—

বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥

সুতরাং ইহা নিশ্চিত যে জয়দেবের গীতগোবিন্দে প্রেমভক্তিরসের খনিই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এ-বিষয়ে অধিকারীভেদের কথাও ওঠে। নৌকাখণ্ডের গান শুনে কারও হয়ত কামকেলিবিলাস ভাবের উদ্রেক হয়, আবার কারও প্রেমভক্তিরসাবেগে নয়নযুগল থেকে বাষ্পবারি বিগলিত হয়। রাসের গান শুনে কেউ হয়ত মদনোন্মত্ত হয়ে ওঠে, আবার কেউ প্রেমপুলকাশ্রুতে আত্মহারা হয়ে যায়। সুতরাং যে বিষয়ে যার অধিকার নেই সে যদি তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয় তবে নিজের হয় সর্বনাশ এবং বিষয়টিরও মাহাত্ম্য হয় নষ্ট। সেই কারণে জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভেই বলেছেন,—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

সেই রসময় পরম পুরুষ কৃষ্ণের লীলা স্মরণে সরস বা প্রেমভক্তিরস পাথেয়-রূপে না থাকলে কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করা যায় না। ভক্ত সাধক ছাড়া ভগবানের অলৌকিক লীলারস আস্বাদন করা অসম্ভব; মধুররসের বিষয় তো দূরের কথা। পঞ্চরসের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস। এই মধুর রসের

ভজনা একমাত্র গোপীরাই করতে পেরেছিল। সখীর অনুগ হয়ে এই লীলারস আস্বাদন করতে হয়। সুতরাং এই মধুররসের সাধনা অত্যন্ত কঠিন; এমন কি কৃষ্ণ-প্রেয়সী রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতিও এ-রসের অধিকারী নন। গোপীভাব না হলে এ-রসের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। যুগাবতার চৈতন্যদেব প্রেমভক্তিরসের সন্ধান পেয়েছিলেন গীত-গোবিন্দের মধ্যে। তাই তিনি স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে জয়দেবের কাব্যের রসাস্বাদন করতেন। এই কারণেই চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী কর্তাদের নিকট জয়দেব একজন শ্রেষ্ঠ মহাজনের মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৈষ্ণব মহাজনগণ জয়দেবের কাব্যের রসাস্বাদন করতেন। বিশেষ করে মানভঞ্জনের পদগুলি অতি-উচ্চাঙ্গের। সখীরা মিলনের সমস্ত বাধা বিদূরিত করলেও কৃষ্ণকে কিন্তু রাধার মানভঞ্জন করতেই হয়েছে এই বলে,—

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্॥

অথবা

ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগম্॥

[কামবিষধ্বংসকারী আমার শিরোভূষণ তোমার উদার পদপল্লব আমার মস্তকে স্থাপন কর। অথবা, হে রাধিকে, তোমার কোমল চরণদ্বয় সরস অলক্ত রাগে রঞ্জিত করতে আদেশ দাও।]

সংস্কৃত ভাষায় গীতগোবিন্দ রচিত হলেও জয়দেব নিঃসন্দেহ বাংলা পদাবলী সাহিত্যের প্রবর্তক। বৈষ্ণব পদাবলী সৃষ্টিতে গীতগোবিন্দের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলার শত শত পদাবলীকার মধুর কোমলকান্ত কবির ভাবসমৃদ্ধে সমৃদ্ধিমান। মনস্বী অক্ষয়চন্দ্র সরকার যথার্থই বলেছেন 'জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যবর্তিনী ভাষা।' তিনি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন,—

'দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভবখণ্ডন মুনিজনমানসহংস
কালীয় বিষধর-গঞ্জন জনরঞ্জন যদুকুলনলিন-দিনেশ।'
অথবা, 'চন্দনচর্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী।'
অথবা, 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।'

মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাকাব্যে জয়দেবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জয়-দেবের শ্রুতিসুখকর রুচির পদাবলী যে মধুসূদনকে মুগ্ধ করেছিল তা এর থেকেই বোঝা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র জয়দেবে ইন্দ্রিয়লালসার প্রকাশ দেখলেও শব্দচয়ননৈপুণ্য, গীতঝঙ্কার, পদলালিত্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রশংসা না করে পারেন নি। তিনি জয়দেব সম্বন্ধে বলেছেন,—

'তিনি নিশ্চয়ই একজন উচ্চাঙ্গের কবি, তাঁহার শব্দচয়ন ও শব্দযোজনার সামর্থ্য অসাধারণ; শব্দগুলি যেন বীণার ঝঙ্কারের মতো সুরের লহর তুলিয়া শ্রবণপথে ভাসিয়া যায়। শব্দযোজনার প্রভাবে তিনি যে এক একটা ভাবের আলেখ্য মানসপটে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অতি উজ্জ্বল অতি সুন্দর, অতি মনোহর। কিন্তু তাঁহার অনুপম ভাষা ও চমৎকার ভাব-আলেখ্য মানুষকে কেবল রক্ত মাংসের উপদ্রবের প্রতি যেন জোর করিয়া টানিয়া ধরে।' পূর্বেই বলেছি, এই ইন্দ্রিয়লোলুপতা অনধিকারীর পক্ষে; কিন্তু প্রেমিক সাধক এর মধ্যে অমৃতেরই সন্ধান পেয়ে থাকেন।

জয়দেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে জানতে পারা যায় যে জয়দেব সংগীত ঝঙ্কারে কালিদাসকে অতিক্রম করলেও ব্যঞ্জনাধর্মিত্বে কালিদাস জয়দেবকে ছাড়িয়ে গেছেন। জয়দেব সম্বন্ধে ঐ মন্তব্য সত্য হলেও একটা কথা বলা প্রয়োজন যে জয়দেব শুধু কবিই ছিলেন না, একজন সাধকও। সুতরাং জয়দেবকে শুধু রসস্রষ্টা কবিরূপে দেখলেই চলবে না। গীত-গোবিন্দের রস আস্বাদন করতে হবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আলোকে।

অতঃপর আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের গীতগোবিন্দ সম্পর্কে মন্তব্য উদ্‌ধৃত করে জয়দেব প্রসঙ্গের উপসংহার করব,—

'বাঙ্গালা ভাষায় লেখা না হইলেও গীতগোবিন্দ বাঙ্গালীর কাব্য বলিয়া চিরদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের আবহমান ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো কাব্য নাই যাহা এই আট শতাব্দী ধরিয়া সমানভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে রস ও বাঙ্গালী পাঠক-চিত্তে আনন্দ যোগাইয়া আসিতেছে। শুধু তাহাই নয়, কালিদাসের মেঘদূত ছাড়া আর কোন কাব্য সমগ্র ভারতবর্ষে এমন আদর পায় নাই। মেঘদূত যেমন অজস্র কবিকে '—দূত' কাব্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে

গীতগোবিন্দও তেমনই অসংখ্য কবিকে 'গীত—' কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে।'

জয়দেবের পর বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে বিদ্যাপতির কথা এসে পড়ে। যদিও বিদ্যাপতি মৈথিল কবি, তথাপি বাঙালীরা তাঁকে অতি আপনজন বলে মনে করে, ভিন্ন প্রদেশবাসী বলে মনে করতেই পারে না। বিদ্যাপতির অনেক উৎকৃষ্ট পদ শুধু বাংলা দেশেই পাওয়া যায়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির ভাষার সঙ্গে মিথিলায় প্রাপ্ত পদগুলির ভাষার বিস্তর প্রভেদ। এর কারণ সম্বন্ধে মনে হয়, বিদ্যাপতির পদ গাইবার সময় বাঙালী গায়ক এমন সব পরিবর্তন করেছেন যাতে পদ সহজবোধ্য বৈষ্ণবীয় ভাবাপন্ন হয়। বলা বাহুল্য, চৈতন্যোত্তর যুগে একজন বাঙালী বিদ্যাপতিও সম্ভোগ ও অন্যান্য বিষয়ের পদ লিখে গৌরব অর্জন করেছিলেন।

পূর্বেই বলেছি, মৈথিল কবি বিদ্যাপতিকে বাঙালী নিজের বলে মনে করত। তাঁর পদের আস্বাদক ছিল বাঙালীরাই; মিথিলাবাসীর নিকট যেন তিনি অপরিচিতই ছিলেন। বাঙালীরা বিদ্যাপতিকে এত আপন করে নিয়েছিল যে বাঙালী পদকর্তারা মনে করতেন, বিদ্যাপতির মতো ভাব ও ভাষায় পদ রচনা না করতে পারলে সে পদ পদই নয়; অথচ মৈথিল ভাষায় পদকর্তাদের তেমন পটুতা ছিল না। কাজেই বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁরা এক কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টি করে ফেললেন—সেই 'ব্রজবুলি' না হল মৈথিল না হল খাঁটি বাংলা—একটা মাঝামাঝি রকমের ভাষা হয়ে দাঁড়াল; ব্রজবুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী পদকর্তা গোবিন্দদাসকে বিদ্যাপতির একেবারে ভাবশিষ্য বলা চলে। রায়শেখর, জ্ঞানদাস প্রভৃতি পদকর্তারাও উৎকৃষ্ট পদ লিখেছেন ব্রজবুলিতে। তাই বলছিলাম, বাঙালীরাই মৈথিল কবি বিদ্যাপতিকে আত্মসাৎ করে ফেলেছে।

বিদ্যাপতি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন চতুর্দশ, শতাব্দীর শেষপাদে। রাধাকৃষ্ণলীলার পদ ছাড়াও তিনি স্মৃতির নিবন্ধ, লিখনাবলী, বিভাগসার ইত্যাদি নানা গ্রন্থ লেখেন। তিনি ছিলেন শৈবধর্মাবলম্বী। প্রাদেশিক ভাষায় তিনিই প্রথম রাধাকৃষ্ণলীলারসাত্মক পদ রচনা করেন। সেই জন্য পদকর্তাদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে আছেন।

বিদ্যাপতির পদরচনাকৌশল, ভাবমাধুর্য, শব্দঝঙ্কার ইত্যাদি এতই অপূর্ব যে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁকে অন্যতম প্রধান কবি বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন নি। বিদ্যাপতির পদ বিশেষ অনুরাগের সঙ্গে আস্বাদন করতেন মহাপ্রভু।

বিদ্যাপতিকে সাধারণত সম্ভোগের কবি বলা হয়; কিন্তু বিরহের পদেও তিনি কম নৈপুণ্য দেখান নি। শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির পদে বিদ্যাপতির কৃতিত্ব অলোকসামান্য। শৈশবের শেষপ্রান্তে রাধিকা পৌঁছেছেন, যৌবন ঈষৎ উদ্‌ভিন্ন। তিনি নিজেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না,—

সৈসব জৌবন দুহু মিলি গেল। স্রবনক পথ দুহু লোচন লেল॥
বচনক চাতুরি লহু লহু হাস। ধরনিয়ে চাঁদ কএল পরগাস॥
মুকুর লই অব করঈ সিঙ্গার। সখিএ পুছই কইসে সুরত বিহার॥
নিরজন উরজ হেরই কত বেরি। হসই সে অপন পয়োধর হেরি॥…

কৃষ্ণ নীলবসনা গৌরাঙ্গীকে দেখতে পেয়েছেন শুধু ক্ষণেকের জন্য। তাতেই তিনি মদনাহত হয়ে সখীকে বলছেন,—

মেঘমালা সয়ঁ তড়িতলতা জনু। হিরদয়ে সেল দই গেল॥
আধ আঁচর খসি আধ বদন হসি। আধহি নয়নতরঙ্গ॥
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি। তবধরি দগধে অনঙ্গ॥…

রাধিকা এদিকে কৃষ্ণকে বারেক দেখতে পেয়ে লজ্জায় মাটির দিকে চেয়ে রইলেন; কিন্তু চাঁদকে দেখে চকোর যেমন ছুটে চলে তেমনই রাধার নয়নচকোর কৃষ্ণচন্দ্রের দিকেই অনবরত ধাবিত; তখন রাধা অগত্যা বলপ্রয়োগে তাকে চরণে ধরে রাখতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু মত্ত মধুপ উড়তে না পারলেও যেমন পক্ষ বিস্তার করতে থাকে, সেইরূপ রাধিকার চোখ দুটি চরণে নিবদ্ধ থাকলেও বার বার অপাঙ্গে মাধবের মুখ দেখতে চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু যখন—

মাধবে বোললি মধুরস বাণী সে সুনি মুদু মোঞে কান।
তাহি অবসর ঠাম বাঁম ভেল ধরি ফুল ধনু পঁচবাণ॥

রাধাকৃষ্ণের মিলনের চিত্রটি যেমন অপূর্ব তেমনই অভিনব। সুগভীর অনুরাগের মধ্যেও সংযমের বাঁধ ভাঙেনি; বরং মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়ে রাধিকার কৃষ্ণপ্রেম প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,—

পহিলহি রাধা মাধব ভেট। চকিতহি চাহি বয়ন করু হেট॥
অনুনয় কাকু করতহি কাহ্নু। নবীন রমনি ধনি রস নাহি জান॥
হেরি হরি নাগর পুলকিত ভেল। কাঁপি উঠু তনু, সেদ বহি গেল॥
অথির মাধব ধরু রাহিক হাথ। করে কর বাধি ধর ধনি মাথ॥

বর্ষাভিসারের পদেও বিদ্যাপতি কম নৈপুণ্য দেখাননি। সখী এসে রাধিকাকে জানিয়েছে'যে আজ রাতে কৃষ্ণ আসবেন, কিন্তু সন্ধ্যা হতেই দারুণ বর্ষা আর ঘন ঘন বিদ্যুৎ-ছটা ; এই অবস্থায়,—

কওনে পরি আওত বালভু হমার। আগু ন চলই অভিসারিনি পায়॥
গুরুগৃহ তেজি সয়নগৃহ জাথি। তিথিকু বধুজন সঙ্কা আথি॥
নদিআ জোরা ভউ অথাহ। ভীম ভুজঙ্গ পথ চল লাহ॥

খণ্ডিতা নায়িকার চিত্রটিও অপূর্ব রসময়। অন্য নায়িকার সঙ্গে রাত্রি যাপন করে যখন কৃষ্ণ রাধিকার কাছে এসেছেন তখন কৃষ্ণের দেহে সম্ভোগচিহ্ন দেখে রাধিকা কৃষ্ণকে বলছেন,—

জাহি রমণী সঙ্গে রয়নি গমওলহ ততহি পলটি পুনু জাহে॥...
সগর গোকুল জিনি সে পুনমতি ধনি কি কহব তাহেরি ভাগে॥
পদযাবক রস জাহেরি হৃদয় অছ আও কি কহব অনুরাগে॥

আক্ষেপানুরাগের পদেও বিরহিণীর সুগভীর আর্তিই ফুটে উঠেছে। বিদ্যাপতি যে শুধু সুখের কবি নয়, তার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোক্ত পদটিতে। রাধিকা কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত খেদ করে বলছেন,—

জনম হোঅএ জদি জওঁ পুনু হোই। জুবতী ভএ জনমএ জনি কোই॥
হোইহ জুবতি জনি হো রসমন্তি। রসও বুঝএ জনি হো কুলমন্তি॥
ইধন মাগওঁ বিহি এক পএ তোহি। থিরতা দিহহ অবসানহু মোহি॥
মিলি সামি নাগর রসধারা। পরবস জনি হোঅ হমর পিয়ারা॥

প্রার্থনা পদেও কত আর্তি ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত পদটিতে। রাধিকা বহু মিনতি করে বলছেন,—

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়। দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়॥
গনইতে দোস গুনলেস না পাওবি জব তুহুঁ করবি বিচার॥
তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নহ মুঞি ছার॥...
ভুঅা পদপল্লব করি অবলম্বন তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল উদ্ধৃত পদগুলিতে। আক্ষেপ ও প্রার্থনার পদ সংখ্যায় বেশি না হলেও ঐগুলিতে তাঁর মনের আবেগ সম্পূর্ণই পরিস্ফুট। এই সমস্ত পদে অধ্যাত্ম চেতনাও দুর্লক্ষ্য নয়। পরবর্তীকালে মহাজনদের পদে বিদ্যাপতির যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। গোবিন্দদাস তো ভাবশিষ্যই ছিলেন বিদ্যাপতির। গোবিন্দদাস অসাধারণ প্রতিভাবান হলেও তাঁর কোনো কোনো পদে বিদ্যাপতির অনুসরণ রয়েছে যথেষ্টভাবে। উভয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য থাকবেই, কারণ গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর নিত্যলীলা ও জীবনদর্শনের অন্যতম ধারক ও বাহক। বিদ্যাপতির প্রার্থনায় রয়েছে মুক্তির কামনা, আর গোবিন্দদাস প্রার্থনা জানিয়েছেন নববিধা ভক্তির। বিদ্যাপতিকে নির্ভর করতে হয়েছে প্রাক্তন কবিগণের ঐতিহ্য, অলংকার নির্দেশ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর, কিন্তু চৈতন্যোত্তর যুগের মহাজনদের দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহই ছিলেন স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব। সুতরাং লীলা বর্ণনার সময় তাঁদের সামনে শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তিই উজ্জ্বল হয়ে উঠত। এইজন্য পদাবলী আস্বাদনের সময় প্রাক্ চৈতন্যযুগ ও চৈতন্যোত্তর যুগের ভাবদৃষ্টিগত পার্থক্য মনে রাখা প্রয়োজন।

অনন্তর বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা চণ্ডীদাসের কথায় আসা যাক। পূর্বেই বলা হয়েছে, চৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সঙ্গে চণ্ডীদাসেব পদাবলী আস্বাদন করতেন। এতে প্রাক্ চৈতন্যযুগীয় একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের কথা প্রমাণিত হচ্ছে। মহাপ্রভু-কৃত পদ আস্বাদনের পূর্বে স্বরূপ দামোদর প্রত্যেকটি বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন যে বিষয়টি দোষযুক্ত কিনা অথবা মহাপ্রভুর মনে ক্রোধ ও বিরক্তির সঞ্চার হতে পারে এমন কোনো বিষয়ের রসাপকর্ষ ঘটেছে কিনা। সুতরাং যে-চণ্ডীদাসের পদ চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন তিনি নিশ্চয়ই রাধাকৃষ্ণনিত্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। এখন সমস্যা হল, ইনি কোন্ চণ্ডীদাস? ইনি কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস, অথবা পদাবলী রচয়িতা দ্বিজ চণ্ডীদাস, অথবা এমন একজন চণ্ডীদাস যাঁর রচনা আমাদের এখনও হস্তগত হয়নি?

একথা নিশ্চিত, রসাভাসদুষ্ট গ্রন্থ চৈতন্যদেব আস্বাদন করতেন না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তো সে রসাভাস আছে। গ্রন্থের প্রথমে কৃষ্ণের

পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে ; কিন্তু হওয়া উচিত ছিল রাধিকার। এই গুরুতর ত্রুটি ছাড়া আর একটি রসাভাসের নিদর্শন পাওয়া যায় গ্রন্থের বংশীখণ্ডে। কৃষ্ণের যে বংশী অপহরণ করেছেন রাধা তা রত্নাদিখচিত ; কিন্তু মালাধর বসু, দৈবকীনন্দন সিংহ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি কবিবৃন্দ বংশীর বর্ণনা দিতে গিয়ে তার ঐশ্বর্যের কথা কখনও বলেন নি। শ্রীকৃষ্ণবিজয়-কার মালাধর বসু লিখেছেন,—

বৃন্দাবন মাঝে যবে বংশীনাদ পূরে।
অকালে ফুটয়ে ফুল সব তরুবরে॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাঁশির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,—

যাঁর বেণুধ্বনি শুনি স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
অশ্রু বহে পুলক কম্পধার।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বোঝা যায় যে রত্নাদিখচিত বংশীতে রাধিকার লোভ হওয়ায় তিনি সাধারণ তস্করের ন্যায় উহা চুরি করেছেন ; কিন্তু কৃষ্ণের বাঁশী তো মাধুর্যমহিমামণ্ডিত ; তাতে ঐশ্বর্যের কথাই ওঠে না। তৃতীয়ত, রাধাকে আয়ত্ত করার জন্য কৃষ্ণের বলপ্রয়োগ, গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে বিপুল রসাভাস ঘটেছে গ্রন্থটিতে। সুতরাং এইরূপ গ্রন্থের আস্বাদন চৈতন্যদেবের পক্ষে কি করে সম্ভব! তবে কোন্ চণ্ডী-দাসের পদ তিনি আস্বাদন করতেন? 'রাধা প্রেমামৃত' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন, ঐ গ্রন্থের কবিই চণ্ডীদাস। সনাতন গোস্বামী-রচিত ভাগবতের দশম স্কন্দের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় [শ্রীজয়দেবচণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি…] যে চণ্ডীদাসের নাম আছে, কারও কারও মত, ইনিই উক্ত রাধাপ্রেমামৃতের কবি ; কারণ সংস্কৃত টীকাকার সনাতন গোস্বামীর পক্ষে বাংলা গ্রন্থের উল্লেখ অস্বাভাবিক। অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় বলেন, সনাতন গোস্বামী-উল্লিখিত চণ্ডীদাস এবং সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ-উক্ত 'কবিপণ্ডিতমুখ্য শ্রীচণ্ডীদাস পাদ' একই ব্যক্তি। কিন্তু পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-কার বড়ু চণ্ডীদাসই উদ্দিষ্ট কবি। তাঁর উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত হল—'দ্বিজ চণ্ডীদাস-ভণিতার পদগুলি যাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, দ্বিজ চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাসেরই অভিনব

সংস্করণ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাস্নানে জাতির যেমন জন্মান্তর ঘটিয়াছে, বড়ুও তেমনি দ্বিজত্ব লাভ করিয়াছেন। সেই ছন্দ; সেই সুর, পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গির। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীরাধার একটি দিক দেখিয়াছেন। দ্বিজ চণ্ডীদাস শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় নূতন দৃষ্টিলাভে সেই মহাভাবময়ীর আর একটি দিক দেখিবার সৌভাগ্য-প্রাপ্ত হইয়াছেন।' [দ্রষ্টব্য, পদাবলী পরিচয়, পৃ ১১৪-১৫]। আমার মনে হয়, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঠিকই বলেছেন; কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষ দুটি বিষয় বংশী ও বিরহ অংশ যথার্থই রসোত্তীর্ণ হয়েছে। জয়দেব বা বিদ্যাপতির শৃঙ্গাররসাশ্রিত পদগুলির আস্বাদনে যদি মহাপ্রভু ভক্তিরসের সন্ধান পেয়ে থাকেন, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বংশী ও বিরহ অংশেও সে-ভক্তিরস দুর্লভ নয়। অন্য খণ্ড-গুলির বিষয় হয়ত তাঁকে শোনান হত না। বংশী খণ্ডে কয়েকটি আক্ষেপানুরাগের পদ চৈতন্যপরবর্তী যুগের যে-কোনো শ্রেষ্ঠ মহাজনের পদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—

কৃষ্ণ যমুনাতীরে বাঁশী বাজাচ্ছেন। সেই বংশীধ্বনি শুনে রাধিকা আকুল হয়ে বড়াইকে বলছেন,—

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মোঁ আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হঞা তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ, বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারাইলোঁ পরাণী॥...
'পাখি নহোঁ তার ঠাঞি উড়ি পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানি।
মোর মন পোড়ে জেহ্ন কুম্ভারের পনী॥

আন্তর সুখাএ মোর কাহ্নু অভিলাসে।

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

কৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে রাধিকার বস্তুজগৎ স্তব্ধ; সে জগতের কামনা-বাসনা আজ তাঁর শেষ হয়ে গেছে। তিনি সর্বত্র কৃষ্ণময় দেখছেন; সংসারের কাজ তাঁর কাছে এখন অলীক মনে হচ্ছে এবং সব বিষয়েই হচ্ছে বিভ্রান্তি। এই বিভ্রমের কথা তিনি বলছেন বড়ায়িকে,

সুসর বাঁশীর নাদ শুনিআঁ বডায়ি রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।

আম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ

সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পানী॥...

নান্দের নান্দন কাহ্নু আডবাঁশী বাএ যেন রএ পাঞ্জরের শুআ।

তা সুনিআঁ, ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ॥

সেইত বাঁশীর নাদ সুনিআঁ বডাযি, চিত্ত মোর ভৈল আকুল।

ছোলঙ্গে চিপিআঁ নিমঝোলে খেপিলোঁ

বিনি জলে চডাইলোঁ চাউল॥

কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেছেন, আবার বৃন্দাবনে ফিরে আসবেন কিনা সে বিষয়ে রাধিকার ঘোরতর সন্দেহ। অথচ এই কৃষ্ণের জন্যই রাধিকা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন,—

যে কাহ্নু লাগিআঁ সো আন না চাহিলোঁ না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।

হেন মনে পড়িহাসে আন্মা উপেখিআঁ রোষে

আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥

দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল

মোঞ নারী বড় অভাগিনী॥

বসন্তকাল সমুপস্থিত; কদমগাছের ডাল নুয়ে পড়েছে ফুলের ভারে; তথাপি কৃষ্ণের দেখা নেই। তাই আক্ষেপে রাধা বলছেন,—

মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষেব সিন্দুর।

বাহুর বলআ মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥

কাহ্নু বিনী সব খন পোড়এ পরাণী।

বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥

পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।

কোণ দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে॥

আহোনিশি কাহ্নাঞির গুণ সোঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ॥

বসন্ত ঋতুর শেষে এল গ্রীষ্ম। ধীরে ধীরে আকাশে শ্যামল মেঘ দেখা দিল; এল আষাঢ়। নবীন বর্ষার ধারার সঙ্গে রাধিকার নয়নধারাও হল এক,—

জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ। সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ॥…
আসাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ। মদন কদনে মোর নয়ন ঝুরএ॥
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাওঁ তথা।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথা॥

চণ্ডীদাস-ভণিতায় আরও কতকগুলি শ্রেষ্ঠ পদ আছে। এই পদগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকারের না অন্য কোনো চণ্ডীদাসের তা এখনও নির্ণীত হয়নি; তবে পদগুলিতে রয়েছে সুগভীর ব্যাকুলতা। কৃষ্ণের বাঁশীর যে কি মোহিনী শক্তি তা প্রকাশ পেয়েছে নিম্নোক্ত পদটিতে রাধিকার আক্ষেপ-উক্তির মধ্যে—

বিষম বাঁশীর কথা কহিল না হয়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে।
পিয়াসে হরিণী যেন পড়এ সঙ্কটে॥
সতী ভোলে নিজ পতি মুনি ভোলে মন।
শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥
কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা।
কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥

রাধিকা কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বলা; কিন্তু কৃষ্ণদরশন তাঁর কাছে একান্তই দুর্লভ। ঘর-দ্বার, গৃহপরিজন সবই তাঁর অন্তরায়স্বরূপ। পরাধীন হয়ে যে জীবিত থাকে, তার মতো দুঃখী আর কেউ নয়। রাধিকা নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলছেন,—

ধিক রহু জীবনে যে পরাধীনী জীয়ে।
তাহার অধিক ধিক পরবশ হয়ে॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোর গরল হইল॥

অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল ভরিয়া কেনে উঠিল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈলাম কোলে।
এ দেহ-অনল-তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি বসি যাই তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতাপাতা সনে॥
যমুনার জলে যাঞা যদি দিই ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ।
অতএ এ-ছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥
চণ্ডীদাস কহে দৈবগতি নাহি জান।
দারুণ পিরিতি সেই বধয়ে পরাণ॥

অথবা—

সুধার সমুদ্র সমুখে দেখিয়া খাইলুঁ আপন সুখে।
কে জানে খাইলে গরল হইবে পাইব এতেক দুখে॥
মো যদি জানিতাঙ অলপ ইঙ্গিতে তবে কি এমন করি।
জাতি কুলশীল মজিল সকল ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥

পিরিতি-ফাঁদে যে একবার পড়েছে তার থেকে সে-জনার আর নিস্তার নেই। প্রাণবিসর্জনসংকল্পেও এই পিরিতিই অন্তরায়। রাধিকা ভাবতেই পারেন না পিরিতির এই সম্মোহন-মন্ত্র কোথায় লুকানো ছিল,—

পিরিতি পিরিতি কি রীতি মুরতি হৃদয়ে লাগল সে।
পরাণ ছাড়িলে পিরিতি না ছাড়ে পিরিতি গঢ়ল কে॥
পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর না জানি আছিল কোথা।
পিরিতি-কণ্টক হিয়ায় ফুটিল পরাণ-পুতলী যথা॥

প্রাক্-চৈতন্যযুগে বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে অপর দুজন কবি—মাধবেন্দ্র পুরী ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়কার মালাধর বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যপূর্ব-যুগে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই তিনজন কবির অস্তিত্বে সাধারণে বিশ্বাসী ছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী সংস্কৃতেই লিখতেন। তাঁর পাঁচটি শ্লোক উদ্‌ধৃত হয়েছে শ্রীরূপগোস্বামীর পদ্যাবলীতে। চৈতন্যদেব শ্রদ্ধানম্রচিত্তে তাঁর শ্লোক আবৃত্তি করতেন। কিন্তু 'পদামৃত মাধুরী'তে একটি বাংলা

পদ পাওয়া যায় মাধবেন্দ্রপুরীর ভণিতায়। এতে বোঝা যায়, তিনি বাংলাতেও পদ লিখতেন ; আর তিনি যে বাঙালী ছিলেন তা অনুমিত হয় একটি কারণে। তিনি তাঁর গৃহদেবতার সেবার ভার দিয়েছিলেন দুইজন বাঙালীর উপর। পদটির সম্বন্ধে অধ্যাপক বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় বলেছেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্কলনগুলিতে এই পদটি নাই বটে, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহারাজ ইহা কীর্তন করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার ছাত্র বনমালী দাস বাবাজী উহা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পদরত্নমালা পুথিতে সঙ্কলন করেন। ঐ পুথি নবদ্বীপের প্রাচীন কীর্তনীয়া শ্রীনিতাইপদ দাস বাবাজীর নিকট আছে।'

আলোচ্য পদটি একটু স্বতন্ত্র ধরণের ; ঠিক অভিসারের পদ না হলেও অনেকটা তারই সমতুল। রাধিকা কৃষ্ণদর্শনে সাজসজ্জা করেছেন, আর সখীগণও তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাদেরও আশা, রাধিকার সঙ্গে গেলে তাদেরও কৃষ্ণদর্শন হবে,—

সাজল ধনী চন্দ্রবদনী শ্যামদরশন আশে।
সঙ্গিনীগণ রঙ্গিনী সব ঘেরলি চারিপাশে॥
তরুণারুণ চরণযুগল মঞ্জীর তঁহি শোভে।
ভৃঙ্গাবলী পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জরে মধুলোভে॥
কুম্ভিকুম্ভ জিনি নিতম্ব কেশরী খীনি মাঝে।
পরি নীলাম্বর পট্টাম্বর কিঙ্কিনী তঁহি বাজে॥
বাহুযুগল থীর বিজুরি করিশাবক শুণ্ডে।
হেমাঙ্গদ মণি কঙ্কণ নখরে শশী খণ্ডে॥
হেমাচল কুচমণ্ডল কাঁচলি তঁহি শোভে।
চন্দ্রকান্ত ধ্বান্তদমন কর্ণে কণ্ঠে শোভে॥
জম্বুনদ হেমযুক্ত মুকুতাফল পাঁতি।
ফণিমণিযুত দামসহিত দামিনী সম ভাঁতি॥
বিম্বফল নিন্দি অধর দাড়িমবীজ দশনা।
বেশর তঁহি দলকে ঝলকে মন্দ মন্দ হসনা॥
মালা ঝিল ফুল চুল কবরী করবী ছান্দে।
মদন মোহন—মোহিনী ধনী লাঞ্জল তঁহি হাথে॥

নবযৌবনী চন্দ্রবদনী বৃন্দাবন মাঝে।
মাধবেন্দ্রপুরী রচিত গীত মিলল না নাগররাজে॥

এরপর মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়-অবলম্বনে আলোচনা করে প্রবন্ধটির উপসংহার করব। কবির উক্তি থেকে জানা যায়, গ্রন্থটির লেখা আরম্ভ হয় ১৪৭৩-৪ খৃষ্টাব্দে এবং শেষ হয় ১৪৮০-৮১ খৃষ্টাব্দে। চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উল্লেখ আছে। মালাধর বসুর বংশধর সত্যরাজ ও রামানন্দকে চৈতন্যদেব সংবর্ধিত করেছিলেন নীলাচলে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় মহাপ্রভুর নিকট যথেষ্ট সমাদর পেয়েছিল; এই কাব্য থেকে কোনো কোনো অংশ তিনি আবৃত্তিও করতেন।

মালাধর বসুকে গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দিন বারবকশাহ্ গুণরাজখান উপাধি দিয়েছিলেন কবির পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে। বর্ধমান জেলায় কুলীন গ্রামে কবির নিবাস ছিল। গ্রন্থ থেকে জানা যায় কবির পিতা ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী, পুত্র সত্যরাজ।

শ্রীমদ্ভাগবত-অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচিত। বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশেরও অনুসরণ কোথাও কোথাও দেখা যায়। বি াপতি, চণ্ডীদাসের পদের মতো গ্রন্থটিতে সর্বত্র রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আছে। হৃদয়ের সহজ ভক্তির প্রকাশ গ্রন্থটিতে প্রায় সর্বত্র। কাব্যকলানৈপুণ্যও দুর্লভ নয়; শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনায় কবিকৃতি লক্ষণীয়,—

পূর্ণিমার চান্দ জিনি বদনকমল।
খঞ্জকে জিনিয়া শোভে নয়নযুগল॥
হিরা মণি মাণিকেতে কর্ণের কুণ্ডল।
ময়ুরের পুচ্ছে শোভে কুটিল কুন্তল॥
নানা বর্ণের পুষ্পমালা হৃদয় উপরে।
সুবর্ণ অঙ্গুরী শোভে বলয়া দুই করে॥
নর্তকের বেশ ধরে মুকুট শোভে মাথে।
বালকের সঙ্গে খেলে দেব জগন্নাথে॥
পীতবস্ত্রপরিধান দেববনমালী।
নূতন মেঘেতে যেন খেলিছে বিজুরী॥
নীলমনি জিনি তার মুখ অনুপাম।
তার মাঝে শোভা করে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥

চিত্রগতি চলে যেন নাটুয়া খঞ্জন।
দেখিয়া যুবতিগণ স্থির নহে মন॥

শারদ পূর্ণিমায় কৃষ্ণের রাসে অভিলাস হল। তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে গোপীদের ডাক দিলেন বংশীধ্বনিতে,—

শরত পূর্নিমাশশী করিল উদয়ে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বয়ে॥
কোকিলীর কলরব ভ্রমর ঝঙ্কার।
কুসুমিত দশদিক বসন্ত অবতার॥
নব কিশলয় বৃক্ষ শোভে বৃন্দাবনে।
অধিক পীড়য়ে কাম চন্দ্রের কিরণে॥
কাম অবতার করি বংশীনাদ কৈল।
শুনিয়া গো'য়ালা নারী মূর্ছিত হইল॥
জানিল গোবিন্দ বেণু বায়ে বৃন্দাবনে।
চলি গেলা গোপনারী আপনার মনে॥

রাসরসে রাধিকার মনে অহংকারের উদয় হল। তিনি ভাবলেন, কৃষ্ণ শুধু তাঁরই অধীন। সবাইকে ছেড়ে কৃষ্ণ তাঁকে নিয়েই আছেন। রাধার অহংকার চূর্ণ করার জন্য কৃষ্ণ অদর্শন হলেন ; তখন রাধিকা সব বুঝতে পেরে হাহাকার করতে লাগলেন,—

হরি হরি প্রাণ মোর কেন নাহি যায়।
যথা গেলে গোবিন্দের দরশন পায়॥
কে হরিয়া নিল আজি মোর প্রাণনাথ।
কান্দিতে কান্দিতে বলি আইস জগন্নাথ॥
সহজে অবলা আমি বুদ্ধি যে পাতল।
কি বলিতে কি বলিল পাল্য তার ফল॥
এত বলি কান্দে গোপী অচেতন হইয়া।
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ মনেতে ভাবিয়া॥

শুধু রাধিকাই নয়, কৃষ্ণ-অদর্শনে অন্যান্য গোপীদেরও সেই একই আক্ষেপ। শেষে বিরহ সহ্য করতে না পেরে গোপীদের মধ্যে কেউ কৃষ্ণের মতো হয়ে ও তাঁর মতো বেশ ধরে কৃষ্ণলীলা অভিনয় করল,—

কোকিলের নাদে তারা বজ্রাঘাত মানি।
হেন বেলে হৈল তথা চাতকের ধ্বনি॥
চৌদিকে চাতকপাখী ডাকে পিউ পিউ।
তা শুনিয়া গোপীগণ নাহি ধরে জীউ॥
কৃষ্ণের বিরহে গোপী হইলা আবেশ।
কৃষ্ণলীলা রচে গোপী ধরি তার বেশ॥

রাধিকার মানমদ খণ্ডন করে কৃষ্ণ আবার তাঁর নিকট আবির্ভূত হলে রাধিকা বড় দুঃখে জানালেন যে কৃষ্ণ কৃপানিধি হয়েও রাধিকাকে ঘৃণায় দূরে ঠেলেছেন। রাধিকা জানেন যে একবারমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করলে কৃষ্ণ তার কাছে না এসে থাকতে পারেন না; কিন্তু রাধিকার বেলায় তো সে সত্য প্রকাশ পায়নি,—

কৃপানিধি হইয়া কৃপা না করিলে তুমি।
ঘৃণা করি পরিহর কি বলিব আমি॥
একবার যেই জন তোমাকে সোঙরে।
তারে না ছাড়হ তুমি বলয়ে সংসারে॥
কায়মনোবাক্যে আমি তোমাকে চিন্তিল।
তথাপি তোমার চিত্তে দয়া না জন্মিল॥

তোমা না দেখিয়া প্রাণ না পারি ধরিতে।
অঙ্গের ভূষণ করি ইছিয়াছি চিতে॥
অনুক্ষণ তোমা বিনে আন নাহি মনে।
জাগিতে ঘুমাতে তোমা দেখিয়ে স্বপনে॥

অক্রূর এসেছেন কংসের আদেশে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে। তাঁর উপর নির্দেশ রয়েছে কৃষ্ণকে নিয়ে যেতে ধনুর্ময় যজ্ঞে। রাজ-নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায় না; সুতরাং কৃষ্ণ বলরাম সহ নন্দরাজ ও গোপকুল মথুরাযাত্রায় নিরত। এদিকে রাধিকা সখীমুখে এ-সংবাদ শুনে নানা আশঙ্কায় বিলাপ করে বলছেন,—

আজি শূন্য হইল মোর গোকুল নগরী।
গোকুলের রত্ন কৃষ্ণ যায় মধুপুরী॥
আজি শূন্য হইল মোর রসের বৃন্দাবন।
শিশু সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন॥...

আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে॥
আর না দেখিব সখী সে চান্দবদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন॥
আর না যাইব সখী কল্পতরু মূলে।
আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে॥

কৃষ্ণ রথে করে চলেছেন মথুরায়। তিনি রাধিকাকে আশ্বাস দিয়েছেন শীঘ্রই ফিরে আসবেন বৃন্দাবনে, কিন্তু রাধিকার তা বিশ্বাস হয় না। মথুরার রমণীগণ কৃষ্ণকে একবার পেলে আর ছেড়ে দেবে না। তাই যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখা যায় রাধিকা একভাবে রথের দিকে চেয়ে আছেন, আর ভাবছেন,—

কেমনে ধরিব প্রাণ কানু না দেখিয়া।
রথে চড়ি যান কৃষ্ণ না চান ফিরিয়া॥
মথুরা যাইলে কৃষ্ণ না আসিবে হেথা।
নানা রূপে গুণেতে সুন্দরী আছে তথা॥
তাহা সনে ক্রীড়া যবে করিব মুরারি।
পাসরির আমা হেন সব বনচারী॥
যত দূর যায় অক্রূর কানাই লইয়া।
ততদূর চাহে গোপী একদৃষ্টি হইয়া॥

বাংলার পদাবলী সাহিত্যে যেমন গীতগোবিন্দের অনুসরণ হয়েছে, তেমনই চৈতন্যদেবের সম-সাময়িক এবং পরবর্তী যুগে কৃষ্ণায়ণ কাব্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থখানির। রঘু-পণ্ডিতের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, মাধবাচার্যের কৃষ্ণমঙ্গল, দৈবকীনন্দন সিংহের গোপাল বিজয় ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের প্রভাব যথেষ্ট। চিন্তার ঐক্য তো আছেই, আক্ষরিক সাদৃশ্যও দুর্লক্ষ্য নয়। মাধব আচার্যের কৃষ্ণমঙ্গল রচনার হেতুনির্দেশ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মতোই,—

অসার অপার ভবসিন্ধু তরিবারে।
পাঁচালি-প্রবন্ধে বলি কৃষ্ণ অবতারে॥
ভাগবত সংস্কৃত না বুঝে সর্বজনে।
লোক ভাষা রূপে কহি সেই পরমাণে॥

কৃষ্ণের মঙ্গল নাম মধুর সঙ্গীত।
নাচাড়ি শিকলি ছন্দে হইল বিদিত॥ (কৃষ্ণমঙ্গল, পৃ ৪)
ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥…
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর।
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর॥
গাহিতে গাহিতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৃ ৬)

গোপালবিজয় ও শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সাদৃশ্য আরও ঘনিষ্ঠতর,—

দেখিঞা সুন্দর শিশু দআ উপজিল।
কি করিব হেন মনে ভাবিতে লাগিল॥
ইহা হইতে মৃত্যু জবে না বইল আহ্মারে॥
কেহ্নে হেন অকারণে মারিব কুমারে॥
ইহা বুলি রাজা তবে কহে দূতজনে।
দৈবকী-অষ্টমগর্ভ আনিহ জতনে॥
ইহা বুলি বসুদেব ডাক দিঞা আনি।
বিনঅ পূর্বকে কিছু বইল প্রিয়বাণী॥
লঞা জাহ ঘর তুমি আপন কুমার।
ইহা হইতে ভয় কিছু নাহিক আহ্মার॥ (গোপালবিজয়, পৃ ২০-২১)
উপনীত পুত্র লৈয়া কংস বরাবরে।
সুন্দর দেখিয়া কংস দযা কৈল তারে॥
ইহা হইতে ভয় মোর না বইল বাণি।
দৈবকীর অষ্টম গর্ভ মোরে দিহ আনি॥
লৈয়া জাহ ঘরে তুমি আপন কুমার।
তাহা লৈয়া গেলা বসু আপন দুয়ার॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৃ ২৮)
নিরাহারে তপ বড় কইলে নিরন্তর।
দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর॥
তোহ্মার তপের ফলে এইরূপ ধরি।
আসিঞা ত দিল বর তোরে কৃপা করি॥

মুক্তি বর না মাগিলে আহ্মার মাআএ।
আহ্মা পুত্র লাগি বর মাগিলে লীলাএ ॥ (গোপালবিজয়, পৃ ৩৪)
দেবমানে দ্বাদশ সহস্র বৎসর।
নিরাহারে দুহেঁ তপ করিলে বিস্তর ॥
তোমার, তপের ফলে এই রূপ ধরি।
তবে ত সদয় হৈলাঙ আপনে শ্রীহরি ॥
বর মাগ বইলাঙ হইয়া সদএ।
না মাগিলে মুক্তিপদ আমার মায়াএ ॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৃ ৩১)

উভয় গ্রন্থের আক্ষরিক মিলও দুর্লক্ষ্য নয়,—

আমা লৈয়া যাহ তুমি নন্দঘোস ঘরে।
উপজিল মহামায়া জসোদা উদরে ॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৃ ৩৯)
আহ্মা লঞা ঝাট যাহ নন্দঘোষ-ঘরে।
জন্মিঞাছে মহামাআ জসোদা উদরে ॥ (গোপালবিজয়, পৃ ৩৫)
স্রীগালি রূপে দেবী আগে মোহামাএ।
ফণাছত্র ধরিয়া বাসুকী পাছু জাএ ॥ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়, পৃ ৩৯)
শিবারূপ ধরি আগে জাএন মহামাএ।
ফণাছত্র ধরিঞা বাসুকী পিছে ধাএ ॥ (গোপালবিজয়, পৃ ৩৫)

এরূপ সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত প্রচুর ; বাহুল্য ভয়ে এখানেই নিবৃত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ষোড়শ শতাব্দী বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যের সুবর্ণযুগ; কিন্তু তার প্রস্তুতি চলেছিল কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই। যাঁরা এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন সেই বাঙালী কবি মনীষীদের হৃদয় মন্থন করেই যুগাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অভ্যুদয় এবং তাঁরই করুণাপ্রেমরসে অমৃতায়মান শত শত বৈষ্ণব মহাজনের গীতাবলীতে আজও বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত।

(প্রবন্ধ-রচনায় সাহায্য গ্রহণ করেছি অধ্যাপক সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস, বিমানবিহারী মজুমদারের পাঁচশত বৎসরের পদাবলী এবং পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব পদাবলী। এঁদের প্রত্যেককে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই।)

সেকালের সমাজ-সমীক্ষণের ভূমিকা

পঞ্চানন মণ্ডল

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী জনসমাজকে লইয়া ভারতবর্ষের এই পূর্ব সীমান্তে ভারতীয় সভ্যতা একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিতেছিল। ভারতীয় সমাজ-বিধির বুনিয়াদের উপরেই স্থূলতর এই বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালী সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সমাজ মূলতঃ ছিল সমাজতন্ত্র ভিত্তিক; ইহার বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এইরূপ,—(১) 'লোকরঞ্জক' সমাজ রক্ষক রাজতান্ত্রিকতা এবং কৃষিপ্রধান স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজের প্রয়োজনীয় বিন্যাস; (২) সমাজগঠনের দিক্ হইতে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা, (আদৌ, গুণ ও কর্মগত, পরে) জন্মগত জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ্যানুশাসন এবং (৩) ভাবাদর্শের দিক হইতে 'ধর্ম' বোধ ও 'কর্ম'বাদ। এই ভারতীয় উত্তরাধিকারের সহিত জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব এবং আর্যেতর বাঙ্গালীর পূর্ব প্রচলিত নিজস্ব লৌকিক ধর্ম, বিশ্বাস- অবিশ্বাস ও আচার-বিচারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। পরবর্তীকালের ইসলামি ভাষা ও সংস্কৃতির এবং বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও বাঙ্গালী সমাজে পড়িয়াছে ওতপ্রোতভাবে। অতঃপর পাশ্চাত্য অধিকারে ঘটিয়াছে তাহার সর্বতোমুখী প্রত্যক্ষ পরিবর্তন।

১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশে শাহসুজার সুবেদারীর সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্নভাগে ইংরেজ-আগমনের সূত্রপাত হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে ইংরেজ অভ্যুদয়ের মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত এই আলোচ্য সময়। ইহার প্রথমদিকে মোগলের শাসন-শোষন, দেশের অভ্যন্তরে পাঠান-উপনিবেশ এবং মোগলদের সহিত তাহাদের খণ্ড বিরোধ ও ক্রমান্বয়ে পাঠান-মোগল শক্তির বঙ্গ-সমাজভুক্তি। আর শেষ,—ইংরেজ রাজত্বের ঋদ্ধিকাল অবধি, কিঞ্চিন্ন্যূন আড়াইশত বৎসর। এই সময়ের বাঙ্গালীসমাজের দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এখানে ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিতের একাধিপত্য এবং বিধি-নিষেধের বাহুল্য। এ দেশে তুর্কী আক্রমণের উপোদ্‌ঘাতেই সর্ব-

জন-মানসের জড়তা প্রকট হইয়া উঠে। তদবধি দীর্ঘ শতাব্দী সমূহের বিদেশী বিধর্মী অধিকারের আওতায় এ দেশের জনসাধারণ বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল; উপরন্তু প্রায় একটানা পাঁচশত বৎসরের সমষ্টিগত নিশ্চেষ্টতায় জাতির মেরুদণ্ড আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মানুষ নিজে অসমর্থ হইলে এবং আত্মবিশ্বাস হারাইলে তখন অদৃষ্ট, দৈব, দেবদেবী, তন্ত্রমন্ত্র, তুক্‌তাক্ ইত্যাদির আশ্রয় লইয়াই তাহারা বাঁচিতে চাহে; ইহকালে ব্যর্থ হইয়া পরকালের দিকে তখন লক্ষ্য নিবদ্ধ করিতে চাহে। সুতরাং বাঙ্গালী-সমাজের বিগত শতাব্দী সমূহের ইতিহাস হইল তাহার গতানুগতিক জীবনের ইতিহাস—কূর্মবৃত্তির ইতিহাস এবং এই ইতিহাস শুধু হিন্দু-সমাজের নহে, আবহাওয়ার গুণে এদেশের মুসলমান জনসাধারণেরও এই একই দশা ঘটিতেছিল।

ভারতবর্ষের বেদ-বেদান্তের অনুশীলন তখন বাঙ্গালীরা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছে; গীতা-ভাগবতের ভক্তিবাদ তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিতেছে না। তন্ত্রমন্ত্র যাহা শতাব্দী-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল তাহা এবং ভাষায় সৃষ্ট মন্ত্রে গোপনীয়তা আরোপ করিয়া জটিল বিশ্বাস অন্ধভাবে লোকে ব্যবহার করিতেছিল। বাঙ্গালা মন্ত্রের উৎপত্তিতে আমরা এই সূত্রের সন্ধান পাইতেছি। আর্যের এবং আর্যেতরগণের অতিবিস্তৃত পুরাণ ও উপ-পুরাণে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্রে নিহিত ধর্মবিশ্বাসে মিলিয়া তখনকার সমাজে এক কিম্ভূত অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। এই ধারায় রচিত মন্ত্রতন্ত্রাদির গ্রন্থ অজস্রধারে পাওয়া যাইতেছে।

ষোড়শ শতকে মহামনীষী রঘুনন্দন স্মৃত-বিস্মৃত অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ ও সংকলন করিলেন। আর্য-আর্যেতর ধর্ম ও লৌকিক নানা ধর্মের ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা-সংস্থাপক কালোপযোগী সংস্করণে রূপ লইয়া ছিল তাঁহার 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব'। নব্যন্যায়ের চর্চাতেও নবদ্বীপের তখন ভারতব্যাপী সুনাম। ইহার ধারাও প্রায় আটশত বৎসরের প্রাচীন। পক্ষান্তরে, বালক, জিকন, যোগ্লোক, জিতেন্দ্রিয় হইতে শুরু করিয়া ভবদেব ভট্ট, জীমূতবাহন, অনিরুদ্ধ ভট্ট, বল্লাল সেন হলায়ুধ ভট্ট, শূলপাণি, বৃহস্পতি, শ্রীনাথ, রঘুনন্দন, গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি বাঙ্গালী ধর্মশাস্ত্রকারগণের নাম হাজার বৎসর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং আধুনিক কালেও ভারতের সর্বত্রই এই শ্রেণীর বিভিন্ন

নিবন্ধকারের মতামতের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাঁহাদের ও পরবর্তী যুগের নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিতগণের অনুকরণে এদেশে ছোট বড় অসংখ্য স্মৃতিকার পণ্ডিতের ও তাঁহাদের বিহিত বিধি-বিধানের আর অভাব ঘটে নাই। বৈচিত্র্যপূর্ণ বাঙ্গালী-সমাজের স্থিতিস্থাপকতার জন্য একদা ইহার প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু বিধি বিধান যখন প্রাণহীন প্রথারূপে জন-মানসের বুদ্ধিভ্রংশতা ঘটাইতে থাকে তখন যে তাহা ইতিহাসের অভিশাপ, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, 'দিগবিজয় বিচারে' ন্যায়ের ফাঁকি খুঁজিতেও বাঙ্গালী যে পরিমাণ উদ্যম অপচয় করিয়াছে তাহার মূল্য ও জের কম নয়।

সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ন্যায় ও স্মৃতি, জ্যোতিষ, বৈদ্যক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সূত্রকথার নিদর্শন এদেশে এখনও খুঁজিলে রাশি রাশি পাওয়া যায়। 'যাত্রানির্ণয়' 'জ্যোতিষবিদ্যা' 'স্বরোদয়'-ভাষা 'কপাল চরিত্র' এই ধরণের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রচকদের রচনা, তখনকার সমাজের চাহিদা মিটাইয়াছে। 'কপাল চরিত্র' গ্রন্থে শাহ শুজার আদর্শ কপাল পোড়ার উল্লেখ আছে। এদিকে গুরুপুরোহিত, 'ব্যবস্থাপক' বা 'সভাকবি' ভট্টাচার্যের মাধ্যমে সমাজে 'ভাষ' -এর পর 'ভাষ' দিনের পর দিন গতানুগতিকতায় সঞ্চালিত করা হইয়াছে। 'পুষ্পমাল্য' ভ্রমে সেই সব প্রায়শই অর্থহীন বিধি-নিষেধের নাগপাশে পরিবেষ্টিত ও পিষ্ট জরাজীর্ণ সমাজ ভ্রষ্টবুদ্ধি ও নিঃসাড় হইয়া গিয়াছে। এখনও দেখা যাইবে, এদেশের নিভৃত প্রত্যন্ত পরিবেশে সেই ক্ষীয়মান পল্লীসমাজ এই পুরাতন ধারারই জের টানিয়া চলিয়াছে।

প্রসঙ্গত 'বল্লালসেন্যা' কৌলিন্য প্রথা ও মেল বন্ধনাদির আলোচনাও করিতে হয়। ইহার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উভয় দিকই দেখিবার আছে। এই সকল বন্ধন আড়ষ্ট উচ্চতর সমাজকে ধর্মান্তরগ্রহণের দুর্ঘটনা হইতে এক দিকে যেমন ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, পক্ষান্তরে, সমাজকে সেই দুর্ঘটনার দিকেই ঠেলিয়া দিবার কারণ হইয়াছে।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এদেশে চৈতন্য জাগিয়াছিল নিশ্চয়ই, তবে সে চৈতন্য কালক্রমে সাধারণ জনসমাজে 'দীনহীন দাস'-সুলভ মনোবৃত্তিই গড়িয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য তিনি 'আশু' বর্গের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও ধর্মচেতনার সঞ্চার করিয়া ভগবানকে আপন জন ভাবিয়া একাধারে পঞ্চরসের উপাসনা করিতে শিখাইয়াছিলেন; রাগানুগা ভক্তিতে

ভগবানকে এতকাছে আনার কথা প্রাক্-চৈতন্য ঐতিহ্যে ঠিক এইভাবে ছিল না। ঈশ্বরের প্রতি এই উদ্দাম প্রেমভক্তি—এই জীবনদর্শন সম্পূর্ণরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দান এবং এই প্রেমধর্মপ্রচারেই বাঙ্গালীর আন্তঃ প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু দাসসুলভ মূঢ়জন-মানসে এই ধর্মবোধে বিষক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। ঐহিকের প্রতি ঔদাসিন্য ও ভবসিন্ধুতারণ 'গুরু গোঁসাই'-এ আত্যন্তিক নির্ভরতা হেতু 'সুনীচ' ও 'সহিষ্ণু' জনসমাজ নিরুদ্যম ও যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইয়া দুর্দশার শেষ ধাপে নামিয়া গিয়াছিল। তাই পরবর্তীকালে আমরা দেখি 'মুনি' সাহেব যখন কাঠগোলার হিসাব রাখিতে তৎপর, 'চাঁপ' সাহেব যখন 'গড়া' কাপড়ের ফলাও ব্যবসায়ে ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন, তখন গোঁসাইদাসবাবাজী শ্রীঅঙ্গে কৌপীন ধারণ করিয়া 'গুরু জা করেন' ভরসায় ইষ্ট মন্ত্রের অনুধ্যানেই বিভোর হইয়া দিন গুজরাইতেছেন। আবার সম্ভ্রান্ত 'গৃহস্থ' মোহন্ত মহারাজেরা স্থানে স্থানে বিশেষ বিশেষ দেব-বিগ্রহের সেবাধিকার পাইয়া একদিকে যেমন 'প্রাণহীন আড়ম্বরের' ও 'মেদ-মেদুর বিলাস-ব্যসনের অনুকারী' হইলেন, অপর পক্ষে আউল-বাউল-বৈরাগী ইত্যাদি ব্রাত্যপ্রধান সমাজ মানুষের একটি সম-আসরের অধিকার লাভ করিয়া ধর্মে সহজ অনুষ্ঠানের পথে মুক্তির আশ্বাস পাইয়া বিচিত্র ভাবানন্দে বিভোর হইয়া পারের প্রতীক্ষায় 'দশা' প্রাপ্ত হইতেছিলেন। ফলে, একদিকে যে তাঁহারা 'চরম' দশা প্রাপ্ত হওয়ার দিকেও আগাইয়া যাইতেছিলেন এবং ঘরে ঘরে 'নাম' বিলাইয়া গোটা দেশটাকেও 'ওপারের' পথে আগাইয়া দিতেছিলেন তাহা হইতে রক্ষার উপায় কেহ তাঁহাদের বাৎলাইয়া দেয় নাই।

আদিকাল হইতে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত দেখা যায়,—দেশ-বিদেশে ভারত এই বাণীই বহন করিয়া ফিরিতেছে—'হরি, পার কর আমারে'। এই এপার-ওপারের চৈতন্যের সমীকরণ ষোড়শ শতকে কাহারও ভাবনায় জাগে নাই। চারিশত বৎসর পরে আজ আণবিক যুগের মার হইতে প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত যে আপদ্ধর্মের অনুসন্ধান করা হইতেছে তাহাতে এই একচক্ষু অধ্যাত্মবোধ কতখানি সহায় হইতে পারে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

মহাপ্রভুর বাণী ও সংগঠনের আধিভৌতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আর

একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতেও প্রণিধান করিতে হয়। সেদিনকার ভাবাদর্শে চৈতন্যদেব হরিভক্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল অভিন্ন,—ঘোষণা করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা অংশত শিথিল করিয়াছিলেন এবং এই সুযোগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে স্থান লাভ করিয়া ধর্মান্তরগ্রহণ হইতে সমাজচ্যুত বহু নরনারী রক্ষা পাইয়াছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ও অবশেষে তাঁহার ভাবধারা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে নাই।

অবশ্য এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না যে, মহাপ্রভু স্বয়ং সামাজিক জাতিভেদের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই, তাঁহার ভক্তদিগকেও লঙ্ঘন করিতে উৎসাহ দেন নাই। মহাপ্রভুর পরিষদ এবং অন্যান্য ভক্ত বা তাঁহাদের বংশধরদের কাহারও বিবাহাদিতে বর্ণাশ্রমচ্যুতির প্রমাণ নাই। বৃন্দাবন দাসের উক্তিতে দেখি,—'বিপ্র-পাদোদকের' দৈব 'মহিমার' উপর অবিচলিত বিশ্বাস অথবা 'কুম্ভীপাকের' 'জ্বালায়' পাষণ্ডীকে পোড়াইবার প্রবণতা এবং 'সকল ভুবন' 'নির্ষবন' করিবার বাসনা মহাপ্রভুরও জাগিয়াছিল। 'শিরে' 'লাথি' মারিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর বৌদ্ধ-দলন প্রসঙ্গও সুবিদিত। এই সকল বর্ণনা অলৌকিক লীলার হইলেও একেবারে অর্থহীন নহে।

উচ্চবর্ণের কঠোরতা, ইসলামের প্রলোভন ও অন্য নানা কারণে যখন সমাজের হিসাব ছাড়া নিম্নশ্রেণীর জনসমূহ ধর্মান্তরগ্রহণ করিতেছিল, তখন তাহাদের প্রতি মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সহানুভূতির ও কর্মোদ্যমের কোন নিদর্শন মিলে নাই; পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরাও তখন 'আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন' এবং প্রতিক্রিয়ায় দেখা যায়, হিন্দু-সমাজ প্রাক্তন 'কর্মের' দোহাই দিয়া দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াই সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট; 'আপনে যে মৈল' তাহাকে উদ্ধারের প্রয়োজনই দেখা দেয় নাই। এবং বলা বাহুল্য, এইরূপ 'উদ্ধার' না-পাওয়া 'বৈষ্ণবনিন্দক' 'দুরাচারের' অপ্রতুলতা এদেশে কোনও কালেই ছিল না। উপরন্তু আমরা দেখি, চাতুর্বর্ণের স্থলে জন্মগত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সে সময়ের ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বিদ্যমান ছিল এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশে ধর্মান্তরগ্রহণের অনুপাত সর্বাপেক্ষা বেশী।

শ্রীচৈতন্যের যে অন্তরঙ্গ ভক্তিরসসাধনা তাহা কখনই অধিকারী-নির্বিচারে আচরণের জন্য নহে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই সেই গূঢ় সাধনা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ায় দেশে বলহীনতা আসিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মোগল-শাসনেও বাঙ্গালা দেশে অবনতি ঘটিতেছিল দ্রুততালে,—বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে। বাঙ্গালার ধনসম্পৎ চলিয়া যাইতেছিল বাঙ্গালা দেশের বাহিরে, ফলে সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিবিশেষের কপাল খুলিলেও সাধারণ বাঙ্গালী-সমাজের দেহে মনে তখন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল দারিদ্র্যের ছাপ। আলোর নীচে অন্ধকারের মতো ঐশ্বর্যের পাশেই দেখা যায় 'অকিঞ্চনতা'। অহিংস ও বিমিশ্র বৈষ্ণব-ধর্মের প্রসার, ব্রাহ্মণ্যধর্মের শিথিলতা এবং অক্ষমের অদৃষ্টবাদ ইহার জন্য অংশত দায়ী ঠিকই, কিন্তু বিশেষ কারণ, মোগল সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় দেশের ক্ষাত্রশক্তির নির্ভরপ্রসুপ্তি, রাজস্বাদির খাতে মোগলের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ও তাহারই ফলে অপ্রতিরোধ্য অন্তঃসারশূন্যতা। ইংরেজ বণিক পর্বেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং আর্থিক নিষ্কাশন ও চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা বাঙ্গালা দেশকে যে বিপর্যস্ত পরিস্থিতির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল তাহার বিষময় ফল সমাজ এখনও ভোগ করিতেছে।

শক্তি-সাধনার লক্ষ্য

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

শক্তি-সাধনার ধারা সুপ্রাচীন। তার প্রতি তির্যক কটাক্ষের তীব্রতাও অপ্রাচীন নয়। কটাক্ষ উপায়কে কেন্দ্র করে। স্থূল জৈব প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে উপেয়ের দিকে সাধকের যাত্রা। বীর সাধক অতি স্থূল সম্ভোগকেও পাথেয়স্বরূপ গ্রহণ করেন; মারণ উচাটনাদি ষট্‌কর্মও তাঁকে উপায়রূপে অবলম্বন করতে হয়। রসাস্বাদনের পক্ষে শক্তি-সাধকের নিকট এগুলি নাট্যশাস্ত্রোক্ত ব্যভিচারী ভাবের সামিল, কিন্তু বহিরঙ্গ সামাজিকগণের নিকট এগুলি রূঢ়ার্থে ব্যভিচারী।

উপায়কে অপায় মনে করার ফলে শাস্ত্রে ও সাহিত্যে শক্তি-সাধকের চিত্র কোথাও অতি ক্রুর নিষ্ঠুর ঘাতকের প্রতীক, কোথাও বা বিদূষক-বৃত্তিসম্ভব কৌতুকহাস্যের পরিপোষক। 'শঙ্কর-দিগ্বিজয়ে' বা ভবভূতির 'মালতী-মাধব' নাটকের ক্রকচ এবং অঘোরঘণ্ট ভীষণতার মূর্তপ্রতীক., 'কর্পূর মঞ্জরী' নাটকের ভৈরবাচার্য কিংবা 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের কাপালিক অতি স্থূল হাস্যরসের উৎস। সাহিত্যে ভয়ানক বা বীভৎস রস প্রকটনে শক্তি-সাধনার পটভূমি পরিগৃহীত।

এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে সমাজ কোন্ দৃষ্টিকোন থেকে শক্তি-সাধনাকে দেখেছে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তন্ত্রাচার যে ভারতীয় ধর্মাচারণে অমেয় প্রভাব বিস্তার করেছে, তারও অসংখ্য দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হতে পারে। যোগশাস্ত্রে, বৈষ্ণবধর্মে, বৌদ্ধধর্মে ও সুফী মতবাদে তন্ত্রতত্ত্বের ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের অধিকাংশ দীক্ষা ও দেবার্চনপদ্ধতি তন্ত্রানুসারী। শক্তি-সাধনার এই দিগ্বিজয়ের কারণ, এর দার্শনিক ভিত্তি ও সাধনপদ্ধতি চিরন্তন ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র নয়, বরং তার সঙ্গে দৃঢ় সংবদ্ধ। উপরন্তু শাক্ত দর্শন একান্তভাবে বিজ্ঞান-সম্মত। আধুনিক বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক যুক্তিবুদ্ধি বলে অশ্রুত শব্দ ও অদৃশ্য আলো আবিষ্কার করে যে বিস্ময়-চমকের সৃষ্টি করেছে, এদেশের শাক্ত সাধক সাধনবলে সেই নাদ ও জ্যোতির স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন।

অবিস্মরণীয় কালে। আধুনিক বিজ্ঞান ইলেকট্রনিক নৃত্যে অপরিমেয় শক্তি-চাঞ্চল্য আবিষ্কার করে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন, শক্তি-সাধক এই ভৈরবী নৃত্যের অন্তরালে কেন্দ্রন-শক্তির দিব্য মূর্তি প্রত্যক্ষ করে মুদিত হয়েছিলেন। সে শক্তি-মূর্তি নটিনীর মত নৃত্যচঞ্চলা নয়, ভৈরবীর মত ভীষণা নয়—সে মূর্তি ধীর, স্থির, শান্ত, সর্বতোভদ্র।

এই শান্ত শক্তি-কেন্দ্রকে আবিষ্কার করে জীবনে তার কর্ষণ ও প্রয়োগ করাই শক্তি-সাধনার মূল লক্ষ্য। যেমন বিজ্ঞান, তেমনি তন্ত্র—এই তত্ত্বটিকে স্বীকার করছে যে, এক মূল শক্তি থেকে সমগ্র সৃষ্টির উৎসার। সাংখ্য দর্শনে এই শক্তিকে বলা হয়েছে 'প্রকৃতি'; তিনিই সৃষ্টিরাজ্যের 'প্রধান' অর্থাৎ মূল প্রসূতি। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি অন্ধ জড়শক্তি। অথচ সৃষ্টিরাজ্যে জড় ও চেতন দুই প্রকার সৃষ্টিই আছে। তাহলে জড়শক্তি থেকে চৈতন্যশক্তির উদ্ভব কি করে সম্ভব? সাংখ্যতত্ত্বে তাই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের পরে আর একটি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে। তিনি 'পুরুষ'। তিনি চিদ্‌ঘন কিন্তু অকর্তা। তিনি আছেন বলেই প্রকৃতির ক্রিয়া আর প্রকৃতি-সন্ততিতে চিদাভাস। তন্ত্রমতে শক্তি চিন্ময়ী এবং সর্বেশ্বরী। ব্যাকৃত সৃষ্টি এই শক্তির লীলা, অব্যাকৃত অবস্থাতেও তিনিই ওতপ্রোত। তিনিই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, তিনিই আবার প্রলয়ান্তিক বিশ্রান্তি।

স্থূল সৃষ্টির দিক থেকে শুরু করলে দেখা যায়, পৃথ্বীতত্ত্বকে আবৃত করে আছে জলতত্ত্ব, জলতত্ত্বকে আবৃত করে আছে তেজ, তেজকে আবৃত করে আছে বায়ু, বায়ুকে আবৃত করে আছে আকাশ। আকাশতত্ত্বের ওপরে সাধারণ জ্ঞানসীমা উঠতে পারে না। এই জ্ঞানসীমায় প্রকৃতির বিরাটরূপে আমরা অভিভূত হই। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে জগৎটা প্রকৃতির খেলা, প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। কিন্তু জগতের ওপর এই মহাজাগতিক শক্তির কতটুকু আমরা ধরতে পারি? বিজ্ঞান মহাজাগতিক শক্তির দিগদর্শন করে স্তম্ভিত। অদৃশ্য আলোর একাংশ ধরে বিজ্ঞান ওলটপালট কাণ্ড করছে।

শাক্ততন্ত্রের কাছে শক্তির এই অদৃশ্য রূপ কিন্তু অজানা নয়। তাঁরা শক্তির এই রূপগুলোকে শুধু বহির্বিশ্বেই দেখেন নি, [illegible] দেহভাণ্ডেও। মহাজাগতিক জ্যোতি ও নাদ মানব দেহেই [illegible]। জ্যোতি ও নাদরূপা এই শক্তির ক্ষমতা যে কি প্রচণ্ড, তারও [illegible]

তাঁরা দিয়েছেন। এই শক্তিকে আয়ত্ত করে যে স্তম্ভন-উচ্চাটন-মারণ ক্রিয়া করা সম্ভব তাঁরা তা প্রত্যক্ষ করেছেন। অসুরনিধন যজ্ঞে' এই মহারৌদ্রী শক্তির মহারাবে শ্রীশ্রীচণ্ডী মুখর।

কিন্তু শাক্ত সাধকের লক্ষ্য জীবনের বিঘ্নস্বরূপ আসুরভাবকে নির্জিত করে নিঃসীম শান্তির মহানন্দে নিমগ্ন হওয়া। শক্তি যে সৌম্যা 'সৌম্যেতরাশেষা সৌম্যভ্যস্ত্বতিসুন্দরী'; তিনি সর্বকল্যাণকরী আনন্দময়ী। শক্তি-সাধকের লক্ষ্য পরমা শান্তির সাগরে এই আনন্দ-স্নান।

. মানবদেহে এই আনন্দ-স্রোতের গতিকে আবিষ্কার করা এবং সেই স্রোতে স্রোতাপন্ন হওয়াই শক্তি-সাধনা। মূলাধার থেকে সহস্রার পর্যন্ত সুষুম্নামার্গে এই শক্তি-স্রোত প্রবাহিত। সুসূক্ষ্ম নাদ ও জ্যোতিরূপে এই স্রোতের অবিরাম গতি। স্থূল শব্দমন্ত্র অবলম্বনে সাধক সাধন-সোপানে অবতরণ করেন। এই শব্দমন্ত্রই মনঃসংযোগের ফলে নাদকে চিনিয়ে দেয়, শক্তির গতিপথকে ধরিয়ে দেয়। ভক্তি সহকারে মন্ত্রজপ এই ক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে। সাফল্যও আসে সহজে।

কিন্তু আমরা এখানে যত সহজে সাধনার সিদ্ধির কথা বলছি, সিদ্ধি তত সহজপ্রাপ্য নয়। জগতে কোন ঈপ্সিত বস্তুই সহজপ্রাপ্য নয়। তার কারণ, যে দেহ নিয়ে সাধনা, তার ভেতরেই বহু গলদ। তার ওপর .রয়েছে এগারো ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য ও অহংকারের খেলা। দেহের মধ্যে আসল শক্তির স্রোতঃপথকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে অনেক 'খাল বিখাল'। এই খাল-বিখাল সম্পর্কে আমরা একেবারেই সচেতন নই। দেহের অন্তঃপুরে কোথায় যে কোন্ প্রতিকূল সংস্কার বাসা বেধে আছে, আমরা তা বুঝতেই পারি না। মনঃসংযোগ করতে গেলেই দেখা যায়, মন লক্ষ্যবস্তুকে ছেড়ে কত অপথে বিপথে ধাওয়া করছে, রাজ্যের আজে-বাজে চিন্তা কোন্ পথে নেমে এসে অন্য পথে টানাটানি করছে। প্রাণায়াম, দৃষ্টিসংযোগ করেও মন বিক্ষুব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এইগুলিই সাধন-বিঘ্ন। সাধককে বহু কষ্টে এই বিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়। অহংকার-সন্তানগুলিকে জয় করাই প্রধান কথা। আর যত বিনষ্টির মূল এই অহংকার-সন্ততি। মানুষকে অভিমানে স্ফীত করে তুলছে অহংকারের সন্তান-সন্ততি; দম্ভ-দর্প-পারুষ্য, কামাদি রিপু 'ওরাই' শক্তি

সাধক সযত্নে এদের জয় করে থাকেন। আর এদের জয় করাই মনুষ্যত্বের সাধন।

শক্তি-সাধনা মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় ব্রতী করে এবং এই সাধনার সিদ্ধি সাধককে পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। শক্তির যেটি পরম স্তর তন্ত্রে তাকে বলা হয়েছে শিব-স্তর। পারিভাষিক জটিলতা বর্জন করে যদি শিবত্বের সাধারণ সংজ্ঞাই গ্রহণ করা যায়, তাহলেও দেখা যাবে, দেবসঙ্ঘে শিব হচ্ছেন এমন দেবতা, যিনি সদানন্দ যোগীশ্বর। শিব আশুতোষ, আপনভোলা, দেবাসুরে সমদৃষ্টি। তিনি নিঘৃণ—শ্মশানচারী—প্রেতাপিশাচ নিয়ে তাঁর চলাফেরা। তিনি সর্বসিদ্ধির অধীশ্বর হয়েও রিক্ত, অনন্ত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হয়েও ভিখারী, প্রলয়ঙ্কর শক্তির আধার হয়েও শান্ত। যোগ ও ভোগ, ধর্ম ও অধর্ম, ঐশ্বর্য ও অনৈশ্বর্য—সকল বৈপরীত্যের সুসমন্বিত মূর্তি মহেশ্বর—শিব—পূর্ণতার একাদর্শ। পুরুষের মধ্যে তিনিই আদর্শ পুরুষ।

মানুষ-পুরুষ এই মহান পুরুষেরই একটি কঞ্চুকিত রূপ। তার জীবনের লক্ষ্য এই কুঞ্চকাবরণমুক্ত হয়ে স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হওয়া। মনুষ্যত্বের সাধনা মানেই শিবত্বের সাধনা। শক্তি-সাধনার এই উদ্দেশ্যকে ভুল বোঝার ফলেই যত বিড়ম্বনা। লক্ষ্যকে না বুঝে আমরা লক্ষ কথা বলি, ফলে লক্ষ্য হয় দুর্লক্ষ্য। যখন লক্ষ্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবগত হই, তখন লক্ষ্যভেদের জন্যই আগ্রহ জন্মে। তখন শক্তি-সাধনাকে আর ব্যভিচারী বলে মনে হয় না, মনে হয় এ সাধনা পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক।

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলার শাসনযন্ত্র ও সৈন্যবাহিনী

সুখময় মুখোপাধ্যায়

১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী বাংলায় প্রথম মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মুসলিম রাজ্যটির নাম হয় 'লখনৌতি'। রাজ্যটি অনেকগুলি 'ইক্তা' অর্থাৎ প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। বলবনের বংশধরেরা যখন এদেশের অধিপতি হন (ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদ), তখন তাঁরা 'লখনৌতি' রাজ্যের নাম দেন 'ইক্লিম্ লখনৌতি' এবং একে অনেকগুলি 'ইক্তা'য় বিভক্ত করেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের যে অংশ তাঁদের রাজ্যভুক্ত ছিল, তার নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'অর্সহ্ বঙ্গালহ্'। এর পর যখন মুহম্মদ তুঘলক বাংলাদেশ জয় করলেন (১৩২৪ খ্রীঃ), তখন তিনি তাকে লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও—এই তিনটি 'ইক্তা'য় বিভক্ত করলেন।

স্বাধীন সুলতানদের আমলে (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) এই ব্যবস্থার খানিকটা পরিবর্তন সংঘটিত হল। তাঁদের আমলে সমগ্র বাংলাদেশ 'লখনৌতি' নামে পরিচিত না হয়ে 'বঙ্গালহ্' নামে পরিচিত হতে লাগল, রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগগুলি 'ইক্তা'র বদলে 'ইক্লিম্' নামে অভিহিত হতে লাগল, 'ইক্লিম্'-এর উপবিভাগগুলি 'অর্সহ্' নামে অভিহিত হল। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে রাজ্যের উপবিভাগগুলিকে 'মুলুক' বলা হয়েছে। বোধহয় 'অর্সহ্' ও 'মুলুক' একার্থক ; কিংবা এমন হতে পারে, 'অর্সহ্'-রও উপবিভাগ ছিল এবং তার নাম ছিল 'মুলুক' (মুল্ক্)। কোন কোন প্রাচীন বাংলা গ্রন্থে আবার মুলুকেরও একটি উপবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়—তার নাম 'তকসিম'।

এই আমলে দুর্গহীন শহরকে বলা হত 'কস্বাহ্' এবং দুর্গযুক্ত শহরকে বলা হত 'খিট্টাহ্'। সীমান্ত রক্ষার ঘাঁটিকে বলা হত 'থানা'। 'বঙ্গালহ্' রাজ্য অনেকগুলি রাজস্ব-অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, এই অঞ্চলগুলি 'মহল' নামে পরিচিত ছিল, কয়েকটি 'মহল'

নিয়ে এক একটি 'শিক' গঠিত হত; 'শিকদার' নামক কর্মচারীরা এদের ভারপ্রাপ্ত হতেন।

রাজস্ব দু' ধরণের হত, 'গণীমাহ্‌' অর্থাৎ লুণ্ঠনলব্ধ অর্থ এবং খরজ অর্থাৎ খাজনা। সাধারণত যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে লুঠ করে যে অর্থ সংগ্রহ করা হত, তার পাঁচভাগের চারভাগ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বণ্টিত হত এবং বাকী এক ভাগ 'গণীমাহ্‌'-রূপে রাজকোষে জমা হত। 'খরজ' এক বিচিত্র পদ্ধতিতে সংগৃহীত হত। সুলতান বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে 'মোকতা' অর্থাৎ ঐ অঞ্চলের 'খরজ' সংগ্রহের ভার দিতেন—যেমন হোসেন শাহ হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারকে সপ্তগ্রাম মুলুকের 'খরজ' সংগ্রহের ভার দিয়েছিলেন। সপ্তগ্রাম মুলুক থেকে বিশ লক্ষ টাকা খাজনা সংগৃহীত হত। হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদার তার থেকে হোসেন শাহকে বার লক্ষ টাকা দিতেন এবং বাকী আট লক্ষ টাকা নিজেদের আইনসঙ্গত প্রাপ্য হিসাবে গ্রহণ করতেন। সুলতানের প্রাপ্য টাকা নিয়ে যাবার জন্য রাজধানী থেকে যে সব কর্মচারী আসত, তাদের 'আরিন্দা' বলা হত। সুলতানের রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল 'সর্‌-ই-গুমাশ্‌তাহ'। জলপথে যে সব জিনিস আসত, সুলতানের কর্মচারীরা তাদের উপর শুল্ক আদায় করতেন, যে সব ঘাটে এই শুল্ক আদায় করা হত, তাদের বলা হত 'কুতঘাট'। বিভিন্ন শহরে ও নদীর ঘাটে সুলতানের বহু কর্মচারী রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত ছিল। সে যুগে 'হাটকর', 'ঘাটকর', 'পথকর' প্রভৃতি করও ছিল বলে মনে হয়। তখন কোন কোন জিনিস অবাধে বাইরে থেকে বাংলায় নিয়ে আসা কিংবা বাংলা থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া যেত না, যেমন চন্দন। আলোচ্য যুগে বাংলায় অমুসলমানদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হত বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

রাজ্যের শাসনব্যবস্থায়—বলা বাহুল্য, সুলতানের স্থান ছিল সব চেয়ে উঁচুতে। সুলতান ছিলেন স্বাধীন ও সর্বশক্তিমান। তিনি যে প্রাসাদে বাস করতেন, তার আয়তন ছিল বিরাট, সেখানে প্রশস্ত দরবার-ঘরে তাঁর সভা বসত। শীতকালে কখনও কখনও উন্মুক্ত অঙ্গনে সুলতানের সভা বসত। সভায় সুলতানের পাত্র-মিত্র-সভাসদেরা উপস্থিত থাকতেন।

সুলতানের প্রাসাদে 'হাজিব', 'সিলাহ্‌দার', 'শরাবদার', 'জমাদার' ও 'দরবান' প্রভৃতি কর্মচারীরা থাকতেন। 'হাজিব'রা সভায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; 'সিলাহ্‌দার'রা সুলতানের বর্ম বহন করতেন; 'শরাবদার'রা সুলতানের সুরাপানের ব্যবস্থা করতেন; 'জমাদার'রা ছিলেন তাঁর পোষাকের তত্ত্বাবধায়ক এবং 'দরবান'রা প্রাসাদের ফটকে পাহারা দিত। এ ছাড়া সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে 'ছত্রী' নামক এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এঁরা সম্ভবত উৎসব অনুষ্ঠানের সময়ে সুলতানের ছত্র ধারণ করতেন। সুলতানের চিকিৎসকরা সাধারণত বৈদ্যজাতীয় হিন্দু হতেন, তাঁদের উপাধি হত 'অন্তরঙ্গ'। কয়েকজন সুলতানের হিন্দু সভাপণ্ডিতও ছিল। সুলতানের প্রাসাদে অনেক ক্রীতদাস থাকত। এরা সাধারণত খোজা অর্থাৎ নপুংসক হত।

সুলতানের অমাত্য, সভাসদ ও অন্যান্য অভিজাত রাজপুরুষগণ 'আমীর', 'মালিক' প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত হতেন। এঁদের ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, বহুবার এঁদের ইচ্ছায় বিভিন্ন সুলতানের সিংহাসন লাভ ও সিংহাসনচ্যুতি ঘটেছে। কোন সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীর সিংহাসনে আরোহণের সময়ে আমীর, মালিক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন দরকার হত। রাজ্যের বিশিষ্ট পদাধিকারীরা 'উজীর' আখ্যা লাভ করতেন। 'উজীর' বলতে সাধারণত মন্ত্রী বোঝায়, কিন্তু আলোচ্য সময়ে বাংলার অনেক সেনানায়ক এবং আঞ্চলিক শাসনকর্তাও 'উজীর' আখ্যা লাভ করেছেন দেখতে পাই। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হত, তাঁরা 'লস্কর-উজীর' আখ্যা পেতেন, কখনও কখনও তাঁদের শুধু 'লস্কর'ও বলা হত। সুলতানের প্রধান মন্ত্রীরা (অন্তত কেউ কেউ) 'খান-ই-জহান' উপাধি লাভ করতেন। প্রধান আমীরকে বলা হত 'আমীর-উল-উমারা'। সুলতানের মন্ত্রী, অমাত্য ও পদস্থ কর্মচারীরা 'খান মজলিস', 'মজলিস অল-আলা', 'মজলিস-আজম', 'মজলিস অল-মুআজ্জম', 'মজলিস অল-মজালিস', 'মজলিস বারবক' প্রভৃতি উপাধি লাভ করতেন। সুলতানের সেক্রেটারীদের বলা হত 'দবীর'। প্রধান সেক্রেটারীকে 'দবীর খাস' (দবীর-ই-খাস) বলা হত।

আলোচ্য যুগের সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুলতান স্বয়ং। বিভিন্ন অভিযানের সময়ে যে সব বাহিনী প্রেরিত হত, তাদের অধিনায়কদের 'সর-ই-লস্কর' বলা হত। সৈন্যবাহিনী চার ভাগে বিভক্ত ছিল—হাতী সওয়ার, ঘোড়-সওয়ার, পদাতিক এবং নৌবহর। বাংলার পদাতিকদের বিশিষ্ট নাম ছিল পাইক; তারা বাংলা দেশেরই লোক। এরা খুব ভাল যুদ্ধ করত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্যন্ত বাংলার সৈন্যেরা প্রধানত তীরধনুক দিয়ে যুদ্ধ করত। এ ছাড়া তারা বর্শা, বল্লম ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রও ব্যবহার করত। শর ও শূল ক্ষেপণের যন্ত্রের নাম ছিল যথাক্রমে "আরাদা" ও "মঙ্গালিক"। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বাংলার সৈন্যেরা কামান ব্যবহার করতে শেখে এবং ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই কামান চালানোয় দক্ষতার জন্যে দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে।

বাংলার সৈন্যবাহিনীতে দশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এক একটি দল গঠিত হত। তাদের নায়কের উপাধি ছিল 'সর-ই-খেল'।

বাংলার নৌবাহিনীর অধিনায়ককে বলা হত 'মীর বহ্‌র্'। বাংলার স্থলবাহিনীর প্রধান শক্তি ছিল হাতী। সে সময়ে বাংলার মত এত ভাল হাতী ভারতবর্ষের আর কোথাও পাওয়া যেত না।

সৈন্যেরা তখন নিয়মিত বেতন ও খাদ্য পেত। সৈন্যবাহিনীর বেতন-দাতার উপাধি ছিল 'আরিজ-ই-লস্কর'।

আলোচ্য সময়ের বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কাজীরা বিভিন্ন স্থানে বিচারের জন্য নিযুক্ত থাকতেন এবং তাঁরা ঐস্লামিক বিধান অনুসারে বিচার করতেন, এইটুকু মাত্র জানা যায়। কোন কোন সুলতান নিজেই কোন কোন মামলার বিচার করতেন।

অপরাধীদের জন্য যে সব শাস্তির ব্যবস্থা ছিল, তাদের মধ্যে প্রধান ছিল বাঁশের লাঠি দিয়ে প্রহার ও নির্বাসন। কোন মুসলমান হিন্দুর দেবতার নাম করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হত এবং কখনও কখনও বিভিন্ন বাজারে নিয়ে গিয়ে তাকে বেত্রাঘাত করা হত। সুলতানদের "বন্দিঘর" অর্থাৎ কারাগারও ছিল; কখনও কখনও হিন্দু জমিদারদের সেখানে আটক করে রাখা হত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুলতানের কোন কর্মচারী তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করলে সুলতান তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। নরহত্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত কিনা, তা জানা যায় না। যতদূর মনে হয়, নরহত্যার ক্ষেত্রে সাধারণ ঐস্লামিক আইনই প্রযুক্ত হত।

স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় শুধু মুসলমানরা নয়, হিন্দুরাও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা অনেক সময়ে মুসলমান কর্মচারীদের উপরে 'ওয়ালি' অর্থাৎ প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হতেন; বাংলার সুলতানদের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, এমনকি সেনাপতির পদেও বহু হিন্দু নিযুক্ত হয়েছেন।

জনজীবনে
কবি ঈশ্বর গুপ্ত

ভবতোষ দত্ত

ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিণী সভা, দর্জ্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যে কয়টি সভার উল্লেখ করেছেন তা ছাড়াও ঈশ্বর গুপ্ত আরো কয়েকটি সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ হবার সম্ভাবনা। কর্মজীবনের প্রথম দিকে ঈশ্বর গুপ্ত দুটি সভার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, সেই সম্বন্ধেই এখানে কিছু আলোচনা করব। তাঁর কর্মজীবনের গোড়ার দিকের বিবরণ সুপরিজ্ঞাত নয়। সে জন্যই এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মাতৃবিয়োগের পর ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতায় চলে আসেন, তখন তাঁর বয়স দশ এগারো বৎসর। স্কুল-কলেজের শিক্ষা তিনি পেলেন না বটে, কিন্তু অল্প বয়সে কলকাতার নবজাগ্রত জীবনচাঞ্চল্যের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে তিনি জীবনের যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সে শিক্ষার ফল ছিল সুদূর-প্রসারী। কলকাতার নানা আন্দোলনের যুগে নানা দিকে বিভিন্ন সভাসমিতি গড়ে উঠেছিল। কোনো সভা ছিল প্রগতিপন্থীদের নতুন ভাবধারা প্রচারের জন্য, কোনো সভা ছিল প্রাচীন ভাবধারা সংরক্ষণের জন্য। তখন কলকাতায় রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনের বিশেষ উত্তেজনা। এই আন্দোলনে স্বভাবতই দেশের লোকেরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল চাইলেন সতীদাহ অবিলম্বেই নিবারিত হক। রামমোহন এবং নব্যবঙ্গ এই মতাবলম্বী ছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের

১৭ই জানুআরি সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ধর্মসভা স্থাপিত হয়েছিল। ধর্মসভার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল এইভাবে—'হিন্দুশাস্ত্রবিহিত ধর্ম কর্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদন পত্রাদি রাজ সন্নিধানে সমর্পণ এবং দেশের মঙ্গলচিন্তন'। ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং এই সব আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন বলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু পরোক্ষে জানা যায়, তিনি ছিলেন ধর্মসভার প্রতি সহানুভূতিশীল। তার একটি কারণ অনুমান করা যায়। তিনি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সেই বাড়ির যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের তিনি ছিলেন বন্ধু। তাঁরই সহায়তায় তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুআরি সাপ্তাহিক প্রভাকর প্রকাশ করেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি মাসে তিনি এর সম্পাদনা ত্যাগ করেন। যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সাধারণভাবে তাঁর পরিবার ধর্মসভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত সম্ভবত পত্রিকার পলিসি হিসাবেই ধর্মসভার সমর্থন করেছেন। সম্পাদনাভার ঈশ্বর গুপ্ত ত্যাগ করলে ধর্মসভার মুখপত্র সমাচারচন্দ্রিকা লিখেছিল—

'প্রভাকর উদয়াবধি গত মাঘ মাস পর্যন্ত বিলক্ষণরূপে ধর্ম পক্ষ ছিলেন তৎপরে গুপ্ত মহাশয় ঐ পত্রবর পরিত্যাগ করিলে প্রভাকরের খর করের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল ফলতঃ তৎকালেই ধর্মসভাধ্যক্ষদিগকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছেন।'

এই সংবাদ দ্বারা বুঝতে পারা যায় ঈশ্বর গুপ্ত যতদিন সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, ততদিন পত্রিকা ধর্মসভার পক্ষে ছিল। পরে ধর্মসভার পক্ষে অনুকূলতা হ্রাস পায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার যোগের কথা উল্লেখ করেছেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভা তখনও মিলিত হয় নি; কিন্তু এই সভা সেকালে একেশ্বরবাদ এবং প্রগতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মুখপাত্র হয়ে ওঠে। এমন কি নব্যবঙ্গের দল দেবেন্দ্রনাথ এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত এই সভার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত এই সভার সদস্য হয়েছিলেন এবং বক্তৃতাও দিয়েছেন।

কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগদানের পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মসভা এবং

আরো দুটি সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের উল্লেখ করেন নি। কিন্তু এই দুই সভারই কিছু গুরুত্ব ছিল। সভা দুটির নাম 'নববিশিষ্ট শিষ্টগণ সভা' এবং 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা'।

প্রথম সভাটি প্রভাকর-সম্পাদকরূপে ঈশ্বর গুপ্তের আত্মপ্রকাশের পূর্বেই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত নিজেই। বাংলা ভাষার চর্চাই এই সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে বঙ্গদূত পত্রে ঈশ্বর গুপ্ত একটি পত্র প্রেরণ করে জানান, এই সভার নাম পরিবর্তিত করা হয়েছে।—

"শ্রীযুক্ত বঙ্গদূত প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু—

পূর্বে এতদ্দেশীয় নববিশিষ্ট শিষ্টগণ সভা নামক সমাজের নিয়ম দূত পত্র দর্শন দ্বারা সকলেই অবগত থাকিবেন সংপ্রতি কিঞ্চিৎ নিয়মান্তর উপস্থিত হইল তাহা।

উক্ত সমাজের নামগত বর্ণবাহুল্যপ্রযুক্ত অনেকেই উচ্চারণে অসমর্থ অতএব সামাজিকেরা সকলে বিবেচনাপূর্বক রঙ্গরঞ্জিনী নামে ঐ সমাজ স্থাপিত করিলেন অপরঞ্চ বঙ্গ ভাষা শিক্ষার্থ এতন্নগরে অনেকেই অত্যন্ত প্রয়াসপূর্বক অনেকে অনেক সমাজ স্থাপিত করেন তাহাতে ভাষা শিক্ষা যাদৃশ হউক কিন্তু অপভাষায় অনেকেই নিপুণ হইয়াছেন তৎপ্রযুক্তই বা হউক কিম্বা তাদৃশ গুণবৎ সংসর্গ প্রযুক্তই বা হউক বিশিষ্ট কুলোদ্ভব জনেরদের গমনাভাব প্রযুক্ত সমাজ সমাজ প্রায় হইয়াছে অতএব অস্মৎ সমাজীয় সামাজিকেরা তাদৃশ নিরীক্ষণ দ্বারা সভা ভঙ্গে ভীত হইয়া এই নিয়ম স্থির করিবেন যে অস্মদীয় সমাজে যদ্যপি বিশিষ্ট শিষ্ট বর্ধিষ্ণু জনেরা সভাদিদৃক্ষু হইয়া আগমন করেন তবে আমারদিগের বহু ভাগ্য কিন্তু ধর্মদ্বেষী ও নাস্তিক মতাবলম্বী মান্যামান্য বিবেচনাশূন্য ও পরজাতীয় ভাষায় নৈপুণ্যত্ব প্রযুক্ত স্বকীয় ভাষাদ্বেষী এই সকলজনেরা অস্মদীয় সমাজে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন না যদ্যপি প্রবিষ্ট হন তবে সভ্যপংক্তির মধ্যে তাঁহারা স্থান পাইবেন না ইত্যাদি নিয়ম পুনর্বার পত্রারূঢ় করিয়া মহাশয় সকলে জ্ঞাত করাইবেন ইতি। বঙ্গরঞ্জিনী সভাসম্পাদক শ্রীঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তস্য।

নববিশিষ্ট শিষ্টগণ সভারই নাম পরিবর্তিত হয়ে 'বঙ্গরঞ্জিনী সভা' নাম হয়। এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮ ডিসেম্বর ১৮৩০-এর সমাচারদর্পণে।

তখন ঈশ্বর গুপ্তের বয়স আঠারো উনিশ বৎসর। এই বিবরণেও ধর্মসভার পক্ষে তাঁর অনুকূলতার ইঙ্গিত আছে। এটা সংবাদপ্রভাকর পত্রিকা প্রকাশের ঠিক এক মাস দশ দিন আগের পত্র। কিন্তু এই চিঠিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, মাতৃভাষা বাংলা প্রচারে তাঁর আগ্রহ। বাংলা ভাষা প্রচার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর উদ্যম ও আগ্রহের নানা বিবরণ পরবর্তী কালে পাওয়া যায়। বলতে গেলে সারাজীবনই তিনি এর জন্যে সংগ্রাম করেছেন। ১৮৩৫ পর্যন্ত সরকারী ভাষা ছিল ফারসি এবং ইংরেজি। ওই বৎসর ফারসি উঠে গিয়ে ইংরেজির পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষার মধ্যে কোন্ ভাষা স্বীকৃত হবে এই নিয়ে যে ঐতিহাসিক আন্দোলন চলেছিল, মেকলের নির্দেশে তার অবসান ঘটে। এই সময়ে বাংলা ভাষার জন্য কেউই বিশেষ মাথা ঘামায় নি একমাত্র ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া। নব্যশিক্ষিত প্রগতিবাদীর দল ইংরেজির জন্য অতিশয় আগ্রহী ছিল। যাঁরা দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন তাঁরা সংস্কৃতের জন্যই যুদ্ধ করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের এই বঙ্গভাষাপ্রীতি রক্ষণশীল মনোভাব থেকেই জেগেছিল কিনা বলা যায় না, কারণ পরে তাঁর এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটলেও বাংলা ভাষাপ্রীতি উত্তরোত্তর বেড়েই গিয়েছিল।

এই ভাষাপ্রীতির জন্যই সম্ভবত তিনি ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি সভার পত্তন করেছিলেন। সভার নাম বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা। নাম থেকেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এই সভার আরও ব্যাপক উদ্দেশ্য ছিল। এই সভাই ছিল আমাদের দেশে রাজনীতি আলোচনার প্রথম সভা। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২ মার্চ সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত একটি চিঠিতে জানা যায়—

"ধর্মসভার পরে রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনাজন্য অপর যে একটা সভা হইয়াছিল তন্মধ্যে বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভাকে প্রথমা বলিতে হইবেক, ঐ সভায় মৃত মহাত্মা রায় কালীনাথ চৌধুরী, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মুন্সি আমীর প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিরা রাজকীয় বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, নিষ্কর ভূমির কর গ্রহণ বিষয়ক প্রস্তাবের অতি সুচারু বিচার হয়, জিলা নদীয়ার বর্তমান প্রধান সদর আমীন শ্রীযুক্ত রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া অনেক প্রকার

বিতর্ক উপস্থিত করিলে মহাশয়ের প্রভাকর পত্রে তাহার সুচারু বিচার হইয়াছিল…”

বস্তুত এই সভায় নানা বিষয়ের আলোচনা হত, কিন্তু বাংলায় হত বলেই এর নাম বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা। ঈশ্বর গুপ্ত পরবর্তী কালে আরও নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, আরও নানা দিকে তিনি মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন উদ্যোগ আয়োজনেই তাঁর ডাক পড়ত। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল হিন্দু থিয়ফিলানথ্রপিক সোসাইটি (১৮৪৩)। কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রতিষ্ঠিত এই সভায় একেশ্বরবাদের আলোচনা হত। ঈশ্বর গুপ্ত এই সভায় নিয়মিত আসতেন এবং প্রবন্ধও পড়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেন নি, এ রকম আরো কয়েকটি সভা হচ্ছে বাংলা ভাষানুশীলনী সভা (১৮৩৯), দেশহিতৈষিণী সভা (১৮৪২), বেহালার হরিসভা। তাঁর সাংবাদিক জীবনের প্রথম দিকে যে দু'টি সভার সঙ্গে যোগের বিবরণ অনেকেরই জানা নেই তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে দিলাম।

কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি

নিরঞ্জন চক্রবর্তী

কবিরঞ্জন ভনিতায় বিদ্যাপতি পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহোদয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশে কবিরঞ্জন উপাধি পাওয়া যায়···কবিরঞ্জনের পদগুলি বিদ্যাপতির বলিয়াই বিবেচনা হয়!" গুপ্ত মহোদয় এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু পদকল্পতরুতে ধৃত সাতটি পদের মাত্র তিনটিকে তিনি তাঁহার সংকলন-গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। স্বভাবতই বলা যাইতে পারে, অপর চারটি পদের বিচারে তিনি বিদ্যাপতির বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কবিরঞ্জনই যে বিদ্যাপতি, এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অনুমানমূলক। কারণ রামগোপাল দাস রঘুনন্দনের শাখা নির্ণয়ে লিখিয়াছেন,—

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিলা খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দঢ়॥
··· ··· ··· ···
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি॥

কবিরঞ্জন সম্পর্কে ইহাই প্রাচীনতম উল্লেখ। রামগোপাল দাস তাঁহার 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থে কবিরঞ্জনের চারটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। নিম্নে সেই পদগুলির প্রথম চরণ দেওয়া গেল।

১।	নবদরশনে নবীন নারী	ষষ্ঠ কোরক
২।	যামুনে কুঞ্জে রহল বনমালী	অষ্টম কোরক
৩।	চরণ-নখর-মণি	"
৪।	উদশল কুন্তল ভারা	"

রামগোপাল দাস এই কবিকে 'ছোট বিদ্যাপতি' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কবিত্ব খ্যাতিতে যিনি প্রায় বিদ্যাপতির সমকক্ষ, তাঁহার

ইঙ্গিত এই উক্তির মধ্য দিয়া প্রমাণিত হয়। এই সূত্র অনুসরণ করিয়া কবিকে বিদ্যাপতি নামে চিহ্নিত করিলে অযৌক্তিক হয় না সত্য, তবে তিনি যে মৈথিল কবিসম্রাট বিদ্যাপতি নহেন তাহা অনস্বীকার্য। কবিরঞ্জনের পদ যে বিদ্যাপতির ভনিতাতেও প্রচারিত হইত তাহার প্রমাণ উপর্যুক্ত তৃতীয় (চরণ-নখর-মণি) পদটি। পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ পদ-সংগ্রহ 'পদকল্পতরু'তে এই পদটি 'বিদ্যাপতির' ভনিতায় আছে। কবিরঞ্জন ভনিতায় এপর্যন্ত খুব বেশী পদ পাওয়া যায় নাই। রসকল্পবল্লীতে ধৃত পদসমূহের পরেই রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জন ভনিতায় তিনটি পদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 'চরণ-নখর-মণি' পদটি অন্যতম। ফলে কবিরঞ্জনের মাত্র দুইটি নূতন পদ ('পন্থ পিছর নিশি কাজর কাঁতি' ও 'দঢ় বিশোয়াসে তুয়া পন্থ নেহরি' পাওয়া যায়। প্রথম পদটিও যে বিদ্যাপতির নামে চলিত ছিল তাহার প্রমাণ বরাহনগর পুথিশালার ২২ সংখ্যক পুথি (পদ ৫১) এবং অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজী মহোদয়ের পুথি। এই উভয় পুথির ভনিতাতেই 'কবিরঞ্জন' স্থলে 'বিদ্যাপতি' আছে। 'রসমঞ্জরী'-র পরেই বাংলাদেশের প্রাচীনতম পদসংকলন গ্রন্থ 'ক্ষণদাগীত চিন্তামণির' উল্লেখ করিতে হয়। এই গ্রন্থে কবিরঞ্জন ভনিতায় মাত্র দুইটি পদ ধৃত হইয়াছে। এই পদ দুইটির প্রথম ছত্র—

১। শ্যামর গৌর-বরণ একদেহ (মজুমদার সংস্করণের ৮৮ সংখ্যক পদ)

২। কবে সে হইবে মোর শুভদিন („ ২৬৫ „)

প্রথম পদটির উল্লেখ করিয়া রামগোপাল দাস তাঁহার 'শাখানির্ণয়ে' কবিরঞ্জনের পরিচয় দিয়াছেন। পদটি যে খুবই প্রচলিত ছিল তাহা বোঝা যায়। কারণ রামগোপাল দাস ইহার উল্লেখ করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন, বাহুল্যবোধে সমগ্র পদটি উদ্ধৃত করেন নাই। এই বহুখ্যাত পদটি যে স্বাভাবিকভাবেই পদসংকলন গ্রন্থে স্থান পাইবে তাহা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কবিরঞ্জনের এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি পদকল্পতরুতে (২১৮৯) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'রায়শেখরের পদাবলী' গ্রন্থে কবিশেখর বা রায়শেখরের বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই পদে কবির পরিচয় কিছুটা প্রকাশ পাইয়াছে।

ত্রিপুরা চরণ-কমল মধু পান।
সরস সঙ্গীত কবিরঞ্জন জান॥ (ক্ষণদা ৮৮)

ত্রিপুরা-চরণাশ্রিত কবির পদটি বৈষ্ণব সমাজ শিরোভূষণরূপে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, কিন্তু ত্রিপুরা-চরণাশ্রিত কবিকে তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তাই পদটি নিশ্চিতভাবে কবিরঞ্জনের হওয়া সত্ত্বেও কবিশেখরের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে হইবে, কবিশেখর ও কবিরঞ্জন যদি অভিন্ন হন তবে আর কোন সমস্যা থাকে না। এই প্রশ্নের উত্তর পরবর্তী অংশে দিতেছি। তাহার পূর্বে কবিরঞ্জন ভনিতায় মোট পদ কতগুলি পাওয়া যায় তাহা দেখা প্রয়োজন। রসকল্পবল্লী, রসমঞ্জরী এবং ক্ষণদাগীতচিন্তামণি হইতে এ-পর্যন্ত মোট সাতটি পদের উল্লেখ করা হইয়াছে। পদকল্পতরুতে কবিরঞ্জন ভনিতায় নিম্নলিখিত সাতটি পদ পাওয়া যায়।

১। আর কবে হবে মোর শুভখন দীন (২১২)
২। কি কহব রে সখি আজুক বিচার (২৫৬)
৩। কি পুছসি রে সখি কানুক নেহ (৬৮০)
৪। পুরুখ রতন হেরি (৯৬৪)
৫। উদশল কুন্তল ভারা (১০৭৮)
৬। কি কব রাইয়ের গুণের কথা (১১০৪)
৭। আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যাব (১৭৬০)

এই পদগুলির মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ পদ পূর্বেই যথাক্রমে রসমঞ্জরীতে ও রসকল্পবল্লীতে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে নূতন পাঁচটি পদ পাওয়া গেল। ফলে মোট বারটি পদ কবিরঞ্জনের ভনিতায় দেখা যায়। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যায়, উপর্যুক্ত দ্বিতীয় পদটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৬৬ সংখ্যক (পদ ৫১) পুথিতে বিদ্যাপতি ভনিতায় পাওয়া গিয়াছে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক কালে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে "বৈষ্ণব পদাবলী" নামে সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে কবিরঞ্জনের একটি নূতন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি,—"মহানস ব্রজভূমি মাহ।" তাহা হইলে কবিরঞ্জন ভনিতায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত পদের সংখ্যা চৌদ্দটি। এখন বিচার করা প্রয়োজন, কবিরঞ্জন এবং কবিশেখর এক ব্যক্তি কিনা। কবিরঞ্জনের দুইটি পদ বিদ্যাপতি ভনিতায় মিলিয়াছে, তাহা দেখাইয়াছি। কবিরঞ্জনের একটি মাত্র পদ (শ্যামর-গৌর-বরণ) কবিশেখর ভনিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু এই পদটি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ইহার

মাধুর্যে রসিক বৈষ্ণব সমাজ এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহারা তন্ত্রপ্রভাবিত শ্রীখণ্ডের বৈষ্ণব কবি কবিরঞ্জনের এই রচনাটিকে কবি-শেখরের নামে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ভনিতার এই রূপান্তর খুব দ্রুত হয় নাই। কারণ, তাহা হইলে ক্ষণদা-তেই এই রূপান্তর লক্ষ্য করা যাইত। আবার এই রূপান্তরও যে শুধুমাত্র 'কবিশেখর' পর্যায়ে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে তাহা নয়। জগদ্বন্ধু ভদ্র সম্পাদিত গৌরপদতরঙ্গিণীতে এই পদটির একটি নূতন ভনিতা পাওয়া যায়।

কবি গৌরচরণ-কমল মধু পান।
সরস সঙ্গীত মাধবীদাস ভান॥

কবিরঞ্জন, কবিশেখর সরিয়া গিয়া মাধবীদাস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। 'গৌরচরণ-কমল মধু পান' যে 'ত্রিপুরাচরণ কমল-মধু পান'কে সজোরে পরিবর্তিত করিয়াছে তাহা সহজেই মনে হয়। যাহাই হউক, রসকল্পবল্লী, ক্ষণদা, পদরসসারের পাঠ অনুসরণ করিয়া এই পদটিকে কবি-রঞ্জনের না বলিয়া উপায় নাই। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পদকল্পতরুর অন্তত একটি পুথিতে (প, ত, পৃঃ ৩) এই প্রাচীন পাঠের সমর্থন আছে। এই পদটি ছাড়া বাকী তেরটি পদের কোনটিই এ পর্যন্ত কোন সংকলন গ্রন্থে কবিশেখর নামের সহিত যুক্ত হয় নাই। অপর দিকে কবিশেখর (৪৬), নব কবিশেখর (৪), শেখর (২), শেখর রায় (১) প্রভৃতি ভনিতার একটি পদেও কবিরঞ্জনের সংযুক্তি দেখা যায় না। কবিরঞ্জন ও কবিশেখর অভিন্ন হইলে একই পদ দুই ভনিতায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, সন্দেহ নাই। কবিরঞ্জন ও কবিশেখর যে এক ব্যক্তি নহেন, এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়। রামগোপাল দাস শ্রীশ্রীরঘুনন্দনঠাকুর প্রভুর শাখানির্ণয়ে যেমন কবিরঞ্জনের উল্লেখ করিয়াছেন, তেমনি রসিকদাসের সহযোগিতায় যে শাখানির্ণয় রচিত হইয়াছে তাহাতে একজন কবিশেখরের উল্লেখ আছে। তিনিও রঘুনন্দনের শিষ্য। কবিরঞ্জন ও কবিশেখরকে অভিন্ন দেখাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন ডঃ সুকুমার সেন। তিনি লিখিয়াছেন,—কবিশেখর ও কবিরঞ্জন দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ধরিতে আমাদের আপত্তি আছে। দুইজনেই বৈদ্য, শ্রীখণ্ডবাসী, রঘুনন্দনের শিষ্য ; দুইজনেই পদ লিখিয়াছেন

রীতিতে।…আমার মনে হয় কবিরঞ্জন কবিশেখরেরই নামান্তর

বা উপাধিভেদ (বা, সা, ই, ১।২ পৃঃ ২১৯)।” অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারও অন্যতম যুক্তি,—“কবিশেখর ও কবিরঞ্জন উভয়েই রঘুনন্দের শিষ্য এবং উভয়ের পদের রচনারীতি এক (বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর পৃঃ ৩৭৪)।” ইঁহারা উভয়েই নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোথাও-বা রামগোপাল দাসকে গ্রহণ করিয়াছেন, আবার কোথাও-বা বর্জন করিয়াছেন। কবিশেখর ও কবিরঞ্জন যদি এক ব্যক্তিই হইবেন তবে তাঁহাদের পৃথকভাবে উল্লেখের কোন প্রয়োজন ছিল না। তাঁহারা অভিন্ন নহেন বলিয়া এই স্বতন্ত্র-উল্লেখ। দ্বিতীয়ত, একই গুরুর দুই শিষ্য হওয়া কিভাবে অসম্ভব তাহা কল্পনাও করা যায় না। তৃতীয়ত, একই ভাবধারা অবলম্বন করিয়া যদি দুইজন কবি পদ রচনা করেন তবে তাঁহারা কি জন্য অভিন্ন হইবেন, তাহাও ইঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। বৈষ্ণব পদসাহিত্যে এইরূপ দৃষ্টান্তের কোনই অভাব নাই। ডক্টর সেনের মত সমর্থন করিয়া ডক্টর শহীদুল্লাহ ‘বিদ্যাপতি শতকে’র ভূমিকায় (পৃঃ ।৶০) আরও একটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—“(নগেন্দ্রনাথ) গুপ্ত মহাশয়ের (বিদ্যাপতি-পদ-সংগ্রহের) ৫৩৩ ও ৫৩৪ নং পদ দুইটি যে একই কবির রচনা তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু ৫৩৩ নং পদের ভনিতায় কবিশেখর এবং ৫৩৪ নং পদের ভনিতায় বিদ্যাপতি।”— পদ দুইটিতে জটিলা-কুটিলার উল্লেখ থাকায় বিদ্যাপতির হইতে পারে না। সুতরাং ইহা বাঙ্গালী কবির লেখা। ‘কবিরঞ্জন’ ব্যতীত যখন অন্য কোন বাঙ্গালী বিদ্যাপতির কথা জানা যায় না, সেইহেতু সহজেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই দুই পদই কবিরঞ্জনের রচনা এবং তাঁহার কবিশেখর উপাধিও ছিল। এ সম্পর্কে বলা যায় কবিরঞ্জন, কবিশেখর, গোবিন্দদাস প্রভৃতির বহু পদই বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া সকলকেই অভিন্ন করিয়া দেখিলে সত্যনির্ণয় করা যায় না। ডক্টর শহীদুল্লাহ এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন,—“একই বিষয় বস্তু নিয়ে রচিত পরস্পরের পরিপূরক দুইটি পদের একটিতে ‘কবিশেখর’ ভনিতা এবং অপরটিতে ‘বিদ্যাপতি’ ভনিতা পাওয়া যায়।” সেইজন্য তিনি কবিশেখর, বিদ্যাপতি, বাঙ্গালী বিদ্যাপতি বা কবিরঞ্জনকে অভিন্ন মনে করিয়াছেন। গোবিন্দদাস মৈথিল কবির পদের পরিপূরক অনেক পদ রচনা করিয়াছেন। এই যুক্তিতে নিশ্চয়ই

কবিপরিচয় লুপ্ত হয় না। একই গুরুর দুই কবি-শিষ্য যদি পরস্পর পরস্পরের ভাবের পরিপূরক পদ রচনা করেন, তবে তাঁহাদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব কেন স্বীকার করা যাইবে না, তাহা বোঝা যায় না। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় মহাশয় আরও দুইটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"রামগোপাল লিখেছেন যে কবিরঞ্জন 'রাজসেবী' ছিলেন। কবিশেখরও 'রাজসেবী' ছিলেন।" সুতরাং তাঁহার মতে ইঁহারা অভিন্ন। দুইজন কবিই যদি রাজসেবী হন তাহাতে তাঁহাদের পৃথক ব্যক্তিত্ব কেন ক্ষুণ্ণ হইবে তাহা বোঝা যায় না। দ্বিতীয়ত, তিনি 'আনক লোকুঅ বচনে বোলএ হঁসি' (মি-ম—১৩২) পদটির তিনটি পাঠভেদ দেখাইয়াছেন। রাগতরঙ্গিণীতে পদটি কবিশেখরের নামে, পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতির ভনিতায় এবং সুধীরচন্দ্র রায় ও অপর্ণা দেবীর 'কীর্তন পদাবলী'তে কবিরঞ্জন ভনিতায় আছে। শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় রাগতরঙ্গিণীতে "ইতি বিদ্যাপতেঃ" বলিয়া উল্লেখ আছে ইহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদ কবিশেখর ভনিতায় পাওয়া অসম্ভব নয়। রাগতরঙ্গিণীতে যেখানে কবিশেখর ভনিতার সহিত বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে, সেক্ষেত্রে পদকল্পতরুর ভনিতায় বিদ্যাপতি দেখিলে নূতন কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয় না। সুধীরচন্দ্র রায় এবং অপর্ণা দেবী আকর গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই। তাই তাঁহাদের গৃহীত পাঠে গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। তা ছাড়া, পদাবলীর রাজ্যে বহু ক্ষেত্রে একই পদ বিভিন্ন কবির নামে পাওয়া যায়। সেই সকল ক্ষেত্রে এই ভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাই যুক্তিসঙ্গত।

কবিরঞ্জন এবং কবিশেখর স্বতন্ত্র কবি-ব্যক্তিত্ব। কবিশেখর ভনিতার নানারূপ দেখা যায়। শেখর, রায়শেখর, শেখররায়, কবিশেখর প্রভৃতি ভনিতায় যেমন বহু পদ দেখা যায় তেমনি আর একজন গ্রন্থকর্তা কবিশেখরেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি গোপালবিজয়-কার কবিশেখর। রামগোপাল দাস রসিকদাসের সহযোগিতায় রসিকনির্ণয় গ্রন্থে কবিশেখরের উল্লেখ করিয়াছেন। রসকল্পবল্লীতে তিনি কবিশেখরের গোপালবিজয় হইতে উদ্ধৃতি লইয়াছেন। গোপালবিজয়-কার কবিশেখর এবং পদকর্তা কবিশেখর যদি অভিন্ন না হইতেন, তবে তিনি স্বতন্ত্র উল্লেখ রাখিতেন। শেখর, রায়শেখর, শেখররায় ও কবিশেখর ভনিতাযুক্ত

সকল পদের কবিই একজন কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে প্রসিদ্ধ পদকর্তা কবিশেখর যে গোপালবিজয় কাব্যের রচনাকার তাহা মনে করা যায়। ভাব, ভাষা এবং ভনিতার ক্ষেত্রে যে সাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায় তাহা অভিন্নত্বেরই দ্যোতক। কবিশেখরের সঙ্গে কবিরঞ্জনকে এক করিবার কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ নাই। কবিরঞ্জন যে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি-রূপে বৈষ্ণব সমাজে বন্দিত তাহাও অনস্বীকার্য।

অভিনয়ের চতুরঙ্গ

সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে সেই বিষয়ের সংজ্ঞা, উৎপত্তি, স্বরূপ এবং ক্রমবিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; নতুবা সেই বিষয়সম্বন্ধে সম্যগ্ জ্ঞানলাভ হয় না। সুতরাং অভিনয়ের চারটি অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে—অভিনয়-বিষয়ক দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

'অভিনয়' বলিতে কি বুঝি ?

অভিনয়তি—হৃদ্‌গতভাবাদীন্ প্রকাশয়তি ইতি অভিনয়ঃ (অভি—নী +কর্তরি অচ)। মানুষের হৃদয়স্থিত ভাবভঙ্গী, লোভক্রোধাদির শারীরিক চেষ্টা লোকচক্ষুর সমক্ষে উপস্থাপিত করাই হইল অভিনয়। এই ভাবটিকে বুঝাইতে গিয়া বিশ্বনাথ বলিয়াছেন—"ভবেদভিনয়োৎবস্থানুকারঃ" (সাহিত্যদর্পণ, ৬ষ্ঠ পঃ)। অভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য মনের প্রকৃতভাব ব্যক্ত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা বহু প্রকার কৃত্রিম সাজ-সজ্জা, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া থাকি।

নাট্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

"অভিনয় ইতি কস্মাৎ ? অত্রোচ্যতে—অভীত্যুপসর্গঃ। নীঞিত্যয়ং ধাতুঃ প্রাপনার্থঃ। অস্যাভিনীত্যেবং ব্যবস্থিতস্য এরজিত্যচ্ প্রত্যয়াস্তস্যাভিনয় ইতি রূপংসিদ্ধম্। এতচ্চ ধাত্বর্থবচনেনাবধার্যম্। অত্র শ্লোকৌ—

অভিপূর্বস্তু নীঞ্-ধাতুরাভিমুখ্যার্থনির্ণয়ে।
যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥
বিভাবয়তি যস্মাচ্চ নানার্থান্ হি প্রয়োগতঃ।
শাখাঙ্গোপাঙ্গ-সংযুক্তস্তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ॥
চতুর্বিধশ্চৈব ভবেন্নাট্যস্যাভিনয়ো দ্বিজাঃ।
অনেকভেদবহুলং স্যাট্যমস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্॥

আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব হ্যাহার্যঃ সাত্বিকস্তথা।
জ্ঞেয়স্ত্বভিনয়ো বিপ্রাশ্চতুর্ধা পরিকীর্তিতঃ॥ (৮-৬-১০)

কি ভাবে একজনের হৃদয়স্থিত মনোভাব অপরের হৃদয়ে জাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহার জন্য অভিনয়কে আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্বিক হিসাবে চার ভাগে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ এই সমস্ত অবস্থার মাধ্যমে একজনের হৃদ্‌গতভাব অপরের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। এই বিষয়ে আনন্দ কুমারস্বামীর অভিমত :—

"The root *ni* with the prefix *abhi* implies exposition, and the word *abhinaya* is used in this sense. According to another book (*granthantare*), *abhinaya* is so called because it evokes flavour (*rasa*) in the audience. There are three kinds of gesture : bodily, vocal. and ornamental (*angika*, *vacika* and *aharya*), besides the pure, passionate, and dark (*sattvika*, etc)."

(The Mirror of Gesture, P. 17)

এ, বি, কীথ বিভিন্নদিক পর্যালোচনাপূর্বক বলিয়াছেন—

"A drama is the imitation or representation of the conditions or situations (*avasthanukrti*) in which the personages who form the subject of treatment are placed from time to time, by means of gesture, speech, costume, and expression, and, one version of the definition adds, the situations must be such as to produce pleasure or pain, that is, they must be tinged with emotion. It is the presence of these ancillaries which distinguished the drama from an ordinary poem ; a poem appeals to the ear only, a drama is also a spectacle to delight the eyes, hence the term Rupa or Rupaka as applied generally to the drama, for Rupa primarily denotes the object of vision, though the Indian tradition gives the artificial explanation that Rupa denotes a drama because the actors are credited with different parts."

(Sanskrit Drama, PP.295-296)

ইহারই উদাহরণ প্রসঙ্গে তিনি আবার বলিয়াছেন—

"It is now possible to understand clearly the essential relation of the spectator to the actors ; we see on the stage, for instance, Rama and Sita, who excites his affection, aided by suitable circumstances of time and place, this affection is intimated by speech and gesture alike, which indicate both the dominant emotion of love and its transient shapes in the various stages of love required. The spectacle evokes in the mind of the spectator the impressions of the emotions of love which experience has planted there, and this ideal and generic excitation of the emotion produces in him that sense of joy which is known as sentiment. The fullness of the enjoyment depends essentially on the nature and experience of the spectator, to whom it falls to identify himself with the hero or other character, and thus to experience in ideal form his emotions and feelings. He may even succeed in his effort to the extent that he weeps real tears, feels terror and sorrow, but the sentiment is still one of exquisite joy. We may compare the thrill of pleasure which the most terrifying narration excites in us, and we are all conscious of the sweetness of sad tales." (Ibid, P. 321)

"নাট্যশাস্ত্রপ্রবীণ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে, যেমন নৃত্য করিবার সময়ে নানা প্রকার কৌশলে ভাবভঙ্গীর সহিত হস্ত পদ কটি প্রভৃতি অঙ্গ চালনা করিলে নৃত্য অতি সুন্দর দেখায় এবং দর্শকদেরও নয়ন মন মুগ্ধ হয়, অভিনয় কার্য্যেও বিশেষ বিশেষ স্থলে যখন যেমন আবশ্যক হইবে, তখন ঠিক তদনুরূপ কৌশলে ভাবভঙ্গী করিয়া হস্তপদাদি চালনা করিতে পারিলে অভিনয়ও সুন্দর হইয়া থাকে। নটনটী প্রভৃতি কাহাকে বলিতে বলিবে, সেখানেও হস্ত তুলিয়া সম্ভাষণ করিবার সময়ে একটু ভাব থাকা চাই। পুরুষ পুরুষের মত মুখ প্রভৃতি অঙ্গের ভাব প্রকাশ করিবে, স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকের মত। এইরূপ বালক, বৃদ্ধ, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই

নিজ নিজ স্বভাবানুসারে অঙ্গভঙ্গী করিলে দৃশ্য মনোহর হয়। নাট্যরসজ্ঞ ব্যক্তিরা আরও বলিয়া থাকেন যে, সময় ও স্নেহাদির পাত্র বুঝিয়াও বিশেষ বিশেষ রূপ অঙ্গভঙ্গী করা আবশ্যক।" (বিশ্বকোষ) এইভাবে অবস্থানুরূপ ভাব প্রকাশের দ্বারা অভিনয় আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিকময় হইলেই সার্থক। এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অভিনয়ে অনুকরণনৈপুণ্য, দৃশ্যসৌষ্ঠব, শ্রুতিমাধুর্য ও পরিহাস প্রভৃতি গুণ থাকা নিতান্তই আবশ্যক ; নচেৎ অভিনয় নীরস ও দোষযুক্ত হইবার সম্ভাবনা।

ইহার উৎপত্তি

অভিনয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে পরবর্তীকালে যে সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাদের মূল উৎস বেদ। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদ ভারতীয় জ্ঞানরাশির মূল উৎসস্বরূপ। প্রাচীন কারিকায় আছে—

ঋগ্‌বেদস্যায়ুর্বেদোপবেদো যজুর্বেদস্য ধনুর্বেদোপবেদঃ।
সামবেদস্য গন্ধর্ববেদোপবেদোঽথর্ববেদস্য শিল্পশাস্ত্রানীতি॥

অর্থাৎ, ঋগ্‌বেদ হইতে আয়ুর্বেদ, যজুর্বেদ হইতে ধনুর্বেদ, সামবেদ হইতে গন্ধর্ববেদ এবং অথর্ববেদ হইতে শিল্পশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, অভিনয়দর্পণেও আছে যে ঋগ্‌বেদ হইতে পাঠ্য, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় (অর্থাৎ আঙ্গিকাভিনয়), সামবেদ হইতে গীত এবং অথর্ববেদ হইতে রসাদির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—

ঋগ্‌-যজুঃ-সামবেদেভ্যো বেদাচ্চাথর্বণঃ ক্রমাৎ।
পাঠ্যং চাভিনয়ং গীতং রসান্ সংগৃহ্য পদ্মজঃ॥
ব্যরীরচচ্ছাস্ত্রমিদং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্॥ ৭-৮॥

নাট্যশাস্ত্রেও আছে—

জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্‌বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি॥
বেদোপবেদৈঃ সম্বদ্ধো নাট্যবেদো মহাত্মনা।
এবং ভগবতা সৃষ্টো ব্রহ্মণা সর্ববেদিনা॥ (১।১৭-১৮)

সুতরাং ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব বেদ আজও আমাদের নিকট এক-একটি বিস্ময়। প্রাচীন ভারতীয় মুনি-ঋষিদের অপূর্ব প্রজ্ঞাশক্তির

পরিচয় এই সকল সাহিত্যের মধ্যে লুকায়িত আছে। এখনও এমন অনেক বিষয় আছে যাহা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে। সে যাহাই হউক, কিভাবে অভিনয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সকল গ্রন্থ হইতে তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে অভিনয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

পুরাকালে ভরতমুনি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া শিষ্যগণ (মতান্তরে স্বপুত্রগণ) দ্বারা পরিবৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম আত্রেয় মুনি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—

যোঽয়ং ভগবতা সম্যগ্ গ্রথিতো বেদসম্মিতঃ।
নাট্যবেদঃ কথং ব্রহ্মন্নুৎপন্নঃ কস্য বা কৃতে॥ ৪॥
কত্যঙ্গঃ কিংপ্রমাণশ্চ প্রয়োগশ্চাস্য কীদৃশঃ।
সর্বমেতদ্ যথাতত্ত্বং ভগবন্ বক্তুমর্হসি॥ ৫॥

অর্থাৎ হে ভগবন্, কেন এবং কাহার জন্য এই বেদোপম নাট্যবেদ উৎপন্ন বা রচিত হইয়াছিল, যাহা ভগবৎতুল্য (আপনা)-কর্তৃক গ্রথিত হইয়াছে। (উহার) কয়টি অঙ্গ? কিই বা প্রমাণ? আর উহার প্রয়োগবিধিই বা কিরূপ। ইহা, হে ভগবন্, আপনি যথাযথভাবে প্রকাশ করুন।

আত্রেয় কর্তৃক এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া ভরতমুনি স্বয়ং বলিতে আরম্ভ করিলেন—

নাট্যবেদ মূলতঃ ব্রহ্মার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। পুরাকালে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের পর বৈবস্বত মনুর ত্রেতাযুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সেই ত্রেতাযুগেই ব্রহ্মাকর্তৃক এই নাট্যবেদের উৎপত্তি হয়। কারণ, তখনকার লোকেরা "গ্রাম্য-ধর্মে প্রবৃত্ত হইয়া, কাম লোভের বশবর্তীপূর্বক ঈর্ষ্যা এবং ক্রোধাদির দ্বারা সম্মূঢ় হইয়া সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" সেই সময়ে জম্বুদ্বীপে "দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষস ও মহোরগসমূহদ্বারা অধ্যুষিত ছিল; এবং লোকপালগণ কর্তৃক সেই অঞ্চলটি শাসিত হইত।" সেই সময়ে মহেন্দ্র প্রমুখ দেবগণ পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন—

"ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ॥" ১১॥

অর্থাৎ, দৃশ্য ও শ্রব্য রূপী একটি ক্রীড়নক চাই আমরা। আপনি

"সার্ববর্ণিক" একটি পঞ্চম বেদের সৃষ্টি করুন ("তস্মাদ্ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ববর্ণিকম্" ১২ ॥)।

এইভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া সর্ববিৎ ও তত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মা সকল বেদ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া, সর্বজনের ও সকল জাতির উপযুক্ত "পঞ্চমবেদ" নামক এই নাট্যশাস্ত্র সৃষ্টি করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে—

জগ্রাহ পাঠ্যম্ ঋগ্‌বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ ঋগ্‌বেদ হইতে পাঠ্য, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্বেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ববেদ হইতে রস সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নাট্যবেদ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা সুরেশ্বরকে বলিলেন—"আমি নাট্যবেদ সৃষ্টি করিয়াছি, তুমি যাঁহারা কুশল, বিদগ্ধ, প্রগল্‌ভ ও জিতশ্রম তাহাদিগের মধ্যে উহা সংক্রামিত কর।" ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন—

গ্রহণে ধারণে জ্ঞানে প্রয়োগে চাস্য সত্তম।
অশক্তা ভগবন্ দেবা অযোগ্যা নাট্যকর্মণি ॥ ২২ ॥

অর্থাৎ হে ভগবন্, দেবগণ ইহার ধারণে, গ্রহণে জ্ঞানে ও প্রয়োগে অক্ষম এবং নাট্যকর্মেও অযোগ্য। তখন ব্রহ্মা শত পুত্র (বা শত শিষ্য) পরিবৃত ভারতকে উহা শিখাইলেন। ভরত ব্রহ্মাকর্তৃক নাট্যবেদ শিখিয়া তাঁহার শতপুত্রকে (অর্থাৎ শিষ্যকে) বিভিন্ন বিভাগানুসারে বিভিন্নকর্মে প্রয়োগকুশল করিয়া তুলিলেন। নাট্যশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ের ২৬ হইতে ৩৯ শ্লোকে ভরতের শত পুত্রের নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

ভরত তাঁহার শিষ্যগণকে যে নাট্যবেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার ফলে কৈশিকী ভারতী, সাত্বতী ও আর ভটী বৃত্তির উৎপত্তি হইয়াছিল। কৈশিকী বৃত্তি দেহের সৌন্দর্যবর্ধনকারী, ভারতী বৃত্তি বাগ্‌ ব্যাপার সম্বন্ধী, সাত্বতী মনঃসম্বন্ধী ব্যাপার এবং আর ভটী বৃত্তি অনলস ভটগণের কায়-সম্বন্ধী ব্যাপার। এইরূপে নাট্যবেদের বিভিন্ন অঙ্গের উৎপত্তি হইলে পর, নারদাদি গন্ধর্বগণ নাট্যবেদে গান সংযোগ করিয়াছিলেন। বেদবেদাঙ্গ হইতে নাট্যধর্ম শিক্ষালাভ করিয়া ভরত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—

"নাট্যস্য গ্রহণং প্রাপ্তং ব্রুহি কিং করবাণ্যহম।" ৫৩ ॥

তখন পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন—

"মহানয়ং প্রয়োগস্য সময়ঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্ মহেন্দ্রস্য প্রবর্ততে॥ ৫৪॥
অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্।" ৫৫॥

তারপর অভিনয়ের পূর্বে আশীর্বচনসংযুক্তা, অষ্টাঙ্গপদসংযুক্তা, বিচিত্রা বেদনির্মিতা নান্দী রচিত হইয়াছিল। নান্দ্যন্তে দেবাসুরের জয় পরাজয় সম্বলিত কাহিনী অনুসরণে অনুকৃতি যোজনাপূর্বক নাট্য অভিনীত হইয়াছিল। সেই অভিনয়দর্শনে ব্রহ্মা ও তৎসহ দেবগণ যারপরনাই প্রীত হইয়া প্রভূত উপকরণ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমে ইন্দ্র তাঁহার ধ্বজখানি প্রদান করিয়াছিলেন।

("প্রীতস্তু প্রথমং শক্রো দত্তবান্ স্বং ধ্বজং শুভম্"॥ ৫৯॥)

তারপর—

ব্রহ্মা কুটিলকং চৈব ভৃঙ্গারং বরুণঃ শুভম্।
সূর্যশ্ছত্রং শিবঃ সিদ্ধিং বায়ুর্ব্যজনমেব চ॥ ৬০॥
বিষ্ণুঃ সিংহাসনং চৈব কুবেরো মুকুটং তথা।
শ্রাব্যত্বং প্রেক্ষণীয়স্য দদৌ দেবী সরস্বতী॥ ৬১॥
শেষা যে দেবগন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
তস্মিন্ সদস্যভিপ্রেতান্ নানা-জাতি-গুণাশ্রয়ান্॥ ৬২॥
অংশাংশৈর্ভাষিতং ভাবান্ রসান্ রূপং বলং তথা।
দত্তবন্তঃ প্রহৃষ্টাস্তে মৎসুতেভ্যো দিবৌকসঃ॥ ৬৩॥

এইরূপে বিভিন্ন দেবগণের নিকট হইতে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া অভিনয়ের বিভিন্ন অঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই অভিনয় দর্শনে দৈত্যগণ ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিনয়ের বিঘ্ন ঘটাইতে লাগিলেন। অভিনেতা ও নৃত্যকারিগণের বাক্, প্রয়াস ও স্মৃতি পর্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা ধ্যানবলে দেবগণের এইরূপ অবস্থা জানিতে পারিয়া বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত দেবরাজ শক্রকে তথায় পাঠাইলেন। দেবরাজ শক্র স্বীয় উত্তম ধ্বজা দ্বারা অসুরগণকে জর্জরীকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "জর্জর" হইয়াছে।

জর্জরীকৃত—সর্বাঙ্গা যেনৈতে দানবাঃ কৃতাঃ॥ ৭২॥

যস্মাদনেন তে বিঘ্নাঃ সাসুরা জর্জরীকৃতাঃ।

তস্মাজ্ জর্জর এবেতি নামতে'হয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৭৩ ॥

সেই হইতে সর্বপ্রকার বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত নাটকে জর্জরের প্রয়োগ হইয়া আসিতেছে। কারণ, জর্জর সকল রক্ষার কারণ বলিয়া বিবেচিত।

রক্ষাভূতশ্চ সর্বেষাং ভবিষ্যত্যেষ জর্জরঃ ॥ ৭৫ ॥

জর্জরদ্বারা দানবগণকে বিতাড়িত করিয়া দেবগণ পুনরায় নাট্য প্রয়োগে প্রস্তুত হইলে পর দানবগণ আবার আসিয়া উৎপাত করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া বিস্তারিত বিবরণ জানাইলেন। ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে প্রযত্ন সহকারে নাট্যগৃহ নির্মাণ করিয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্মা তৎক্ষণাৎ সর্বলক্ষণযুক্ত নাট্য-গৃহ নির্মাণ করিয়া দিলেন। নাট্যগৃহ নির্মিত হইলে পর ব্রহ্মা ও দেবগণ তাহা পরিদর্শন করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দেবগণের উপর রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। ব্রহ্মা দৈত্যগণকে জিজ্ঞসা করিলেন—"কি হেতু তোমরা নাটকের বিনাশ সাধন কর?" দৈত্যগণ বলিলেন—"সুরগণের নিমিত্ত আপনি যে নাটক সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা আমাদিগের পক্ষে অপমানজনক।" তখন ব্রহ্মা বলিলেন যে, নাটক সুর ও দৈত্য সকলের নিমিত্ত। ইহাতে কোন ভেদাভেদ নাই। যাহারা উহা সম্পাদন করিবে, তাহাদের নিমিত্তই এই নাটক সৃষ্ট হইয়াছে। ভেদাভেদের উপর নির্ভর করিয়া নাট্যবেদ সৃষ্ট হয় নাই। নাটক শুভাশুভ বিষয়ক। সকল শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া ইহার সৃষ্টি। নাটক এই সমগ্র ত্রৈলোক্যের ভাবানুকীর্তন। ইহার মধ্যে

ক্বচিদ্ধর্মঃ ক্বচিৎক্রীড়া ক্বচিদর্থঃ ক্বচিচ্ছমঃ।

ক্বচিদ্ধাস্যং ক্বচিদ্যুদ্ধং ক্বচিৎকামঃ ক্বচিদ্ বধঃ ॥ ১০৮ ॥

ইহা—

ধর্মো ধর্মপ্রবৃত্তানাং কামঃ কামোপসেবিনাম্।

নিগ্রহো দুর্বিনীতানাং বিনীতানাং দমক্রীড়া ॥ ১০৯ ॥

ক্লীবানাং ধার্ষ্ট্যজননমুৎসাহঃ শূরমানিনাম্।

অবুধানাং বিবোধশ্চ বৈদুষ্যং বিদুষামপি ॥ ১১০ ॥

ঈশ্বরাণাং বিলাসশ্চ স্থৈর্যং দুঃখার্দিতস্য চ।

অর্থোপজীবিনামর্থো ধৃতিরুদ্বিগ্নচেতসাম্ ॥ ১১১ ॥

নাটক—উত্তম, মধ্যম ও অধম নির্বিশেষে উপভোগ্য, নানা ভাবোপসম্পন্ন এবং নানাবস্থান্তরাত্মক। নাটক যশস্কর, আয়ুর্বর্দ্ধক, হিতকর এবং বুদ্ধি বিবর্ধক। শুধু তাহাই নহে—

ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাসৌ যোগো ন তৎকর্ম নাট্যেঽস্মিন যন্ন দৃশ্যতে॥ ১১৬॥

তিনি আরও বলেন যে এই নাটক সপ্তদ্বীপের অনুকরণাত্মক হইবে। এই নাটকে দেবগণের, রাজমণ্ডলের, কুটুম্বগণের এবং ব্রহ্মর্ষিসমূহের বৃত্তান্ত থাকিবে। লোকের এই জাতীয় সুখদুঃখসমন্বিত স্বভাব অনুকরণাত্মক হইয়া অভিনীত হইলেই ইহাকে নাট্য বলা হইয়া থাকে।

যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখসমন্বিতঃ।
সোঽঙ্গাদ্যভিনয়োপেতো নাট্যমিত্যভিধীয়তে॥ ১১৯॥

তিনি পুনরায় বলিলেন যে, এই নাট্য সকলের মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এইভাবে তিনি ভরতকে রঙ্গপূজা করিয়া নাট্যকর্মে উদ্যোগী হইতে বলিলেন। রঙ্গপূজা ব্যতীত কখনও প্রেক্ষার প্রবর্তন করা উচিত নহে। কারণ—

অপূজয়িত্বা রঙ্গং তু যঃ প্রেক্ষাং কল্পয়িষ্যতি।
নিষ্ফলং তস্য তজ্জ্ঞানং তির্যগ্‌যোনিং চ যাস্যতি॥ ১২৩॥

এইভাবে নাট্যবেদের উৎপত্তি হইয়াছিল।

এ প্রসঙ্গে "The Mirror of Gesture" গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় "ইন্দ্র-নন্দিকেশ্বর সংবাদ" নামে একটি কাহিনী আছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, একদিন ইন্দ্র কৈলাসশিখরবাসী নন্দিকেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে তিনি দৈত্য নর্তক নটশেখরকে নৃত্যে পরাজয় করিতে চান। সেই উদ্দেশ্যে তিনি নন্দিকেশ্বরের নিকট হইতে নৃত্যবিদ্যা শিক্ষা করিতে আগ্রহী। তখন চার হাজার শ্লোকে নন্দিকেশ্বর "ভরতার্ণব" নামে একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া ইন্দ্রকে উপহার দিলেন ইন্দ্র গ্রন্থের আকার দর্শনে ভীত হইলেন এবং নন্দিকেশ্বরকে সংক্ষিপ্ত আকারে নৃত্যবিষয়ে কিছু জ্ঞান প্রদান করিতে বলিলেন। তখন তিনি দয়াপরবশ হইয়া সংক্ষিপ্ত আকারে "অভিনয় দর্পণ" গ্রন্থখানি রচনা করিলেন। এইভাবে ভারতে নৃত্যনাট্যের উৎপত্তি হইয়াছিল।

অভিনয়ের সামগ্রী

উপরি উক্ত কাহিনীদ্বয়ের আর কোন মূল্য থাকুক বা না থাকুক, অন্তত এইটুকু বোঝা গেল যে অভিনয়ের সামগ্রী মূলতঃ চার প্রকারের; যথা—বাচিক, আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক এবং ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আরও দুইটি: গতি ও স্থিতি। কেবল তাহাই নহে, এক একটি বিভাগের আরও বহু উপবিভাগ আছে।

ক. বাচিক

অভিনয়ের প্রথম অঙ্গের নাম বাচিক। নাট্যশাস্ত্রে, অভিনয়দর্পণ প্রভৃতিতে বলা হইয়াছে যে, বাচিক অভিনয় ঋগ্‌বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঋগ্‌বেদ মন্ত্রাত্মক—সেইজন্য উহা হইতে বাচিকাভিনয় গ্রহণ করা হয়। এই বাচিকই 'পাঠ্য' নামে অভিহিত হয়। তাই অভিনয়দর্পণে বলা হইয়াছে—

বাচা বিরচিতঃ কাব্যনাটকাদিষু বাচিকঃ ॥ ৩৯ ॥

অর্থাৎ কাব্যনাটকাদিতে বাক্যের দ্বারা বিরচিত অভিনয়ই বাচিক। তাই পরবর্তীকালে বাচিক কাব্যাদি শাস্ত্রকে মূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়—দৃশ্য ও শ্রব্য। দৃশ্যকাব্যই দর্শনযোগ্য; অতএব অভিনবযোগ্য। এই দৃশ্যকাব্য মানুষের রূপ অর্থাৎ চরিত্র প্রকাশ করে বলিয়া ইহাকে রূপক বলে (রূপারোপাত্তু রূপকম্—সা: দ: ৬ ৪২) সাহিত্যদর্পণকার দৃশ্যকাব্যকে আবার প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন—রূপক ও উপরূপক।

রূপক ও উপরূপক যথাক্রমে দশ ও আঠার প্রকারের।

দশরূপকে কেবল দশপ্রকার রূপকের কথা বলা হইয়াছে। উপ-রূপকের কোন বিবরণ নাই। তবে নাটিকা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে।

যদিও ধনঞ্জয় উপরূপকের কোন বিবরণ প্রদান করেন নাই, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে নাটিকার কিছু লক্ষণ পাই।

লক্ষ্যতে নাটিকাপ্যত্র সঙ্কীর্ণাঙ্গনিবৃত্তয়ে। (হল, ৩, ৫১)

ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও দশটি রূপকের কথা বলা হইয়াছে।

শারদাতনয় ভাবপ্রকাশনে রূপক ও উপরূপক হিসাবে দৃশ্যকাব্যকে ভেদ না করিয়া কেবল সাকল্যে ত্রিশ প্রকার দৃশ্যকাব্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নাটকাদি দশটি রসাশ্রিত এবং অবশিষ্ট কুড়িটি বাক্যার্থাভিনয় প্রধান।

শ্রব্যকাব্য অভিনয়যোগ্য নহে বলিয়া নাট্য সমালোচকগণ উহার ভেদ নিরূপণে প্রযত্ন করেন নাই। শ্রব্যকাব্য মূলতঃ তিন প্রকার—পদ্য, গদ্য ও মিশ্র (গদ্যপদ্য)। পদ্য আবার মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষ ও মুক্তক ভেদে বহু প্রকার হইতে পারে। গদ্য প্রধানতঃ কথা ও আখ্যায়িকা ভেদে দ্বিবিধ। গদ্যপদ্যময় কাব্য মিশ্ররূপে বিবেচিত। ইহা চম্পূ ও বিরুদভেদে দ্বিবিধ। এই সকলের বিবরণ অলংকার শাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে।

খ. আঙ্গিক

বাচিক অভিনয়কে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে আঙ্গিক অভিনয়ের প্রয়োজন। এই আঙ্গিক অভিনয় যজুর্বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যজুর্বেদ ক্রিয়াত্মক (অর্থাৎ যাগযজ্ঞ-বিষয়ক)—তাই উহা হইতে আঙ্গিকে অভিনয় গৃহীত হইয়াছে। এখানে অঙ্গ বলিতে—অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গকে বুঝায়। অঙ্গ আবার মস্তক, হস্ত ও পাদ ভেদে ত্রিবিধ। প্রত্যঙ্গ বলিতে গ্রীবা বুঝায়। উপাঙ্গ দৃষ্টি-বিষয়ক। ইহাদেরও আবার বহু ভেদ আছে। এই আঙ্গিক অভিনয়ই অভিনয় দর্পণের বিষয়বস্তু। এই বিষয় পরে বিস্তারিত আলোচিত হইবে। ভাবাস্ফুটির পূর্বে অঙ্গভঙ্গীই মানুষের ভাব প্রকাশের পক্ষে একমাত্র উপায় ছিল—আঙ্গিক অভিনয় ইহারই দ্যোতনা করে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অভিনয় দর্পণের ভূমিকায় (পৃঃ ১০-১২) ভরত, নন্দিকেশ্বর এবং শার্ঙ্গদেবের আহার্যাভিনয় প্রসঙ্গের একটি তুলনমূলক আলোচনা করিয়াছেন। আমি ইহার

একটি চিত্র নিম্নে তুলিয়া ধরিতেছি—

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি	ভরত মতে প্রকার (নাট্যশাস্ত্র)	নন্দিকেশ্বর মতে প্রকার (অভিনয় দর্পণ)	শার্ঙ্গদেব মতে প্রকার (সঙ্গীত রত্নাকর)	মন্তব্য
শিরঃ	১৩	৯	১৯	ভরত মতে ১৪ প্রকার ও অন্য মতে ৫ প্রকার।
দৃষ্টি	৩৬	৮	৩৬	ভরতে ও শার্ঙ্গদেবে কোন সাদৃশ্য নাই।
গ্রীবা	৯	৪	৯	ঐ
হস্ত				
১) অসংযুত	২৪	২৮	২৪	সকল নামের সাম্য নাই
২) সংযুত	১৩ } ৬২	২৩ } ৬৪	১৩ } ৬৭(?)	
৩) নৃত্ত	২৭	১৩	৩০(?)	ঐ
পাদ				
১) মণ্ডল	১০	১০	১০	ঐ
২) উৎপ্লবন	×	৫	৩৬	
৩) ভ্রমরী	স্পষ্ট উল্লেখ নাই	৭	উৎপ্লুতিকরণের অন্তর্গত	
৪) চারী	৩২	৮	৩২+৩৫+১৯	ঐ
স্থান	৬	৬	৫১	
গতি	নাট্যশাস্ত্রের ১২ অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা আছে।	১০	গতি সম্বন্ধে পৃথক্ প্রকরণ নাই।	

গ. আহার্য

অভিনয়ের তৃতীয় অঙ্গের নাম আহার্য (আ—হৃ+ণ্যৎ)। ইহার অর্থ 'আহরণীয়', 'কৃত্রিম'। অভিনয়কালে শরীরকে সৌষ্ঠবশালী ও সৌন্দর্যযুক্ত করিবার জন্য যে সকল আভরণ গ্রহণ করা হয়, তাহাই

আহার্যাভিনয়েব অন্তর্গত। আহার্যাভিনয় পুস্ত, অলংকার, অঙ্গরচনা ও সঞ্জীব ভেদে মূলতঃ চার প্রকার। অভিনয় দর্পণে কেবল অলংকারের বর্ণনা আছে। নাট্যশাস্ত্রের ২৩শ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয়দর্পণের মতে ইহার উৎপত্তি সামবেদ হইতে। কিন্তু সামবেদ সঙ্গীতাত্মক বলিয়া আহার্যাভিনয়ে প্রভৃত সঙ্গীতের সমাবেশ হয়। সঙ্গীত আবার নৃত্য, গীত ও বাদ্যাত্মক।

গীতং বাদ্যং নর্তনঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।

লোকের চিত্তরঞ্জনই সঙ্গীতের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই বলা হইয়াছে—

গীত-বাদিত্র-নৃত্যানাং রক্তিঃ সাধারণো গুণঃ।
অতো রক্তিবিহীনং যৎ তন্ন সঙ্গীতমুচ্যতে॥"

আর এই রক্তি বা রাগোৎপাদনের জন্যই গায়কগণ অভিনয়ে সঙ্গীতের অবতারণা করিয়া থাকেন।

সঙ্গীতের মূল উপাদান স্বর, যাহাকে সহজ কথায় বলে 'সুর'। এই স্বরের পরিচয় মিলে বৈদিক সাহিত্যে। বৈদিক উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর বিভিন্নভাবে রূপায়িত হইয়া সপ্তস্বরে পর্যবসিত হইয়াছে। স্বভাবজাত জন্মগত কণ্ঠস্বরকে মানুষ সপ্তসুরে এবং তাহা হইতে আরও কত প্রকার সুরে বিন্যস্ত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশী করি দান,
আমি গাই গান।" (বলাকা, ২৮ নং)

প্রাণী মাত্রের কণ্ঠগত স্বর আছে—পাখীরও আছে। কিন্তু পশুপক্ষী কেহই তাহাদের নিজস্ব স্বরকে বিভিন্নভাবে রূপায়িত করিতে পারে না। মানুষ পারিয়াছে।

সঙ্গীতের মূর্ছনা, ঝঙ্কার, তাল-লয় সব কিছুর মধ্যে এমন একটা প্রাণ-মাতানো ভাব আছে, যাহা মানুষকে বিহ্বল করে, আকুলি-বিকুলি করিয়া তোলে। মানুষ ত দূরের কথা, সঙ্গীতের সুর-মাধুর্যে ইতরপ্রাণী পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া থাকে। প্রবাদও আছে—"শিশুর্বেত্তি, পশুর্বেত্তি, বেত্তি গীতরসং ফণী।" সেইজন্য সহজ কথায় মানুষ বলে যে

সঙ্গীতে যাহার মন আকৃষ্ট না হয়, সেইরূপ লোক হইতে দূরে থাকিবে, তাহাদের হৃদয়ে পশুবৃত্তি জাগিয়া উঠিতে পারে। Shakespeare জেসিকা (Jessica) এবং লরেন্‌জো (Lorenzo)-র মাধ্যমে তাই বলিয়াছেন—

The man that hath no music in himself,
Nor is not mould with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils;
The motions of his spirit are dull as might
And his affections dark as Erebus:
Let no such man be trusted. Mark the music.

(Merchant of Venice, V. I.)

সঙ্গীতের এমন একটা ক্ষমতা ও মোহিনী শক্তি আছে যে ইহার মধ্যে মানুষ যেন পূর্বজন্মের কথা শুনিতে পায়। তাই সঙ্গীত শুনিয়া "ফলানুমেয়াঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব" তাহার "হৃদয় তন্ত্র" বাজিয়া উঠে। হংসপদিকার সঙ্গীত শুনিয়া একদিন দুষ্মন্তের হৃদযতন্ত্র আলোড়িত হইযাছিল। তিনি মনে মনে বলিযাছিলেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি॥ (শকু ৫. ২)

ইংরেজী সাহিত্যে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্সও (Charles Dickens) তাহার অলিভার টুইষ্ট (Oliver Twist)-নামক গ্রন্থে অনুরূপ উক্তি করিয়াছেন—

"Thus a strain of gentle music, or the reppling of water in a silent place, or the odour of a flower, or the mention of a familiar word will sometimes call up sudden remembrances of scenes that never were in his life; which some brief memory of a happier existence long gone by would seem to have awakened; which no voluntary exertion of mind can recall."

এই সকল কারণেই সঙ্গীত অভিনয়ে স্থান পাইয়াছে এবং একটি বিশেষ অংশ জুড়িয়া আছে। যে ভাব বাক্যের দ্বারা বা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা

প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তাহা সঙ্গীতের সুরে প্রকাশিত হয়। এই সঙ্গীতের মাধ্যমে আদিরস হইতে আরম্ভ করিয়া হাস্য-রৌদ্র-ভয়ানক-বীর প্রভৃতি সকল প্রকার রসেরই উদ্রেক হইতে পারে। বৈদিক যুগে মুনি-ঋষিরা যখন তপোবনে বাস করিয়া যাগ-যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিতেন, তখন তাঁহাদের কণ্ঠোৎগীর্ণ উদাত্তাদি স্বর ভারতের আসমুদ্র হিমাচল মন্দ্রমুখরে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সঙ্গীতের ঝঙ্কার সুদূর অতীতেই আরব, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁহার সঙ্গীত ও সংস্কৃতি নামক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। আমি তথা হইতে সার সংগ্রহ করিয়া একটি তৌলনমূলক চিত্র দিলাম।

ভারতবর্ষ	আরব	চীন[১]	জাপান	কোরিয়া
সাতটি স্বর	সাতটি স্বর সামবেদের স্বর-নামের অনুকরণে নাম	পাঁচটি স্বর	পাঁচটি স্বর (চীন ও ভারতের সংমিশ্রণে)	পাঁচটি স্বর
১। ষড়জ=স [সম্ভবতঃ প্রাকৃত প্রভাবে দন্ত্য'স']	Jek	Kung (কুঙ্)	...	...
২। ঋষভ=রি [সম্ভবতঃ প্রাকৃত প্রভাবে 'রি']	Du	Shang (সাঙ্)	...	...
৩। গান্ধার=গ	Si	Chiaos, Kyo (শিয়ো বা কিয়ো)	...	...
৪। মধ্যম=ম	Tschar	...		
৫। পঞ্চম=প	Peni	Chi (শুঃ বা Chih শিঃ)	...	...
৬। ধৈবত=ধ	Schesch	Yu (য়ু)	...	...
৭। নিষাদ=নি	Helf	...		

১—"চীন নামটির সৃষ্টি হয়েছে 'সিন' বা 'সিনাই' শব্দ থেকে—"The word of China is probably derived from *Ts'in* the name of a

এই ষড়্জাদি সাতটি স্বরের উৎপত্তি বা বিকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাদি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে পশু-পক্ষীদের ধ্বনির অনুকরণের ফলেই এই সমস্ত স্বরের বিন্যাস ও উৎপত্তি। সেই জন্য সঙ্গীত-রত্নাকরে (২।৪৪) উক্ত হইয়াছে—

ময়ূর-চাতক-চ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ-কোকিল-দর্দুরাঃ।
গজশ্চ সপ্ত ষড়জাদীন্ ক্রমাদুচ্চারয়ন্ত্যমী ॥

মাণ্ডুকী শিক্ষায়ও বলা হইয়াছে—

ষড়্জং বদতি ময়ূরো গাবো রম্ভন্তি চর্ষভম্।
অজা বদতি গান্ধারো ক্রৌঞ্চনাদস্তু মধ্যমে ॥
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলঃ পঞ্চমে স্বরে।
অশ্বস্তু ধৈবতে প্রাহ নিষাদো কুঞ্জরস্তু নিষাদবান্ ॥

নারদীয় শিক্ষাতেও ঠিক এই কথারই পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। সামান্য পার্থক্য থাকিলেও তাহা উদ্ধৃতিযোগ্য—

ষড়্জং বদতি ময়ূরো গাবো রম্ভন্তি চর্ষভম্।
অজাবিকে তু গান্ধারং ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমম্ ॥
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলা বক্তি পঞ্চমম্।
অশ্বস্তু ধৈবতং বক্তি নিষাদো বক্তি কুঞ্জরঃ ॥

অর্থাৎ সাধারণভাবে ময়ূরের নিকট হইতে ষড়্জ, গাভীর নিকট হইতে ঋষভ, ছাগের স্বর হইতে গান্ধার, ক্রৌঞ্চ হইতে মধ্যম, কোকিল হইতে পঞ্চম, অশ্ব হইতে ধৈবত এবং কুঞ্জর হইতে নিষাদস্বর গ্রহণ করা হইয়াছে।

---

dynasty, which rules over China from B. C. 249 to A.D. 220... চীনা ভাষায় ভারতবর্ষকে বলা যেত 'তায়েন-চু', 'সিন-টু' বা 'সিন'। আসলে চীনার প্রাচীন নামও 'সিন'। তাই ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি India and China পুস্তকে উল্লেখ করেছেন: 'It is not mere accident that China is still known to the outside world by a name by which India was the first to know her (*China* Sanskrit *Cina* সিন) and the Chinese nobility is called by a name derived from Senskrit *Mandarin*-Mantrin)'— স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ পৃঃ ৫৯-৬০।

এই সমস্ত স্বরের যে বিভিন্ন তারতম্য আছে, তাহা ঐ সমস্ত প্রাণীর ধ্বনির অনুকরণে সম্ভব হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ষড়জাদি সাতটি স্বরের স্থান সম্বন্ধেও নারদীর শিক্ষায় উল্লেখ আছে।

নাসাং কণ্ঠমুরস্তালু-জিহ্বা-দন্তাংশ্চ সংশ্রিতঃ।
ষড্ভিঃ সঞ্জায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড্জ ইতিস্মৃতঃ॥ ৭॥
বায়ুঃ সমুত্থিতো নাভেঃ কণ্ঠশীর্ষ-সমাহতঃ।
নর্দত্যৃষভবদ্ যস্মাৎ তস্মাদৃষভ উচ্যতে॥ ৮॥
বায়ুঃ সমুত্থিতো নাভেঃ কণ্ঠশীর্ষ সমাহতঃ।
নাসা গন্ধবহঃ পুণ্যো গান্ধারস্তেন হেতুনা॥ ৯॥
বায়ুসমুত্থিতো নাভেরুরোহৃদি সমাহতঃ।
নাভিং প্রাপ্তো মহানাদো মধ্যমত্বং সমশ্নুতে॥ ১০॥
বায়ুঃ সমুচ্ছ্রিতো নাভেরুরোহৃৎ-কণ্ঠ-শিরোহতঃ।
পঞ্চস্থানোত্থিতস্যাস্য পঞ্চমত্বং বিধীয়তে॥ ১১॥
ধৈবতং চ নিষাদং চ বর্জয়িত্বা স্বরদ্বয়ম্।
শেষাৎ পঞ্চস্বরাংশ্চান্যান্ পঞ্চস্থানোচ্ছ্রিতান্ বিদুঃ॥ ১২॥

সংক্ষেপে সার কথা এই যে—

ষড়জ—নাসিকা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছয়টি স্থান স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া উহার ঐরূপ নাম। এইরূপে অন্যান্য স্বর-গুলিরও।

ঋষভ—নাভি হইতে বায়ু উত্থিত হইয়া কণ্ঠ ও শীর্ষ স্থানে আঘাত করিয়া বৃষভের=বৃষের (অর্থাৎ ঋষভের) মতন ধ্বনি বাহির হয় বলিয়া উহার ঐরূপ নাম।

গান্ধার—নাভি হইতে বায়ু উত্থিত হইয়া কণ্ঠ ও শীর্ষ স্থানে আঘাত করিয়া পবিত্র গন্ধবৎ (বিচিত্র প্রাণমাতানো) ধ্বনি বাহির হয় বলিয়া উহার ঐরূপ নাম।

মধ্যম—নাভি হইতে বায়ু উত্থিত হইয়া উরঃ ও হৃদয়ে আঘাত করিয়া 'মহানাদ' বা গভীর শব্দের সৃষ্টি করে বলিয়া উহার ঐরূপ নাম।

পঞ্চম—নাভি হইতে বায়ু উত্থিত হইয়া উরঃ, কণ্ঠ, হৃদয়, শিরঃ ও নাভি এই পাঁচটি স্থানে আঘাত করিয়া ধ্বনি বাহির হয় বলিয়া উহার ঐরূপ নাম।

ধৈবত ও নিষাদ—এই দুইটি ধ্বনিও পাঁচটি স্থানে আহত হইয়া বাহির হয়।

(বিশদ বিবরণের জন্য স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের সঙ্গীত ও সংস্কৃতি গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য)

কিন্তু সে যাহাই হউক, সঙ্গীতের সপ্তস্বর মূলতঃ তিনটি বৈদিক স্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদাত্ত হইতে নিষাদ (=নি) ও গান্ধার (=গা), অনুদাত্ত হইতে ধৈবত (=ধ) ও ঋষভ (=রিসভ=রি), এবং স্বরিত হইতে ষড়জ (=ষা=সা), মধ্যম (=মা) এবং পঞ্চম (=পা) স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার এই সকল হইতে প্রশ্লিষ্ট, প্রতিহত, নিত্য, অভিনিহিত ক্ষৈপ্র, তৈরোব্যঞ্জন, পাদবৃত্ত প্রভৃতি বহু প্রকার স্বরের উৎপত্তি হইয়াছে।

এইভাবে উদাত্তাদি হইতে উৎপন্ন সপ্তস্বর রাগ-তাল-মান-লয়াদি বিশিষ্ট হইয়া নানা Permutation ও Combination সহযোগে আরও বহু স্বরের সৃষ্টি করে। এখন প্রশ্ন হইতেছে অভিনয়ে সঙ্গীতের কি প্রয়োজন? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে যে, মানুষের হৃদয়ে যে সমস্ত রস ও স্থায়িভাব আছে, তাহা সঙ্গীতের মাধ্যমে দর্শকের মনে দ্রুতভাবে সঞ্চারিত হয়। যাহার জন্য আঙ্গিকাভিনয়ের উৎপত্তি ও নৃত্যের সৃষ্টি, ঠিক সেই কারণেই সঙ্গীতেরও প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হইতেছে রস কয়টি ও প্রত্যেক রসের কিইবা স্থায়িভাব? এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ভরতের মতে রস আটটি, অতএব ভাবও আটটি। যথা—

[রস] "শৃঙ্গার-হাস্য-করুণা—রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥ (নাঃশা ৬,১৭)।

[ভাব] রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভযং তথা।
জুগুৎসা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥ (ঐ ৬,১৭)

বিশ্বনাথ শান্তরস সহ নয়টি রসের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

[রস] "শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসোৎভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ॥ (সাঃ দঃ ৩'১৮৭)

[ভাব] রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধাৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমো পি চ॥ (সাঃ দঃ ৩'১৮৮)

এই সমস্ত রস ও ভাবের দ্বারা চিত্তের যে অবস্থা হয়, তাহাও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে।

সঙ্গীতের দ্বিতীয় অঙ্গ নৃত্য। "নৃত্য" ও "নৃত্ত" এক নহে। 'নৃত্ত'-মার্গ ও দেশী ভেদে দ্বিবিধ। নৃত্য-ও তাণ্ডব ও লাস্য ভেদে দ্বিবিধ। তাণ্ডব আবার পেলবি ও বহুরূপ ভেদে দুই প্রকার। লাস্য-ও ছুরিত ও যৌবত ভেদে দুই প্রকার। কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থকারের মতে নৃত্যের বিভিন্ন বিভাগ আছে।

(এই সমস্ত বিষয়ের বিবরণের জন্য শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রি-সম্পাদিত 'অভিনয় দর্পণ' ও প্রাচীন ভারতীয় নর্ত্তনকলা, মাসিক বসুমতী আশ্বিন, ১৩৪৪ এবং D. R. Mankad প্রণীত The Types of Sanskrit Drama, 1936, দ্রষ্টব্য)

সঙ্গীতশাস্ত্রের আর একটি অঙ্গ হইতেছে বাদ্য। গীতকে অধিকতর মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী করিবার জন্য বাদ্যের আবশ্যক। সেইজন্য গীতের সুরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাদ্যযন্ত্রেরও বিভিন্ন স্বরের এবং তালের সৃষ্টি হইয়াছে। চীন, জাপান ও কোরিয়াতে সেইভাবেই বাদ্যযন্ত্রের নামকরণ ও স্বরের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁহার সঙ্গীত ও সংস্কৃতি গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। চীনদেশে প্রকৃতির শব্দের অনুকরণে যে সকল বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের নাম নীচে দেওয়া গেল।

প্রাকৃতিক পদার্থের শব্দ — তদনুকরণে বাদ্যযন্ত্র

১) চামড়ার শব্দ (কাউ জাতীয় বাদ্য)—য়িঙ্-কাউ (Ying kou), কিন কাউ (Kin kou), সি-কাউ (Tse kou), তাও কাউ (Tao-kou), প্যাঙ্-কাউ (Pang kou), থাই-প্যাঙ্ কাউ (Thai pang kou); চি-সিন্ (Tse-king)।

২) পাথরের শব্দ (কিঙ্ জাতীয় বাদ্য)—পিন্ কিঙ্ (Pien-king), সি-কিঙ্ (Tse-king), য়ুটি (Yu-ty), য়ু সিও (Yu-hsiao), হৈ-টো (Hai-to)।

৩) ধাতুদ্রব্যের শব্দ—চাঙ্ (Chung), লো (Lo), পো (Po), লা-পা (La-pa), হো-টুঙ্ (Hao-tung)।

৪) পশমী সুতার শব্দ—সান্-হিন্ (San-heen), য়ু-কিন (Yue-kin), হু-কিন (Hue-kin), উর-হিন্ (Ur-heen), ইয়ান্-কিন্ (Yang-kin)।

৫) কাঠের শব্দ—চু (Chu), যু (Yu), মু-যু (Mu-Yu), সোন্-পান্ (Shon pan)।

৬) বাঁশের শব্দ—পাই-হাও (Pai-hao), টি (Tye), সোন (Sona)।

৭) লাউ-কুমড়ার শব্দ—চেঙ্ (Cheng)।

৮) পোড়ামাটির শব্দ—হুয়ান্ (Hsuan)।

জাপানে যে সব বাঁশীর প্রচলন আছে তাহাদের মধ্যে ফুয়ি বা টেকি (Fuye বা Teki), রিয়ুটেকি (Riyu-teki), সাকুহচি (Shakuhachi) প্রভৃতি প্রধান। চীনদেশের ন্যায় জাপানেও চামড়ার বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন আছে। এগুলির মধ্যে ও-জুড্-জুমি (O-tzud-zumi), কো-জুড্-জুমি Ko-tzud-zumi) এবং কগুর-তৈকো (Kagure-taiko) উল্লেখযোগ্য।

কোরিয়াতে যে সমস্ত যন্ত্র প্রচলিত আছে তাহার সহিত চীন অথবা জাপানী যন্ত্রের অনেক মিল আছে।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা একটু স্বতন্ত্র ধরণের। পরবর্তীকালে অন্যজাতির সংস্পর্শে আসিয়া ইহাদের কিছু পরিবর্তন হইলেও প্রাচীনধারা একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। নিম্নে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের নাম দেওয়া গেল।

১) তার সংযোগে বাদ্যযন্ত্র—বীণা, মুরজ, তাম্বুরা, সারঙ্গ, সুর-সারঙ্গ, বেহালা, সরোদ, মুচদ, সপ্তস্বরা, একতারা, সেতার, রবাব গোপীযন্ত্র, এস্‌রাজ।

২) কণ্ঠগত বাদ্যযন্ত্র—বাঁশী, শিংঙ্গা, রামশিঙ্গা, শঙ্খ, তুবড়ী ও সানাই।

৩) হস্তগত বাদ্যযন্ত্র—কাঁসর, ঘণ্টা, করতাল, খরতালী, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, তবলা, খোল, জোড়খাই, ঢাক, ঢোলক, ডমরু, নাগড়া, জগঝম্প, খঞ্জনী ও মাদল।

ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রের কয়েকটি নামও এই প্রসঙ্গে দেওয়া গেল—

একর্ডিয়ান্, ইওলিয়ান্ হার্প, টেনার, বাসুন্, বিউগল্, প্যাণ্ডিয়ান্ পাইপস্, ব্যাগপাইপ, ক্যাষ্টানেটস্. এ্যান্‌সয়েণ্ট' সিম্বাল, ক্ল্যারিওন, ক্ল্যারিওনেট, কন্‌সার্টিনা, ড্রাম, গিটার, ফ্লাজিওলেট্, ফ্লুট্, হট্‌বয়, ডবি, হার্ডিগার্ডি, ফ্রেঞ্চ হর্ণ, লায়াল, হাণ্টিং হর্ণ, লিউট্, অর্গান্, ওকিক্লিডি, কেটলড্রাম, হার্প, ট্রাঙ্গেল, ট্যাম্বুরিন্, সার্পেণ্ট, ট্যাম্‌ট্যাম্, ট্র্যাঙ্গেল রড্, কর্ণেট-এপিষ্টন, ট্রাম্পেট, ভাওলিন, ট্রম্বোন, সোনোমিটার ও জিথার।

সঙ্গীতশাস্ত্র (গীত, নৃত্য ও বাদ্য) আহার্যাভিনয়ের অন্তর্গত হইলেও 'আহার্য' (নেপথ্যবিধান) বলিতে মূলতঃ পুস্ত, অলংকার, অঙ্গরাগ ও সঞ্জীবকে বুঝায়। পুস্ত (পুস্তাতে ইতি ঘঞ্) বলিতে সাধারণতঃ 'মৃত্তিকা, দারু, বস্ত্র, চর্ম বা লৌহ দ্বারা যে সকল দ্রব্য নির্মিত হয়, তাহাদের বুঝায়। অমর টীকায়[১] আছে—

মৃদা বা দারুণা বাথ বস্ত্রেণাপ্যথ চর্মণা।
লৌহরত্নৈঃ কৃতং বাপি পুস্তমিত্যভিধীয়তে॥

কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে পুস্ত বলিতে সাধারণতঃ "রঙ্গমঞ্চে যে সকল কৃত্রিম বৃক্ষ, পর্বত, যান, বিমান, চর্ম, ধ্বজ প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়", তাহাদের বুঝায়। সেইরূপ অলংকার বলিতে "মাল্য, আভরণ ও বস্ত্রাদি" বুঝায়। অঙ্গরাগ বলিতে "দেশ, জাতি ও বয়স অনুসারে বর্ণ-বিধান (painting)" বুঝায় এবং "রঙ্গমঞ্চে অপদ, দ্বিপদ, চতুষ্পদ প্রভৃতি প্রাণিগণের প্রবেশ প্রদর্শনকে সঞ্জীব বলে।"[২]

ঘ. সাত্ত্বিক

অভিনয়ের চতুর্থ অঙ্গের নাম সাত্ত্বিক। ইহার সাধারণ অর্থ 'সত্ত্ব-ভাবময়', ভরতের মতে 'সত্ত্বমনঃপ্রভব'। যে ভাব চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদনে সক্ষম হয়, তাহাই সাত্ত্বিকভাব। ইহা রসের সহায়ক। ইহার উৎপত্তিস্থল অথর্ববেদ। অথর্ববেদে মারণাদি অভিচার-কর্ম-প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া উহা রসপ্রধান। সাত্ত্বিকাভিনয়ে রসের

১। বিশ্বকোষে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে উহার আধারস্থল হিসাবে 'অমর টীকা ভরত' বলা হইয়াছে। পুস্ত সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণের জন্য অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত "Pusta Sanskrit Dramatingy, Our Heritage, Vol—IX, part II, 1961, পৃঃ ৭৭—৮৩ দ্রষ্টব্য।

২। শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত অভিনয় দর্পণ, পৃঃ ২৫ দ্রষ্টব্য। বিশেষ বিবরণের জন্য তাঁহার প্রাচীন ভারতে রঙ্গসজ্জা, বঙ্গশ্রী, আশ্বিন, ১৩৪২ দ্রষ্টব্য।

অভিব্যক্তি হয় বলিয়া উহা অথর্ববেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্ত্বিকভাব মূলতঃ আটটি—

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥ (অঃ দঃ ৪১)।

নাট্যশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—

স্বেদঃ স্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বিবর্ণমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ মতাঃ॥

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, স্থায়িভাব ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা সত্ত্বোদ্রেক হইলেও এই আট বিভাবের উৎপাদনে চিত্তের যে একাগ্রতা প্রয়োজন, তাহা স্থায়ি-ভাব ও ব্যভিচারিভাবে নাও থাকিতে পারে। চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত সাত্ত্বিকভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ঐ দুইটি ভাবে চিত্ত অন্যমনস্ক থাকিলেও কিছু পরিমাণে ঐ দুই ভাবেরই উদয় হয়। সেইহেতু এই আটটিকেই সাত্ত্বিকভাব বলিয়া ধরা হইয়াছে।

ঙ. গতি ও স্থিতি

অভিনয়দর্পণে গতি ও স্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বিভিন্ন অবস্থার পাত্র-পাত্রীর কিরূপ গতি ও স্থিতি হওয়া উচিত, তাহার আলোচনাই এই অংশে পাওয়া যাইবে। দর্শকের মনে রেখাপাত করিতে হইলে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পাত্র-পাত্রীর যে বিভিন্ন অবস্থান ও গতি হওয়া উচিত—তাহাই গতি ও স্থিতির লক্ষণ।

অভিনয়ের এই চারটি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রাচীন ভারতের অভিনয় ক্রিয়া সম্পাদিত হইত। বর্তমান কালের অভিনয়েও মূলতঃ এই চারটি অঙ্গেরই অনুসৃতি দেখা যায়।

ধর্মমঙ্গলের ময়না কোথায় ?

অক্ষয়কুমার কয়াল

ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেনের রাজধানী ময়নার অবস্থান লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিতর্কের শেষ নাই॥ কেহ কেহ ইহাকে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুকের ময়নাগড় মনে করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ-বা বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের অদূরবর্তী ময়নাপুর অনুমান করিয়াছেন। 'শূন্য-পুরাণে'র (১৩৩৬ ; বসুমতী সংস্করণ) ভূমিকায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"তমলুক বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে ধর্মশিলা বা ধর্মপূজক পণ্ডিতবংশের প্রাধান্য নাই। সুতরাং আমি এই স্থানটি লাউ-সেনের রাজধানী ময়নানগর বলিয়া মনে করিতে পারি না।...আমার মনে হয় ময়নাপুরই ময়নানগর।" (ভূমিকা পৃঃ ৭৩) 'নন্দবংশে' (১৩৩৭) ময়নাপুর অধ্যায়ে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—"ময়নাগড় বলিয়া যে গ্রাম গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে (লাউসেনের পিতাকে) প্রদান করিয়া-ছিলেন তাহা ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বর্ণিত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ময়নাগড় নয়। বস্তুত ইহা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ময়নাপুর গ্রাম। কারণ ধর্মমঙ্গলোক্ত 'হাকন্দ' ও রামাই পণ্ডিত প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ ঠাকুর এই ময়নাপুরে আছেন। ...ধর্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপার এই ময়নাপুরেই ঘটিয়াছিল এবং এই ময়নাপুরই তাঁহার (লাউসেনের) পিতা গৌড়েশ্বরের নিকট 'ময়নানগর' নামে প্রাপ্ত হন। ময়নাগড়ে হাকন্দ পুষ্করিণী ও ধর্মরাজ ঠাকুর নাই।" (পৃঃ ৪—৫)

অপরপক্ষে 'হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়' (১৩২১)-এর ঐতিহাসিক অম্বিকা-চরণ গুপ্ত লিখিয়াছেন—"ময়না হইতে গৌড় যাইবার যে পথের পরিচয় আছে, তাহাতে এই ময়নাগড় (তমলুকের) বই সদর ময়নাপুরকে কিছুতেই বুঝায় না,—

> কাশীজোড়া কৃষ্ণপুরে কতদূরে রাখি।
> বেগবন্ত ধায় চোর যেন বাজপাখী॥

কাশীজোড়া কৃষ্ণপুর তমলুক মহকুমায়। কাশীজোড়া সদর ময়নাপুরের

পথে নহে।" (পৃঃ ৯৪—৯৫) আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রথমে তমলুক-ময়নাকে কর্ণসেন বা লাউসেনের রাজধানী মনে করিয়াছিলেন (ধর্মের গান কত কালের ? প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৩১), পরে উহা 'ঘাটালের (মেদিনীপুর) নিকট' বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার শেষোক্ত মতটি উদ্ধৃত করিতেছি— "লাউসেনের ময়নাভুবন কোথায় ছিল ? বর্তমান গড় ময়না তমলুক হইতে নয় মাইল পশ্চিম দক্ষিণে, কাঁসাই নদীর নিকটে। কিন্তু ঘনরাম, মাণিকরাম পথের যে নাম করিয়াছেন, তাহাতে তমলুকের নাম নাই। এক নদী কালিন্দী গঙ্গার অপর পারে ময়না ছিল। এই নদীর নিকট পহুঁছিতে পদুমার বিল পার হইতে হইত। এই কয়েকটি স্থান স্মরণ করিলে মনে হয় লাউসেনের ময়না শিলাই নদীর অপর পারে ঘাটালের নিকট ছিল।...ময়নাগড়ের কিছু পূর্বদিকে দোবান্দা-কালাগও়া নামক গ্রামে এক মাহিষ্যপণ্ডিতের বাড়ীতে এক ধর্মরাজ আছেন।" (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৮, পৃঃ ৮০ ও ১৩৪ দ্রষ্টব্য) 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-লেখক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পর্যন্ত বাঁকুড়া-ময়নাপুরের পক্ষে মতপ্রকাশ করিয়াছেন, তৃতীয় সংস্করণ হইতে মতপরিবর্তন করিয়া তমলুক-ময়নাকেই সমর্থন করিতেছেন। (২য় সংস্করণ পৃঃ ৫৩১ ও ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৫৯৩ দ্রষ্টব্য)

এই সব মতামতের ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৩৬৩)—লেখক শ্রীবিনয় ঘোষ ময়না প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"লাউসেন ও রামাই পণ্ডিতকে নিয়ে ময়নাপুর (বাঁকুড়া) ও ময়নাগড়ে (মেদিনীপুর) যে দ্বন্দ্ব সেই একই দ্বন্দ্ব কবি চণ্ডীদাসকে নিয়ে ছাতনা (বাঁকুড়া) ও নান্নুরের (বীরভূম) মধ্যে রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে এই বাদপ্রতিবাদ চলে আসছে। এখানে সেরকম কোন বিতর্কের অবতারণা করবার কোন ইচ্ছা নেই আমার এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোরও সাধ্য নেই।" (পৃঃ ৯৯)

দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ময়নার অবস্থান লইয়া যে পরিমাণ বিতর্ক হইয়াছে, তাহার এক-চতুর্থাংশ প্রচেষ্টাও সত্যনির্ণয়ের জন্য হয় নাই। সত্যানুসন্ধানী দু'একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছাড়া কেহই প্রাচীন পুথিপাঠের কষ্টস্বীকার করেন নাই। যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে এত বিতর্কের প্রয়োজন হইত না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

আমরা ধর্মমঙ্গল কাব্যের যত্রতত্র হইতে ময়নার কথা উদ্ধৃত

করিতেছি। ধর্মমঙ্গলের প্রাচীন কবি, সম্ভবত বীরভূম-নিবাসী শ্রীশ্যাম-পণ্ডিত লাউসেনের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

ময়না দক্ষিণ দেশে উৎকল বলিয়া ঘোষে
সেই দেশেতে মোর স্থিতি
পূজা করি যুগপতি মাতা মোর রঞ্জাবতী
লাউসেন আমার খেয়াতি।

(শ্রীসুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ডে ধৃত, ১৩৫৫, পৃঃ ৫১৪)

ধর্মমঙ্গলের প্রধান কবি, কাইতি-শ্রীরামপুর (বর্ধমান)-নিবাসী রূপরাম চক্রবর্তী (১৬৪৯-৫০) স্বর্গারোহণ পালায় বলিতেছেন—

নানা বর্ণে বাদ্য বাজে ওৎকল ময়না।
স্বর্গ যায় লাউসেন পড়িল ঘোষণা॥

(সাহিত্যপরিষৎ পুথিসংখ্যা ২৫৬০, পৃঃ ৩৬৭ খ)

সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাঁকুড়া—সুখসাযেরের কবি সীতারাম দাস আখড়া পালায় লাউসেনকে অভয়ার ছলনা বর্ণনা করিতেছেন—

না পাইল নাগর পরাণে হল্য শোক।
হাসিতে হাসিতে রাজা আলাও তমলোক॥
তমলোকে তোমার পালাও সমাচার।
এত বলি নয়নে ইঙ্গিত একবার॥

(সাহিত্যপরিষৎ পুথিসংখ্যা ২৫৬২, পৃঃ ১৪ ক)

পুথিখানি প্রাচীন। "সন ১০৬০ (মল্লাব্দ) মধুমাসের ১৮ দিবসে সমাপ্ত"।

মল্লভূমের (বাঁকুড়া) কবি শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র (ইনি রাজা রঘুনাথের আমলে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। রঘুনাথের সময় ১৭০২-১২) জাগরণ পালায় লিখিতেছেন—

নীলগিরি দূরে রাখি উৎকলের দেশে।
বহুশ্রমে ময়না পাইল দিবাশেষে॥

(সা, প, পুথিসংখ্যা ২৬৭১, পৃঃ ৬০ খ)

বর্ধমান-শাঁখারির কবি নরসিংহ বসু (১৭১৪-১৫) তাঁহার কাব্যে যত্রতত্র ময়নাকে উৎকলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াছেন। দু'একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রঞ্জার বিভা পালায় মহামদের অগোচরে বৃদ্ধ কর্ণসেনের সঙ্গে

রঞ্জার বিবাহ দিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে দূরদেশে বসতিস্থাপনের পরামর্শ দিতেছেন—

দক্ষিণে দ্রাবিড় দেশ সমুদ্রের ধার।
উৎকল ময়না গ্রাম নিকটে তাহার॥
তোমাকে দিলাম আমি তার অধিকার।
অবিলম্বে যাহ তথা লয়্যা পরিবার॥

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিসংখ্যা ৫২২৫, পৃঃ ৩৮ ক)

ঐ ধর্মমঙ্গলেরই হস্তীবধ পালায় লাউসেন গৌড়েশ্বরের নিকট আত্মপরিচয় দিতেছেন—

লাউসেন বলে রায় নিবেদি তোমার পায়
অবধানে শুন নরপতি।
উৎকলে ময়না গ্রাম সেখানে আমার ধাম
মাযের আথান বঞ্জাবতী॥ (ঐ, পৃঃ ৬২ খ)

বাঁকুড়ার চামোট-নিবাসী বাঁড়ুজ্যে (১৭৩১ ৩৩) দেবদেবীর বন্দনা গাহিতেছেন—

সেতুবন্ধ রামেশ্বর বন্দিব সাদরে।
অনকোটি শিব বন্দ সলতা* ময়নাপুরে॥

(সাহিত্য সংহিতা, অগ্রহায়ণ ১৩১৩ পৃঃ ৪)

[* মুদ্রিত পাঠ—সনতা; প্রাচীন পুথিতে 'ন' ও 'ল' অক্ষরের তফাৎ সর্বত্র রক্ষিত হয় না।] রামচন্দ্রের ধর্মমঙ্গলে গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে বলিতেছেন—

মহাপাত্র শুনিলে হবেক সর্বনাশ।
চণ্ডরা মযনায তুমি করগে নিবাস॥ (ঐ মাঘ, ১৩১৫, পৃঃ ২০)

বাহুল্য ভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম না। উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, লাউসেনের ময়না উৎকলের অন্তর্গত ছিল। মেদিনীপুর জেলার সহিত উৎকলের সম্পর্কের কথা সকলেই জানেন। বাঁকুড়ার সে দাবী নাই। রামচন্দ্র বাড়ুজ্যে বাঁকুড়ার সলদা ময়না ও তমলুকের চণ্ডরা ময়না দুইটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। চণ্ডরা গ্রাম বর্তমান তমলুক-ময়নাগড়ের অদূরেই। বাঁকুড়ার কবি সীতারাম দাস তো সরাসরি তমলুকেই লাউসেনের রাজধানী বলিয়াছেন।

প্রকাশিত ধর্মমঙ্গল গ্রন্থ হইতেও ময়নার অবস্থানের ইঙ্গিত পাওয়া কঠিন নয়। সর্বাধিক প্রচারিত ঘনরামের ধর্মমঙ্গল হইতে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। হস্তীবধ পালায় লাউসেন গৌড় হইতে ময়না প্রত্যাবর্তন করিতেছেন—

লঘুগতি নৃপতি রমতি রাখে দূর।
পার হলো পদ্মাবতী পেলে শীতলপুর॥ ৪৭৮
এড়াল অলকানন্দা স্নানপূজা করি।
বালিঘাট গোলাহাট রাখে ত্বরাতরি॥ ৪৭৯
জামতি জালন্দা রাখি যান অবিশ্রাম।
দিনেক মঙ্গলকোটে করিলা বিশ্রাম॥ ৪৮০
প্রভাতে সাজিয়া সেন আইসে ত্বরায়।
কালুতক কর্জনা পশ্চাৎ করি যায়॥ ৪৮১
বর্ধমান সহর বাজার ডানি বামে।
দামুদর দাখিল দিবস দুই যামে॥ ৪৮২...
উড়ের গড় এড়াল আমিলা উচালন।
রাঙামেটে রাখি ধরে ময়না রঙ্গন॥ ৪৮৪ [ময়নার গন ?]
মান্দারণ গড়খানা রাখি ডানি ভাগে।
প্রদোষে প্রতাপপুর প্রবেশিলা আগে॥ ৪৮৫
সেদিন সেখানে রন, থাকে বান্ধা ঘোড়া।
পরদিন প্রভাতে পেরোন কাশীজোড়া॥ ৪৮৬
কুতবপুর রাখি দূর পরম সন্তোষ।
পদ্মমার বিল রাখে উভ ষোলক্রোশ॥ ৪৮৭
পেরিয়া কালিন্দীগঙ্গা প্রবেশে ময়না।
আনন্দ বাধাই শুনে ধায় সর্ব্বজনা॥ ৪৮৮
পেরিয়া কালিন্দীগঙ্গা প্রবেশে ময়না।
আনন্দ বাধাই শুনে ধায় সর্ব্বজনা॥ ৪৮৮

(১ম সংস্করণ, ১২৯০, পৃঃ ৪৫৩-৫৪)

উদ্ধৃত অংশে দেখা যায়, বাংলাদেশে একাধিক ময়নার অস্তিত্ব আছে।: উহাতে কুতবপুর, কাশীজোড়া ও ময়না—তমলুক মহকুমার এই তিনটি পরগণা পাশাপাশি উল্লিখিত হইয়াছে—প্রতাপপুর ও শুপ্ত মহাশয়-উদ্ধৃত

কৃষ্ণপুর গ্রামের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। একই নামের বিভিন্ন গ্রাম থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু তমলুক মহকুমার তিনটি বিখ্যাত স্থানের সমাবেশ দেখিয়া একথা ভাবিতে ইচ্ছা হয় যে, ধর্মমঙ্গলের ময়না তমলুক মহকুমার মধ্যেই কোথাও হইবে।

ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের রাজ্য ময়না, ময়নানগর, ময়নাভুবন, ময়নামণ্ডল, দক্ষিণ ময়না, ময়নাগড় প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা বর্তমান তমলুক-ময়নাগড় না হইলেও ইহারই নিকটবর্তী কোনও স্থান হইতে পারে। আমরা এ পর্যন্ত যে সব তথ্য উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে তমলুকের দাবীকে অস্বীকার করা যায় না।

তমলুক মহকুমায় ব্যাপকভাবে না হইলেও ধর্মপূজার প্রচলন আজও আছে। (যোগেশচন্দ্র বসুর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য) না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না।

লোকবৃত্ত

শঙ্কর সেনগুপ্ত

ইংরেজী Folklore-এর ভারতীয় প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকবৃত্ত'কে গ্রহণ করে যে সব শ্রদ্ধেয় ও সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণের সঙ্গে সহমত হওয়া গেল না তাঁদের দেওয়া প্রতিশব্দগুলোর কিছু এই মুহূর্তে স্মরণ হচ্ছে। যেমন—'লোকবিদ্যা' (রমাপ্রসাদ চন্দ); 'লোকযান' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়); 'গ্রামসাহিত্য' ও 'গ্রামগীত' (রামনরেশ ত্রিপাঠী); 'লোকবার্তা' (বাসুদেবশরণ আগরওয়ালা); 'লোকবিজ্ঞান' (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্), 'লোকচর্যা' (সুকুমার সেন); 'লোকশ্রুতি' (আশুতোষ ভট্টাচার্য); 'লোক সংস্কৃতি' (কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়); 'লোকবাঙময়' (কেশরী নারায়ণ শুক্ল); 'জন সাহিত্য' (প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী) প্রভৃতি। এদের মধ্যে 'লোকযান' ও 'লোকবিজ্ঞান' নিয়ে বেশী আলোচনা হয়েছে এবং এই দুটো নামে গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে নতুন আবার একটি প্রতিশব্দের প্রয়োজনীয়তা কী? জবাবে বিনীত নিবেদন করা যেতে পারে যে এখনও Folklore-এর সর্ববাদীসম্মত কোন প্রতিশব্দ গ্রহণ করা হয় নি। এমতাবস্থায় বিদ্বৎ সমাজের বিবেচনার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'হীনযান', 'মহাযান'-এর অনুকরণে 'লোকযান' গ্রহণ করে আমাদিগে নতুন চিন্তার অবকাশ করে দিয়েছেন। 'হীনযান', 'মহাযান'দের কথা উঠলেই বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেদের কথা আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। এবং সেদিক থেকে 'লোকযান' লোকধর্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, লোকধর্ম Folklore-এর একটি অংশ। এই অংশকে সমগ্রর স্থানে নিয়ে আসা বোধহয় ঠিক হবে না। 'লোকবিজ্ঞান' যুক্তির দুর্বলতা এই যে, Folklore মানবীয় সামাজিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিকতার উপাদানে পূর্ণ। Folklore-এর সঙ্গে নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা যখন দেখি তখন আমরা Folklore কে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করতে পারলে

সুখী হই। কিন্তু যখন সাহিত্য, নাচ, গান, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন, কথা, কাহিনী প্রভৃতি সুকুমারকলাগুলোর প্রতি আমাদের নজর পড়ে তখন Folklore কে বিজ্ঞানের রাজ্যে ফেলে রাখতে ইচ্ছে হয় না। সুতরাং প্রথমেই ঠিক করা দরকার যে, Folklore এর মধ্যে বিজ্ঞানের স্থান কতটা, কলাবিদ্যার অংশ কতটা। তারপরই 'লোকবিজ্ঞান'-এর দাবী বিবেচনা করা যেতে পারে। এইসব দিক বিবেচনা করেই আমাদের প্রস্তাব 'লোকবৃত্ত'। কারণ Folk অর্থাৎ 'লোক'কে বৃত্ত করে যে জ্ঞান (Lore) তাই Folklore বা 'লোকবৃত্ত'।

আধুনিক পণ্ডিতেরা Folklore কে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন। (১) Formalised Folklore ও (২) Materialised Folklore. সূচীশিল্প, হস্তশিল্প, মৃৎশিল্প, কারুকলা ও যাবতীয় কারু ও লোকশিল্পাদি Formalised Folklore এর মধ্যে পড়ে। দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে লোকসাহিত্য বলতে যা বুঝি—লোককাহিনী, ছড়া, পালাগান, কিংবদন্তী, প্রবাদ প্রভৃতি।

আমাদের দেশের বিদ্বৎ ও উৎসাহী সমাজের কিছু ব্যক্তি লোকবৃত্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও লোকবৃত্ত অধ্যয়নের পরিপ্রেক্ষিতটিকে যে বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে লোকবৃত্তের বিচরণ সেদিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারছেন না।

প্রত্যেক জনসমষ্টির মধ্যেই স্মরণাতীত যুগ থেকে বহু পুরাণ কাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। ঠিক কখন যে সেগুলোর উৎপত্তি বা কারা সেগুলোর রচয়িতা তা জানবার উপায় নেই। যদিও ভ্যান গেনেপ বলেছেন, ফরাসী কৃষিজীবীরা নেপোলিয়নের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী ভুলে গেছে। তাই মন্তব্য করেছেন যে, অলিখিত ঘটনার স্মৃতি দুশ বছরের বেশী নয়। 'দি হিরো'-র গ্রন্থকার লর্ড র‍্যাগলানের মতে এই সময়ের দৈর্ঘ্য একটু বেশী ধরা হয়েছে। "অনেক ভেবে চিন্তে আমি এই কাল পরিধি দেড়শ' বছর বলে নির্ধারণ করেছি। বিভিন্ন ভাবে আমি এই মোটামোটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমার ঠাকুর্দা ঠাকুরমা বা তাঁদের মাতাপিতাদের স্মৃতি খুব সযত্নে বিশ্লেষণ করে আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর একশ বছরের মধ্যে তাঁর জীবনের অলিখিত ঘটনা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বাধ্য।" তাই

র‍্যাগলান মনে করেন কোন ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি দেড়শ বছরের বেশী স্থায়ী হতে পারে না। এবং যদি এর অধিক কাল রক্ষিত না হয় তবে তা কিংবদন্তী হতে পারে না। আর এজন্যই কিংবদন্তীমূলক কাহিনীর উৎস আচার-অনুষ্ঠান বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন, "কিংবদন্তীর ঐতিহাসিকত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই"। উইলিয়ম ব্যাসকম 'জার্নাল অব দি আমেরিকান ফোকলোর'-এর এপ্রিল-জুন, ১৯৫৭, ৭০ খণ্ড, ২৭৬-এ The Myth Ritual Theory নাম দিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে র‍্যাগলানের ইতিহাস বিরুদ্ধ যুক্তির বজ্র আঁটুনির জবাবে উদ্ধৃতি সহকারে দেখিয়েছেন যে, লৌকিক কাহিনীতে বিস্তারিত ঐতিহাসিক ঘটনা দু' শতাব্দীরও অধিককাল কিংবদন্তীরূপে প্রচলিত ছিল। ব্যাসকমের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া গেছে হাইন্‌শ্‌ মোদের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিগত ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের ভাষণে। তিনি বলেছিলেন —Folktales are the best archaeological materials to reconstruct the history of India. জর্মন পণ্ডিত ডঃ মোদের বক্তৃতা সুধীজন কর্তৃক বিশেষ প্রশংশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে বাংলার লোকসাহিত্যের পণ্ডিত ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত…"লোকসাহিত্য সমসাময়িক সাহিত্য, ইহার মধ্য হইতে পুরাতত্ত্ববিদের কৌতূহল নিবৃত্তির কোন অবিমিশ্র উপকরণের সন্ধান পাওয়া যাইবে না।…লোকসাহিত্যের মধ্যে অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপাদান লাভ করিবার উপায় নাই—বিশেষ একটি যুগ কিংবা বিশিষ্ট একটি সমাজের চিত্র ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় না; ইহার মধ্যে একাধারেই অতীত যুগের ঐতিহাসিক চিত্র যেমন প্রকাশ পাইতে পারে, তেমনই সমসাময়িক কালের নিতান্ত অর্বাচীন চিত্রও প্রকাশ পাইতে পারে—কিন্তু উভয়ই এখানে সমান অস্পষ্ট হইয়া পাশাপাশি অবস্থান করে। অস্পষ্টতাই যাহার ধর্ম, তাহার কোনও ঐতিহাসিক দাবী থাকিতে পারে না।" ডঃ ভট্টাচার্যের উক্তির প্রধান দুর্বলতা, মুখে মুখে প্রচলিত কিংবদন্তী সর্বৈব ঐতিহাসিক সত্য নয় বলে তা ইতিহাস-নির্ভর হতেই পারে না এমন কথা বলা চলে না। এমন কি কোন কাহিনী যদি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্য বিরোধী হয় তবুও সেটি বা অন্য কোন কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই একথা প্রমাণিত হয় না। ব্যাসকম বলেন "আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে যাবতীয় কাহিনীর

ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, অথবা সে সবৈব ঐতিহাসিক, একথা আমি ভাবি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, মানবীয় সামাজিক পরিবেশ বা অন্য ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে কিছু কাহিনীর উদ্ভব হতে পারে এবং মুখে মুখে প্রচলিত কিংবদন্তীতে ঐতিহাসিক ঘটনার অনুপ্রবেশও সম্ভব।"

লোকবৃত্তের সঙ্গে জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। লোকমানসে সৃষ্টিপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। লোকসাহিত্য অধ্যয়নের দ্বারা সেই প্রবাহে শক্তিশালী গতি সঞ্চার করা যেতে পারে। লোকবৃত্তের মধ্যে প্রাচীনতম ছড়া। ছড়া নানা জাতের। আমাদের ছেলেভুলানো ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্ভবত শিশুকে এক মহামূল্য সম্পদরূপে কল্পনা করায়। এর উৎস এমন এক সমাজ থেকে যারা অতি মাত্রায় পুরুষ নির্ভর এবং ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন পুত্র সন্তানের প্রতি যাদের ছিল প্রবল আকর্ষণ। তাই দেখি, অধিকাংশ ছড়ারই নায়ক পুত্র সন্তান। এগুলো গ্রাম্য মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-তামাসার, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের অনাবিল, অকৃত্রিম ও অনায়াসসৃষ্টি। ভাষার মধ্যে আছে সহজতা, সরলতা, প্রাঞ্জলতা, প্রসাদগুণ ও অনায়াসগতি। এর মধ্যে লুক্কায়িত আছে জাতির ইতিহাস, ধর্ম কাহিনী, রীতিনীতি, আচার-আচরণ, বিদ্রূপ-রসিকতা প্রভৃতি।

ছড়া ও প্রবাদ বাক্যগুলোর রচয়িতা এবং রচনাকাল অজ্ঞাত। কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই যে বয়ীয়সী নারীদের রচনা তা বেশ বোঝা যায়। এর মধ্যে কোন ক্রমিকতা নেই। নিশ্চিত একনিষ্ঠতা নেই। অনবরত পুনর্নির্মাণ লোকমানসনির্ভর আনন্দের প্রশ্রয়ে যুগে যুগে এর বিকাশ ঘটেছে।

লোকবৃত্তের সংগ্রহ মানে লোকবৃত্তের নতুন জীবন দান নয়। এ সংগ্রহের দ্বারা আমরা জীবন বিকাশের পরিচয় সন্ধান করি। ঐতিহ্যের মূল্য নির্ণয় করি। তাই লোকবৃত্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ন্যায় পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। কারণ লোকবৃত্তের আলোচনায় আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টির মনের ক্রমবিকাশের ধারা, সমাজের গঠন ও রূপপ্রকৃতি, জাতির উৎপত্তি, সংস্কৃতির বুনিয়াদ, সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ এবং সাহিত্যের উপাদান লাভ করি।

লোক কাহিনীর মধ্যে আদিম যুগ থেকে সুরু করে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সমসাময়িক মানুষের চেতনা ও বিশ্বদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া

যায়। এবং "ভূতত্ত্ববিদেরা একখানা দাঁত বা একখানা হাড় অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের এক একটা নূতন পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া ফেলেন। সেইরূপ ভবিষ্যতে কোন গ্রীম বা মোক্ষমূলার এই বাঙালীর ছেলের ছেলেমি ভাণ্ডারের মধ্য হইতে দু একটা নাম বা শব্দ বা বাক্য অবলম্বন করিয়া বাঙালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসের কোন বিস্মৃত অধ্যায় আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন কিনা জানি না,...কিন্তু এই সকল লুপ্তপ্রায় স্মৃতি চিহ্নগুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে ও বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার ভার সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপরই রহিয়াছে। এ বিষয়ে অবহেলা করিলে আমরা ভবিষ্যতের নিকট মার্জ্জনার অধিকারী হইব না, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই" (রামেন্দ্রসুন্দর)। কিন্তু জাতীয় চেতনার এই দিকের কথা ভুলে গিয়ে আমাদের সংগ্রাহক পণ্ডিত ও কর্মীদের বেশ কিছু অংশ এমন ভাবে ভেজালের শিকার হচ্ছেন যার সুদূরপ্রসারী ফল ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এঁদের গবেষণা কর্মের উপর নির্ভর করে কোন শব্দ বা বাক্য নিয়ে কাজ করলে পরবর্তী গবেষকদের বিস্তর ঝুঁকি নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লোকসাহিত্য সংগ্রাহক বন্ধুবর শ্রীচিত্তরঞ্জন দেবের সৌজন্যে বাংলার লোকসঙ্গীত সম্পর্কে কিছু তথ্য উদ্ধৃত করা গেল :

১। শচীন দেববর্মনের "নিশীথে যাইও ফুল বনেরে ভোমরা" গানটি যে দিন থেকে রেকর্ড করা হল সেদিন থেকে সকলেই জানেন, এটি একটি প্রেম-বিরহ ও মিলন-বিচ্ছেদের গান। আসলে গানটি মুর্শিদি। গায়ক-সুফী ও দরবেশ শ্রেণীর লোকেরা। মূল গানটি—

নিশিথে যাইও ফুলরে মন ভোমরা
নিশিথে যাইও ফুল বনে
আমি জ্বালায়ে দিনের বাতি গো
আমি জেগে রব সারা রাতি
কব কথা প্রাণ বন্ধুর সনে···ইত্যাদি

অথচ গানটি পরিবেশিত হয়েছে এইরূপ—

নিশিথে যাইও ফুল বনেরে ভোমরা
নিশিথে যাইও ফুলবনে

আমি জ্বালায়ে চাঁদের বাতি গো
জেগে রব সারা রাতি
কব কথা শিশিরের স-ন.. ইত্যাদি।

মূল গানের অর্থ: যখন আমার জীবন শেষ হয়ে আসবে তখন হে আমার ঈশ্বর, আমি শুধু তোমার নামকীর্তন করে তোমার কথাই ভাববার অবকাশ পাব। আমার ভিতর যে পরমাত্মা বিরাজ করছেন সেইত আমায় তোমার কাছে পৌঁছে দেবার সকল ব্যবস্থা করবে। কিন্তু পরিবেশিত গানটির অর্থ দাঁড়িয়েছে—কোন প্রেমিকা তার প্রেমাস্পদের জন্য চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে বিরহের নিশি যাপন করছে। সে শিশিরের সাথে কথা বলতে চাইছে।

২। আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীত ছড়া (নচিকেতা ঘোষের সুর):

হাট্টিমা টিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং, তারা হাট্টিমা টিম টিম।
তাঁতীর বাড়ি ব্যাঙের বাসা, কোলা ব্যাঙের ছা
খায় দায় গান গায়—তাইরে নাইরে না।
চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদমতলায় কে?
হাতী নাচছে, ঘোড়া নাচছে সোনামণির বে,
ওরে সোনামণির বে।
খোকন খোকন করে মায়, খোকন গেছে কাদের নায়?
সাতটা কাকে দাঁড় বায় খোকনরে তুই ঘরে আয়।
আদুর বাদুর চালতা বাদুর কলা বাদুরের বে
টোপর মাথায় দে—দেখতে যাবে কে?
চামচিকেতে বাজনা বাজায় খ্যাংরা কাটি দে
খোকা গেছে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে
ছিপ নিয়ে যায় কোলা ব্যাঙে মাছ নিয়ে যায় চিলে।
খোকন খোকন করে মায়, খোকন গেছে কাঁদের নায়?
সাতটা কাকে দাঁড় বায়, খোকনরে তুই ঘরে আয়।

উপরোক্ত গানটি চারটি চলতি ছেলে ভুলানো ছড়ার সংমিশ্রণ (তাও আবার ইচ্ছে মত শব্দ বদলান) যাকে বলে, 'পাঞ্চিং"। এবার

ছড়াগুলো দেখুন :

১। হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম টিম।

২। চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদমতলায় কে ?
হাতী নাচছে ঘোড়া নাচছে
সোনামণির বে।

৩। খোকন খোকন করে মায়
খোকন গেচে কাদের নায় ?
সাতটি (সাতটা নয়) কাগে (কাকে নয়) দাঁড় বায়
খোকনরে তুই ঘরে আয়
(দুধ মাখা ভাত কাগে খায়।)

৪। খোকা (খোকন) গেছে মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে
ছিপ নিল কোলা ব্যাঙে
মাছ নিল চিলে।
(খোকন বলে পাখিটি কোন বনে চরে
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।)

(বন্দর, শারদীয় ১৯৫৭)

আরও কিছু উদাহরণ শ্রীযুক্ত দেবের সৌজন্যেই রাখা গেল। অভিযোগ গুলো এত স্পষ্ট যে এখানে ব্যাখ্যা বা মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

একটি জারি গানের কি অবস্থা হয়েছে সঙ্গীত পরিচালক শ্রীঅপরেশ লাহিড়ীর দয়ায়, তার একটি নমুনা—

জারি কথার অর্থ ক্রন্দন বা বিলাপ। মূল গায়ক বা বয়াতী হাতে চামর নিয়ে সুরু করেন সভা বন্দন। ক্রমান্বয়ে দোহার সংগে বর্ণনা করে চলেন কারবালা প্রান্তরের কাহিনী। চারদিকে বিস্তৃত বালুকা-রাশি। ইমাম হাসানের দলের সব লোক জলের অভাবে মৃতপ্রায়। সেই

সময়কার অবস্থা বর্ণনা করতে করতে বয়াতী এবং দোহারবৃন্দ গাইতে থাকে :—

বয়াতী—বেলা দ্বিপ্রহর শুধু বালুচর
ধুপেতে কলিজা ফাটে পিয়াসে কাতর,
দোহার—আল্লা ম্যাঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই
আল্লা ম্যাঘ দে।

বয়াতী—আসমান হইল টুডা টুডা জমিন হইল ফাডা
দোহার—আল্লা ম্যাঘ দে
বয়াতী—ম্যাঘ রাজা ঘুমাইয়্যা রইছে ম্যাঘ দিব তোর কেডা
দোহার—আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই আল্লা ম্যাঘ দে
বয়াতী—আলের গরু বাইন্দা গিরছ মরে কাইন্দা
দোহার—আল্লা ম্যাঘ দে
বয়াতী—ঘরের নারী কাইন্দা মরে ডাইল খিচুড়ি রাইন্দা
দোহার—আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই আল্লা ম্যাঘ দে
বয়াতী—আমপাতা লড়েচড়ে কাডাল পাতা ঝরে
দোহার—আল্লা ম্যাঘ দে
বয়াতী—পানি পানি কইরা বিলে পানি কাউরী মরে
দোহার—আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই আল্লা ম্যাঘ দে
বয়াতী—ফাইট্যা ফাইট্যা রইছে খাল বিল নদী
দোহার—আল্লা মেঘ দে
বয়াতী—জলের লাইগ্যা কাইন্দা উড়ে পঙ্খী জলধি
দোহার—আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই আল্লা ম্যাঘ দে
বয়াতী—কপোত কপোতী কান্দে খোপেতে বসিয়া
দোহার—আল্লা ম্যাঘ দে
বয়াতী—শুকনা ফুলের কলি পরে ঝরিয়া ঝরিয়া
দোহার—আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই আল্লা ম্যাঘ দে।
বয়াতী—নিদয় বিধিরে
দোহার—কি দোষে হারাইলাম পতি বাসর ঘরে—ইত্যাদি

অথচ বিজ্ঞ সঙ্গীত পরিচালক (ও আমার দেশের মাটি : ছায়াছবিতে) শোনালেন :—

আল্লা মেঘ দে পানি দে
ছায়া দেরে তুই, আল্লা মেঘ দে ৷৷
আসমান হইল টুটা টুটা জমিন হইল ফাটা।
মেঘ রাজা ঘুমাইয়া রইছে
মেঘ দিব তোর কেডা
আল্লা মেঘ দে ৷৷
ফাইটা ফাইটা রইছে কত
খাল বিল নদী
পানির লাইগ্যা কাইন্দ্যা ফিরে
পঙ্খী জলধি আল্লা মেঘ দে
হালের গরু বাইন্দ্যা গেরস্ত মরে কাইন্দ্যা
ছাওয়ার পানে ফোটা ফোটা নারীর অশ্রু ঝরে
আল্লা মেঘ দে ৷৷
কপোত-কপোতী কান্দে খোপেতে বসিয়া
শুকনা ফুলের কলি পরে ঝরিয়া ঝরিয়া
আল্লা মেঘ দে ৷৷

ইউরোপ আমেরিকার নানা দেশে এ ধরণের ভেজাল বা মিশ্রিত সঙ্গীতকে লোকসঙ্গীত বলে চালাবার রেওয়াজ নতুন নয়। এর প্রধান কারণ বোধহয় ক্রমশিল্পাগ্রসরতার দরুণ লোকসমাজের বিলুপ্তি, এবং সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি আদির বিবর্তন। ফলে লোক সঙ্গীতের কথানুকরণ, সুরানুকরণ দ্বারা 'জাজ' জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ওদেশে লক্ষণীয়। এবং এবংবিধ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যাপারে ওদেশের কেউ বড় একটা মাথা ঘামাত না। সেই সব দেশে পর্যন্ত সম্প্রতি ভেজাল সঙ্গীত পরিবেশনের বিরুদ্ধে নানাবিধ জনমত দানা বেঁধে উঠছে। অথচ আমাদের ভাণ্ডার লোকবৃত্তের উপকরণে ভরপুর হওয়া সত্বেও আমরা সত্যিকারের লোক সঙ্গীতাদির প্রতি কেন অনীহা প্রকাশ করি? আমেরিকাতে ভেজাল সঙ্গীতের বিরুদ্ধে কিভাবে নানাবিধ কণ্ঠস্বর ক্রমেই সোচ্চার হয়ে উঠছে তার একটি উদাহরণ

রাখা যেতে পারে The Horn Book-এর লেখক G. Legman-এর ভাষায় :

I am in favor of a new law, punishing with one year at hard labor the singing of any folksong (two years if in a foreign language), or the playing of any folksong record; with the death-penalty for second offenders This *might*—though it seems doubtful—cause some hardship to the one or two left-over octogenarians who learned their folksongs in an honest way from broadsides, and not from their 'old father in Hohokus'. But mostly it would rid the scene of this new infestation of entertainment-industry leeches and lice, whose repulsive and infected doings I have endeavored, with the utmost of restraint, to distinguish above from folklore and folksong. (Page 504)

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যেমন উদাহরণ রাখা গেল তেমনি লোকবৃত্তের অন্যান্য শাখা থেকেও নানারূপ উদাহরণ উত্থাপন করা সম্ভব। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলার লোকসাহিত্য' ১ম, ২য় এবং 'বাংলার লোকশ্রুতি' গ্রন্থাবলী এমনই অকিঞ্চিৎকর।

অন্যান্য গ্রন্থকারের আরও অনেক গ্রন্থ আছে। কিন্তু সেসব গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নামোল্লেখের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান আলোচনায় নেই। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যকে 'বাংলার লোকসাহিত্য' অদ্ভুত জনপ্রিয় করেছে, শিক্ষা জগতে আসন পাকা করেছে, তাই তাঁকে আমরা আমাদের আলোচনায় প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করে তাঁর গ্রন্থ থেকে কিছু উদাহরণ উপস্থাপিত করতে পারি। তদীয় বন্ধু শ্রীকামিনীকুমার রায়, এম, এ ভট্টাচার্য মহাশয়কে যে 'কুম্ভিলক বৃত্তি' গ্রহণ করার দায়ে দায়ী করেছেন * সে সম্পর্কে আমরা কোন মন্তব্য না করে কামিনী বাবুর সৌজন্যে কী ভাবে তাঁর গবেষণা কর্ম আগামী গবেষকদের গবেষণার পথ সুগম না করে দুর্গম করে তুলেছে তার দিকে নজর দেবো। যে গ্রন্থ আশুবাবুকে পি, এইচ, ডি, ডিগ্রীতে সম্মানিত করেছে সে গ্রন্থ সম্পর্কে কোন এক সমালোচকের উক্তি—'ইহার চারিশত পৃষ্ঠা কম বা বেশী লিখিলে কিছুই আসিয়া যাইত না'। কাজেই সে গ্রন্থের কথাও থাক,

* কল্যাণী, ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৭২

এবার দেখা যাক তাঁর ৭৩০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ, 'বাংলার লোকসাহিত্য' দ্বিতীয় খণ্ড যার সম্পর্কে অনায়াসে বলা যায় যে, এ গ্রন্থ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে না তুললে চার শতাধিক পৃষ্ঠার মত পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে কষ্ট হত। এখন কামিনী বাবুর সৌজন্যে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক—

১। যমপুকুর ব্রতের একটি প্রচলিত ছড়া—

খিল খুলতে লাগল ছড়,
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর।

ডঃ ভট্টাচার্য এই ছড়াটির পাঠান্তর পেয়েছেন—

খিল খুলতে লাগল ছড়
আমার বাপ ভাই হোক লক্ষেশ্বর

'লক্ষেশ্বর' কথাটি যে ভেজাল নতুন সৃষ্টি তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কারণ, কোন কুমারী ব্রতীই বাপ ভাই 'লক্ষেশ্বর' হোক—এ কামনা করতে পারে না।

২। সেঁজুতি ব্রতের প্রচলিত ছড়া—

সাঁজ পূজন সেঁজুতি, ষোল ঘরে ষোলব্রতী
তার এক ঘরে আমি ব্রতী
ব্রতী হয়ে মাগি বর, ধনে পুত্রে বাপ মার ঘর।

ডঃ ভট্টাচার্য সংগৃহীত পাঠান্তর—

সাঁজ পূজন সেজুতি
গোল ঘরে ব্রতী
তার এক ঘরে আমি ব্রতী
ব্রতী হয়ে মাগি বর
ধনে পুত্রে গড়ুক বাপ মার ঘর।

সেঁজুতি ব্রতে উঠোনে পিটুলী দিয়ে ষোলটি ঘর (ঘরের প্রতীক) এঁকে সাধারণত ষোলজন কুমারী একত্র হয়ে ব্রত উদযাপন করে। তাই প্রচলিত ছড়াটিতে আবৃত্তি করা হয়: 'ষোল ঘরে ষোল ব্রতী। তার এক ঘরে আমি ব্রতী'। কিন্তু পাঠান্তরে দেখা যায় গোল ঘরে ব্রতী। তার এক ঘরে আমি ব্রতী। এর কি অর্থ প্রকাশ করে?

৩। পূর্ব মৈমনসিংহে হা-ডুডু খেলার একটি বহুশ্রুত ছড়া—

ছিক ছিক ছিকলের (শিকল) গোটা

হাতী মারলাম ফোটা ফোটা
ভৈষ মারলাম লাফে, তরোয়াল কাঁপে
তরোয়ালের ঝিকিমিকি। বাঘ কই নাচে?

ডঃ ভট্টাচার্য এই ছড়ার পাঠান্তর দিয়েছেন—

'চি মারুম শিকলের গোটা
হাতী মারুম মোটা মোটা
মইষ মারুম লাফে। তেউয়াল কাপে
তেউয়ালের ঝিকিমিকি। বাবুই নাচে।'

হাডুডু খেলার একপক্ষের একজন খেলোয়ার প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিজ বীরত্ব প্রকাশান্তে বলে হাতী, মহিষ, তার কাছে কিছুই না, খালি হাত পায়ের সাহায্যেই সে তাদের মেরেছে; এবার তরোয়াল হাতে (বাকি) বাঘটা মারতে এসেছে—সে বাঘটা কোথায় আস্ফালন করছে? এখানে হাতি, মহিষ, বাঘ রূপকাশ্রয় প্রতিপক্ষের ঝানু ঝানু খেলোয়ারদের বোঝান হয়েছে। ডঃ ভট্টাচার্যের রচিত পাঠান্তরে বাবুইকে নাচান হয়েছে, কারণ এই বাবুইকে নিয়ে তিনি 'অপূর্ব তাৎপর্য পূর্ণ' 'পরম কবিত্বব্যঞ্জক উক্তি' প্রভৃতির সাহায্যে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। কামিনীবাবু বলেছেন- "শুধু ভাবের দিক দিয়াই নয়, শব্দও বদলান হইয়াছে। মৈমনসিংহের লোকেরা সাধারণত 'মারুম', 'তেউয়াল' 'বাবুই' বলে না, সেখানে তৎপরিবর্তে 'মারবাম' 'তরোয়াল', 'বাউই' শুনা যায়"।

৪। ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
বুল বুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

এই বহু প্রচলিত ছড়াটির পাঠান্তরে 'টিয়াপাখী' 'চড়াই পাখী' ও 'গুলগুলি' (?) পাখীর উল্লেখ করা হয়েছে। এবং ডঃ ভট্টাচার্য নতুন কথা বলতে চেয়েছেন—"বুলবুলি পাখী কদাচ শস্য খাদক হইতে পারে না, ইহার ঠোটের গঠনই এমন যে, ইহা শস্যের কঠোর দানা ভাঙিয়া কিছুতেই আহার করিতে পারে না, কিংবা তাহা গিলিয়াও খাইতে পারে না" সুতরাং তিনি বলেছেন, যে লোক ছড়ার আবৃত্তিকারীগণ বুলবুলি উপর ধান খাওয়ার মিথ্যা অপবাদ সহ্য করতে না পেরে টিয়া-পাখী, চড়াই পাখী, গুলগুলি পাখীদের আমদানী করেছেন তারা অধিক-

তর বস্তুজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। কামিনীবাবু বলেছেন—"বুলবুলিতে ধান খায় কীনা তাহা জানিবার জন্য অধ্যাপক মহাশয়ের এত পুঁথিপুস্তক ঘাটিবার বা চীনদেশে পাড়ি দিবার প্রয়োজন ছিল না। পল্লীর কাদামাটির পথ বাহিয়া একদিন যদি তিনি ঝোপঝাড় সংলগ্ন কোনও পাকা ধান ক্ষেতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেন, অনায়াসে দেখিতে পাইতেন, চড়াই পাখীদের ন্যায় বুলবুলিতেও ধান খায়, ধানের অপরিসীম ক্ষতি করে এবং চড়াই পাখীর ঠোঁটের চেয়ে উহার ঠোঁটও কম শক্ত নয়" ডঃ ভট্টাচার্যের এই ধরণের আরও কিছু অদ্ভুত মন্তব্য সম্পর্কে কামিনীবাবু আমাদিকে ওয়াকিবহাল করেছেন :

(ক) গ্রাম দেবতার পূজার কোন প্রতিমা নেই।

(খ) 'ব্রতের উদ্দিষ্ট দেবতা মাত্রেই স্ত্রী'।

এমন্তব্য অবশ্যই ভ্রান্ত, তাছাড়া কী ভাবে তিনি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়েছেন তার উদাহরণঃ

(ক তোদের হলুদ মাখা গা। তোরা রথ দেখতে যা॥
আমরা পয়সা কোথায় পাবো। আমরা উল্টোরথে যাব॥

ছড়াটি সম্পর্কে আশুবাবুর ভাষ্য : "গায়ে হলুদের মত দেশীয় প্রসাধন বস্তু মাখিতে পারিলেই যে রথ দেখার অধিকার জন্মে তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। অথচ ছড়াটির ঠিক ঠিক অর্থ : তোদের টাকা আছে, তোরা রথ দেখতে যা, আমাদের এখন টাকা পয়সা নেই, যদি উল্টোরথের সময় টাকা সংগ্রহ করতে পারি তো যাব। কামিনীবাবু বলেছেন—"সাধারণত বিবাহের সময়েই গায় হলুদ মাখে। হাতে পয়সা না থাকিলে বিবাহের ন্যায় ব্যয় বহুল কাজে কেহ অগ্রসর হয় না। কাজেই যাহার গায়ে হলুদ মাখান হইয়াছে অর্থাৎ বিবাহ করিতে যাইতেছে তাহার হাতে পয়সা আছে বুঝা যায়।"

(খ) চরকা আমার ভাতার পুত, চরকা আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দুয়ারে বান্ধা হাতি।
চরকা আমার আশয় বিষয়। চরকা আমার হিয়া।
চরকার দৌলতে আমার সাত পুতের বিয়া।
চরকা আমার ঘুরেরে ভন্ ভন্ ভন্।
চরকা আমার বুকের লউ। সাত রাজার ধন।

"এই স্বদেশী গানটিকে সন্ধানী অধ্যাপক খেলার ছড়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন"।

এ ধরণের ভ্রান্তি ডঃ ভট্টাচার্য্যের রচনায় না হয়ে অন্য কোন লেখকের রচনায় ধরা পড়লে আমরা অনায়াসে তাকে উপেক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু ডঃ ভট্টাচার্য্যদের ন্যায় ব্যক্তিদের শিক্ষিত সমাজে ও লোক মানসে একটা বিশেষ স্থান আছে, তাঁদের মতামত ও বক্তব্যের দ্বারা বহুলোক অনুপ্রাণিত হয়। কাজেই এই সমস্ত ব্যক্তিদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত ও সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা যায় না।

অবশ্য অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের ভাষায় ভেজাল ও কৃত্রিম গবেষণার উৎসাহদাতা কর্মী ও পণ্ডিতদের কেউ কেউ সাফাই গাইতে পারেন যে: "মুখের কথাকে লেখায় ধরিতে গেলে কিছু না কিছু পরিবর্তন হইবেই। লেখক শুনিতে ভুল করিবেন, যাহা শুনিবেন তাহা লিখিতে গিয়া দ্বিতীয় দফা ভুল হইবে। যাহা লিখিবে বলিয়া ইচ্ছা করিতেছেন অক্ষমতাবশতঃ তাহার বিপরীতটি লিখিয়া বসিবেন। তাহার পর একজনের লেখা দেখিয়া আর একজন নকল করিতে বসিবেন তখন 'তুমি সে কারণ' লিখিতে গিয়া 'ভুমি যে খাবল' হইয়া দাঁড়াইবে।" (বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭২, পৃঃ ৫৯)।

আধুনিক সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কে হয়ত বিজনবাবু খুব ওয়াকিবহাল নন। হলে দেখতেন, মুখের কথা লেখায় ধরে রাখতে গেলে পরিবর্তন হবেই এমন কথা নেই; তবে অযোগ্য বা ব্যবসাদারী সংগ্রাহকদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা জেনেশুনেই ভেজাল আমদানী করেন।

ফোকলোর বা লোকবৃত্তকে নিয়ে পৃথিবীব্যাপী নানাবিধ সংগ্রহ ও গবেষণা চলছে। আমাদের দেশেও। এখানে কিন্তু এখনও পর্যন্ত লোকবৃত্ত অধ্যয়নের একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ গৃহীত হয় নি। এলোমেলো-করা মাঠে যে যে-ভাবে পারছে লুটপুটে খাচ্ছে। আমাদের বিদ্বৎসমাজ যদি এ বিষয়ে আরও একটু উৎসাহ দেখান তবে লোকবৃত্তের গবেষণা-কর্মের পরিণতাবস্থা ত্বরান্বিত হবে। প্রসঙ্গত লণ্ডন ফোকলোর সোসাইটির সভাপতি Dr. A. R. Wright লোকবৃত্তের যে সংজ্ঞা সম্প্রতি দিয়েছেন তা স্মরণ করছি:

It (folklore) might be defined as science which studies the expression, in popular beliefs, institutions, practices, oral literature and arts and past times of the mental spiritual life of the folk, the people in every stage of cultuie".

এ আলোচনা সমাপ্ত করার পূর্বে একথা বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ভারতীয় লোকবৃত্তের মূল তত্ত্ব, পরিধি এবং অর্থ সম্পর্কে নানাবিধ মতভেদ আছে। আমাদের অনেকেই এইসব আলোচনা করতে গিয়ে ইউরো-আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের লোকবৃত্ত অধ্যয়নের সমস্যা, পরিপ্রেক্ষিত, ধারা ইত্যাদির উল্লেখ করে থাকি। এই উল্লেখ করার সময় প্রায়শই ভুলে যাই যে, ভারতেব লোকবৃত্তের অধ্যয়নের সমস্যা, পরিপ্রেক্ষিতাদির সঙ্গে ওসবদেশের বহুবিধ তফাৎ বিদ্যমান। কাজেই ওসব দেশের পণ্ডিত ব্যক্তিদের চোখে ভারতীয় লোকবৃত্তের বিচার করতে গেলে হোঁচট খাওয়া স্বাভাবিক।

ভারতীয় লোকবৃত্ত ভারতীয় সমাজ জীবনের নানা সমস্যার কথা আমাদের জানিয়ে দেয়। এর মধ্যে আমবা সমাজের আশা নিরাশা আকঙ্খা, বঞ্চনাদির প্রতিফলন দেখতে পাই। বিবাট ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেব বিভিন্ন সমস্যা, অনুভূতিব পার্থক্য, ধর্মের বিভেদ, পোষাক পরিচ্ছদের তফাৎ জন জীবনেব আদর্শ ও দ্বন্দ্ব প্রভৃতি প্রত্যেকটি লোকবৃত্তের মধ্যে প্রকটিত, এই বিভেদের মধ্যে একতা—বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য— ভারতীয় লোকবৃত্তের মূল তত্ত্ব। মানুষের শরীরের যেমন প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কাজ, বিভিন্ন হলেও এবং তাদের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য থাকলেও একটা সত্ত্বা এদের এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। সেই রকম ভারতীয় লোকবৃত্ত সারা ভারতের লোকসমাজকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে। সমাজ জড় পদার্থের ডেলা নয়। মনুষ্য সম্প্রদায়ের সমষ্টি সমস্ত মানুষই এর অঙ্গ। সুতরাং বলা যেতে পারে, সমস্ত সমাজের একটা আত্মা আছে। সমস্ত সমাজ এক অদৃশ্য সূত্র দিয়ে বাঁধা, এক অদৃশ্য শক্তি এতে প্রাণ সঞ্চার করছে। ভারতীয় লোকবৃত্ত চর্চা দ্বারা সমাজে-সমাজে, মানবে-মানবের এই ঐক্যবোধ জাগরিত করাই ভারতীয় লোক বৃত্ত অধ্যয়নের মূল কথা এবং সেদিক থেকেই ভারতীয় লোকবৃত্তের মূল্যায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।